সাম্প্রদায়িক রাজনীতি
ও
সংঘ পরিবার

সব্যসাচী গোস্বামী

আবাদভূমি
তারাপদ দাস লেন, কলুপুকুর, চন্দননগর,
জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২ ১৩৬

Samprodayik Rajneeti O Sangha Poribar
Communal Politics And The Sangh Parivar
Written by Sabyasachi Goswami

প্রথম প্রকাশ
কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫

গ্রন্থস্বত্ব
সুতপা গোস্বামী

প্রচ্ছদ
রাজেশ দত্ত

প্রকাশক
রাজেশ দত্ত, আবাদভূমি,
তারাপদ দাস লেন, কলুপুকুর, চন্দননগর,
জেলা – হুগলী, পিন – ৭১২ ১৩৬
দূরভাষ : ৯২৩০৬ ১২৬৫৫ এবং ৯৪৩৩৫ ৬৬৩০২
ই-মেল : abadbhumi@gmail.com

মুদ্রক
ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রাইভেট লিমিটেড
গঙ্গানগর, কলকাতা – ৭০০ ১৩২

পরিবেশক
ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা
বুকমার্ক, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা

সংহতি মূল্য
পঞ্চাশ টাকা

অনুরাধা গান্ধি
নরেন্দ্র অচ্যুত দাভোলকর
সুকুমারী ভট্টাচার্য
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-এর
প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ		৭
প্রথম অধ্যায়	সিন্ধু সভ্যতা, বৈদিক সভ্যতা থেকে গুপ্তযুগ	১১
দ্বিতীয় অধ্যায়	মধ্যযুগ ও ভক্তি আন্দোলন	৩৭
তৃতীয় অধ্যায়	ঔপনিবেশিক ভারত : হিন্দু পুনরুত্থানবাদ	৪১
চতুর্থ অধ্যায়	সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূত্রপাত	৫১
পঞ্চম অধ্যায়	সংঘ পরিবার ও তাদের চিন্তাধারা	৬৩
ষষ্ঠ অধ্যায়	রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিতর্ক	৭৯
সপ্তম অধ্যায়	বিজেপির নেতৃত্বাধীন প্রথম এনডিএ সরকার	৮৫
অষ্টম অধ্যায়	গুজরাত গণহত্যা – ফিরে দেখা	৯২
নবম অধ্যায়	উন্নয়নের মোদি মডেল : নতুন বোতলে পুরোনো মদ	৯৭
দশম অধ্যায়	মগজে গৈরিক সন্ত্রাস	১১০
একাদশ অধ্যায়	নরেন্দ্র মোদি কেন বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তি গড়তে এত ব্যগ্র?	১১৩
দ্বাদশ অধ্যায়	মোদি মডেলের ‘নির্মল’ ভারত	১১৬
ত্রয়োদশ অধ্যায়	সংঘ পরিবার গীতাকে কেন ‘জাতীয় গ্রন্থ’ ঘোষণার দাবি তুলছে?	১১৮
চতুর্দশ অধ্যায়	কুৎসার জবাব	১২০
পঞ্চদশ অধ্যায়	কংগ্রেস কি কোনো ধর্মনিরপেক্ষ দল?	১২৪
তথ্যসূত্র		১২৭

মুখবন্ধ

অনুজ বন্ধু সব্যসাচী গোস্বামী সুলেখক হিসাবে পরিচিত। দীর্ঘসময় — সাত বছরেরও বেশি, তিনি রাজনৈতিক বন্দি হিসাবে কারান্তরালে কাটিয়েছেন। নতুন প্রজন্মের মননশীল ও সংবেদনশীল লেখক সব্যসাচীর কবিতা ও ছোটোগল্পগুলি পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছে। সেইসব রচনার একটা বড়ো অংশই বাংলা কারাসাহিত্যে সম্মানের আসন পাবে। তাঁর লেখা পড়লে বোঝা যায়, লেখার মধ্যে একধরনের মতাদর্শগত তাগিদ কাজ করে। তাঁর এই 'সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও সংঘ পরিবার' গ্রন্থটির বিষয় ভিন্ন হলেও সেই এক রাজনৈতিক-মতাদর্শগত তাগিদ এখানেও বহমান, যা এই বৃহৎ নিবন্ধটিকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধরে রেখেছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আর এস এস) তথা সংঘ পরিবার ও বিজেপি-র উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সম্পর্কিত এই গ্রন্থের অধ্যায় সংখ্যা পনেরো। সিন্ধু সভ্যতা, বৈদিক সভ্যতা থেকে গুপ্তযুগ, মধ্যযুগ ও ভক্তি আন্দোলন, ঔপনিবেশিক ভারত : হিন্দু পুনরুত্থানবাদ, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূত্রপাত, সংঘ পরিবার ও তাদের চিন্তাধারা, রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিতর্ক, বিজেপির নেতৃত্বাধীন প্রথম এনডিএ সরকার, গুজরাত গণহত্যা — ফিরে দেখা, উন্নয়নের মোদি মডেল : নতুন বোতলে পুরোনো মদ, মগজে গৈরিক সন্ত্রাস, নরেন্দ্র মোদি কেন বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তি গড়তে এত ব্যগ্র?, মোদি মডেলের 'নির্মল' ভারত, সংঘ পরিবার গীতাকে কেন 'জাতীয় গ্রন্থ' ঘোষণার দাবি তুলছে?, কুৎসার জবাব এবং কংগ্রেস কি কোনো ধর্ম নিরপেক্ষ দল? — এইসব অধ্যায়ে বইটি সুবিন্যস্ত।

প্রাচীন ভারত থেকে আধুনিক ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত সুবিশাল এক ক্যানভাসে 'হিন্দুত্ব', সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, সংঘ পরিবার এবং অতি সাম্প্রতিককালের মোদি-নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার ও হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিবাদ সংক্ষেপে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আলোচনা করা হয়েছে গ্রন্থটিতে। এই চর্চা একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। যে কোনো ধরনের ভুল মতাদর্শ, বিপজ্জনক মতাদর্শকে — ধর্মীয় মৌলবাদ, ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদকে — মতাদর্শগতভাবে বিরোধিতা করা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণী ক্ষমতা হস্তান্তর-পরবর্তী পর্যায়ে নানা ধরনের স্লোগানকে 'জাতীয়' স্লোগান হিসাবে মানুষের সামনে হাজির করেছিল। প্রথম স্লোগান, 'সমাজতান্ত্রিক ধরনের সমাজ'। একটা স্বাধীন, স্বনির্ভর, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ার নামে এই স্লোগানের আড়ালে ভারতের শাসকশ্রেণী দেশকে

সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি ও কারিগরি জ্ঞানের উপর নির্ভরতা বাড়িয়ে তোলে। বিকাশ ও শিল্পায়নের নামে তারা মুৎসুদ্দি বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীকে দ্রুত বেড়ে উঠতে মদত যোগায়, ভারতের অর্থনীতির উপর সাম্রাজ্যবাদী নাগপাশের নিয়ন্ত্রণ আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করে এবং গ্রামাঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক ভূমিসম্পর্কের মধ্যে কোনোধরনের মৌলিক পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে জোট-নিরপেক্ষ নীতির নাম করে প্রকৃতপক্ষে এক দ্বি-জোট নীতি অনুসরণ করে — যার একদিকে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী জোট আর অন্যদিকে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী জোট। গণতন্ত্র ও সকলের জন্য সমান সুযোগ — এই নীতির নাম করে তারা জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে পদদলিত করেছে এবং স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার দাবিতে সংগ্রামরত বিভিন্ন জাতিসত্তার আন্দোলনগুলিকে নানাভাবে দমন করে এসেছে। ১৯৬৬ সাল নাগাদ শাসকশ্রেণীর এই নীতিসমূহ তীব্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের রূপ নেয়।

'সমাজতান্ত্রিক মডেল'-এর স্লোগানের গুরুত্ব কমে এলে নতুন স্লোগানের প্রয়োজন দেখা দেয়। শাসকশ্রেণীর এই নতুন স্লোগান হল 'গরিবি হঠাও'। কিন্তু এই নতুন স্লোগানের ঔজ্জ্বল্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। অতি শীঘ্রই মোহ ভেঙে যায় যখন মানুষ দেখতে পায়, দারিদ্র্য অবলুপ্তির পরিবর্তে লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষই অবলুপ্তির পথে চলে যাচ্ছে, যখন আসে ইন্দিরা-সিদ্ধার্থ জমানার জরুরি অবস্থা (১৯৭৫-৭৭)।

১৯৭৭ সালে জরুরি অবস্থার অবসান এবং সংসদীয় নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে নির্বাচিত জনতা পার্টির মাধ্যমে শাসকশ্রেণী নতুন পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করে। জরুরি অবস্থা-পরবর্তী পর্যায়ে যখন ইন্দিরা-কংগ্রেস জমানার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ ক্রোধে ও ঘৃণায় ফুঁসছে, তখন শাসকশ্রেণীর কাছে প্রয়োজন হল বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠীর মধ্যেকার পরীক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়ে নতুন পরীক্ষা চালানো। জনসংঘ সহ বিভিন্ন ছোটো মাঝারি রাজনৈতিক গোষ্ঠী (স্বতন্ত্র, পিএসপি, এসএসপি, আদি কংগ্রেস প্রভৃতি) নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে গড়ে তুলল জনতা পার্টি। জনতা পার্টির বাতাবরণে শাসকশ্রেণীর নতুন স্লোগান হল, 'গণতন্ত্র বনাম স্বৈরতন্ত্র'। যাঁরা জনতা পার্টি গড়লেন, তাঁরা রাজনীতিতে নতুন ছিলেন না, সবাই পুরোনো মুখ, যাঁরা নতুন পার্টির ছত্রছায়ায় সমবেত হলেন। কিন্তু এই পরীক্ষা ক্ষণস্থায়ী ছিল। ১৯৮১ সালে তদানীন্তন জনসংঘ নতুন কলেবরে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নামে আত্মপ্রকাশ করল।

নতুন পর্যায়ে শাসকশ্রেণীর নতুন স্লোগান হল 'হিন্দুত্ব'। হিন্দুত্বের রথ গড়াতে শুরু করল, হাজার হাজার মানুষকে নিষ্পেষিত করে। এল কে আদবানির পরিচালনায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ধর্মান্ধ হিন্দু ফ্যাসিস্ত বাহিনী বাবরি মসজিদ ধ্বংস করল। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-(১) সরকারের আমলে (১৯৯৮-

২০০৪) 'হিন্দুত্ব' এইভাবে দেশের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হল। সংকটে জর্জরিত বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর একটা বড়ো অংশ সার্বিক জাতীয়তাবাদের ধারণাকে বিসর্জন দিয়ে 'সর্বভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদ'-এর নীতিকে প্রচার করতে থাকল। সংঘ পরিবারকে (আর এস এস) পুষ্ট করার পাশাপাশি শাসকশ্রেণী তাদের রাজনৈতিক শাখা হিসাবে বিজেপি-কে তুলে আনল। শুধু সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ ও হত্যা (খ্রিস্টান, মুসলিম প্রভৃতি), তাঁদের ধর্মস্থানগুলি কলুষিত করা নয়, এই হিন্দু ফ্যাসিস্ত বাহিনী অন্য শ্রমজীবী মানুষের উপরও আক্রমণ চালায়, যাঁদের অধিকাংশই দলিত হিন্দু সম্প্রদায়ের। এইভাবে তারা শোষিত মানুষের মধ্যে ধর্ম, বর্ণ ও জাতপাতের বিভেদের বীজ বপন করে, যাতে একই সঙ্গে তারা একজোট হয়ে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারে।

এনডিএ-(১) সরকারের পতনের পর হিন্দুত্বের রথ থামল। কংগ্রেস-পরিচালিত ইউপিএ-(১) ও (২) সরকারের (২০০৪-২০০৯) আমলে শাসকশ্রেণী নতুন স্লোগান হাজির করল — 'বিকাশ ও শিল্পায়ন'। ২০০৯ সালে এর সঙ্গে 'সন্ত্রাসবাদ'-বিরোধিতার স্লোগান যুক্ত হল। একই স্লোগান চলল ইউপিএ-(২) সরকারের আমলে (২০০৯-২০১৪)। মোদি-পরিচালিত নতুন বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-(২) সরকারের সঙ্গে শাসকশ্রেণীর স্লোগানও পাল্টাল। এল হিন্দুত্ব আর গুজরাত মডেলের 'উন্নয়ন', আরও আগ্রাসী চেহারা নিয়ে। বর্তমান পুস্তকে এই সবই আলোচিত হয়েছে।

জন্মলগ্ন থেকে ভারতরাষ্ট্র উন্নয়নের মডেল হিসাবে স্বনির্ভরতা নয়, প্রকৃত স্বাধীন দেশে যা হওয়া উচিত, অর্থাৎ নিজের পায়ের উপর দাঁড়ানো, তা নয়, বরং বিদেশি পুঁজি ও প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতাকেই ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছে। কংগ্রেস বা বিজেপি, বা তৃতীয় যুক্তপার্টিগুলির সরকার — কারোর ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ঔপনিবেশিক ভারতের শেষ পর্যায়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের তৈরি তথাকথিত 'সমাজতান্ত্রিক মডেল' (রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি মালিকানাধীন শিল্পের 'মিশ্র অর্থনীতি')-এর প্রয়োজন সামগ্রিক পরিকাঠামো তৈরি হওয়ার পরে যখন ফুরিয়ে গেল, তখন থেকেই বিদেশি ও দেশি কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে শুরু হল বেসরকারিকরণ, উদারিকরণের যাত্রা। যেসব রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পসংস্থা রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধের নিরাপত্তায় গড়ে উঠেছিল এবং লাভজনক ছিল, সেগুলিকেই সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির লুণ্ঠনের স্বার্থে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করা শুরু হল। এখানে নরসিংহ রাও-পরিচালিত কেন্দ্রীয় কংগ্রেসি সরকারের সঙ্গে বাজপেয়ী-পরিচালিত বিজেপি সরকারের কোনো তফাৎ নেই, মনমোহন সিং-পরিচালিত সরকারের সঙ্গে কোনো প্রভেদ নেই বর্তমানের মোদি-পরিচালিত বিজেপি সরকারের। তফাৎ হয়তো একটাই, তা হল মোদি-সরকার বিপুল

সংখ্যাধিক্যের জোরে ক্ষমতাসীন হওয়ার পরে আম্বানি, টাটা ও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির স্বার্থে যে আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে 'সংস্কার'-এর রথ চালাচ্ছে, তা পূর্বেকার সরকার ইচ্ছা থাকলেও করে উঠতে পারেনি। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বিদেশি ও দেশি লুঠেরাদের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে 'অপারেশন গ্রিন হান্ট' বেশ কিছুকাল আগে শুরু হয়েছিল, তা শাসকশ্রেণীর নতুন রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের লালনে যে আরও তীব্র আকার ধারণ করবে, গ্রামীণ আদিবাসী, দলিত, কৃষক, বিভিন্ন গরিব মানুষ, শহরের শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য নানা স্তরের মানুষেরা তা উপলব্ধি করছেন। আর এই সবই করা হচ্ছে 'হিন্দুত্বে'র ধ্বজাকে সামনে রেখে।

গ্রন্থটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগের এই ইতিহাস অনেকেরই জানা নেই। সেই ইতিহাস জানা জরুরি। লেখক সেই কাজটা সীমিত পরিসরে যত্নের সঙ্গে করেছেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের 'হিন্দুত্বের' ফ্যাসিস্ত মতাদর্শকে মতাদর্শগতভাবে বিরোধিতা করা প্রয়োজন। বর্তমান গ্রন্থের লেখক সব্যসাচী গোস্বামীর এই গ্রন্থটি এক্ষেত্রে একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

অমিত ভট্টাচার্য
কলকাতা
২০ ডিসেম্বর, ২০১৪

প্রথম অধ্যায়

সিন্ধু সভ্যতা, বৈদিক সভ্যতা থেকে গুপ্তযুগ

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নরেন্দ্র মোদির ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। একদা যেখানে বলা হত, 'বাংলার মাটি নাকি দুর্বৃত্তদের দুর্জয় ঘাঁটি', তা আজ ধীরে ধীরে যেন সংঘ পরিবারের উর্বর অঞ্চলে পরিণত হচ্ছে। মজার বিষয় হল, বামপন্থার ঠিকা নিয়ে এতদিন যারা বসেছিল, সেই সিপিআই, সিপিএম দলেরই শত শত নেতা, কর্মী আজ দলে দলে বিজেপিতে নাম লেখাতে নেমে পড়ছেন! নষ্ট, ভ্রষ্ট বামপন্থার এও এক করুণ পরিণতি! এদিকে 'পরিবর্তনের স্বপ্ন' ক্রমশ দুঃস্বপ্নে পরিণত হচ্ছে, ফলত জনতার একাংশ বিজেপির দিকে ঝুঁকছে। খবরে প্রকাশ, এই রাজ্যে আর এস এসের অগ্রগতি হচ্ছে অভাবনীয় হারে। গত দেড় বছরে আর এস এসের নিত্য শাখা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১০০টি, সাপ্তাহিক শাখা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০০টি, মাসিক সংঘমণ্ডলীর সংখ্যা বর্তমানে এই রাজ্যে এখন ২১০০টি, কলকাতা বাদে রাজ্যে তাদের বৈঠক-ক্ষেত্রের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫০০০টি, নতুনদের আকৃষ্ট করতে এরাজ্যেও তৈরি করা হয়েছে সংঘ পরিচিতি বর্গ, শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এরকম ২৩টি সংঘ পরিচিত বর্গ তৈরি হয়েছে। জানা যাচ্ছে, উত্তরবঙ্গের তুলনায় দক্ষিণবঙ্গেই সংঘ পরিবারের কলেবরে বৃদ্ধি ঘটেছে বেশি। যদিও গুরুং এবং কামতাপুরি আন্দোলনের একাংশও বিজেপির ছোটো রাজ্যের নীতির প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে নির্বাচনী রাজনীতিতে বিজেপিকে 'বন্ধু' ভাবতে শুরু করেছেন।

হিন্দুত্ববাদীদের এই বাড়বাড়ন্ত যে গণতান্ত্রিক এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের কাছে যথেষ্ট অশুভ ইঙ্গিতবাহী তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। একটা কথা অনেকেরই মুখে শোনা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুত্ববাদীরা নাকি খুব একটা সুবিধা করতে পারবে না। যেহেতু বিজেপি ১৯৪৭ পরবর্তী সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনি রাজনীতিতে খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি, তাই এধরনের একটা সরল ধারণা অনেকেই পোষণ করেন। এটা ঠিকই, বাংলার জনগণের রয়েছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্তবাদবিরোধী সংগ্রামের এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। এই বাংলার বুকেই গড়ে উঠেছে অজস্র কৃষক বিদ্রোহ। এই বাংলার মাটিতেই ঘটেছে তেভাগার দাবিতে বিশাল এক কৃষক সংগ্রাম। ঘটেছে ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন। এক পয়সার ট্রামভাড়া বৃদ্ধিবিরোধী আন্দোলন। ঘটেছে নকশালবাড়ির মতো উপমহাদেশ তোলপাড় করা বিপ্লবী আন্দোলন। ব্রিটিশ শাসনের সময় থেকে, কংগ্রেসি জমানায়, সাতাত্তরের বামফ্রন্ট শাসনের সময়, বা তার পরেও এই সেই রাজ্য, যেখানে বারবার গড়ে উঠেছে রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে বন্দিমুক্তি আন্দোলন। এই সেই রাজ্য যেখানে এই সেদিনও ঘটে গেছে একের পর এক গণআন্দোলন। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের কৃষক জনতা জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালিয়েছেন। সারা রাজ্য জুড়ে ঘটেছে ঐতিহাসিক রেশন আন্দোলন। পাথর খাদানের ক্রাশারের দূষণের বিরুদ্ধে বা স্পঞ্জ আয়রন কারখানার দূষণের বিরুদ্ধে যেমন বীরভূম বা জঙ্গলমহলের জনগণ গণআন্দোলন গড়ে তুলেছেন, তেমনই পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরুদ্ধে লড়েছেন সুন্দরবন ও পূর্ব মেদিনীপুরের হরিপুরের জনতা। সর্বোপরি ঘটেছে ঐতিহাসিক লালগড় আন্দোলন। এই লড়াইগুলিই পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসের প্রধান দিক, কিন্তু পাশাপাশি এর বিপরীত দিকটিও কিন্তু আছে। এই সেই বাংলা,

যেখানে ১৯৪৬-৪৭ সমকালীন সময়ে ঘটেছে বিরাট বিরাট ভয়াবহ দাঙ্গা। 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' বা 'নোয়াখালির দাঙ্গা' নিশ্চয়ই আমাদের স্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়নি! বারবার এই বাংলার সংগ্রামী জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এখানকার লাল-সবুজ-গেরুয়া রঙের রাজনৈতিক দলগুলি। গণআন্দোলনকে এরা পিছন থেকে ছুরি মেরেছে। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিন হিন্দুত্ববাদী উন্মাদনার কারণে এই কলকাতার রাজপথেই মিলিটারিকে রুটমার্চ করতে হয়েছে। কাটরা মসজিদকে ঘিরে এই বাংলাতেই ঘটে গেছে সংখ্যালঘু নিধনের ঘটনা। তাই প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক জনগণের আত্মতৃপ্তির কোনো জায়গা নেই। ইতিহাস দেখাচ্ছে যে হিন্দুত্ববাদী মৌলবাদী চিন্তার বিষবৃক্ষটি অনেক আগেই রোপিত হয়েছিল এই দেশে, আর এই বাংলার মাটিতেও তার বিকাশের ইতিহাসটি মোটামুটি দীর্ঘই। হিন্দু মৌলবাদী সংঘ পরিবারের কার্যকলাপকে এবং তাদের রাজনীতি এবং মতাদর্শকে বুঝতে গেলে আমাদের তাই একটু পিছন থেকেই শুরু করতে হবে।

প্রথমেই বলা ভালো, 'হিন্দু' এই শব্দটি নিয়েও কিন্তু বিতর্কের অবকাশ আছে। বস্তুত হিন্দু শব্দটি একটি পার্সি শব্দ, পারস্যের লোকেরা সংস্কৃত শব্দ 'সিন্ধু'কে 'হিন্দু' উচ্চারণ করতেন, বর্তমানে যা এক বিশেষ ধর্মকে চিহ্নিত করে। সিন্ধু সভ্যতার তীরে বসবাসকারীদের 'হিন্দু' বলা হত। গ্রিকরা 'সিন্ধু'কে 'ইন্ডো' বা 'ইন্ডাস' উচ্চারণ করতেন, সেখান থেকেই 'ইন্ডিয়া' শব্দটা এসেছে বলে মনে করা হয়। হিন্দু পুনরুত্থানবাদী হিসাবে পরিচিত অন্যতম ব্যক্তিত্ব অরবিন্দ ঘোষ 'হিন্দু' শব্দের পরিবর্তে 'সনাতন ধর্ম' শব্দটিই বেশি পছন্দ করতেন। আর্য সমাজের সদস্যরা নিজেদের 'হিন্দু' পরিচয় দিতে অস্বীকার করতেন। হিন্দু বলতে তাঁরা বৈদিক, অবৈদিক সব ধারণাকেই বুঝতেন আর যেহেতু তাঁরা কেবলমাত্র বৈদিক ধারণাকেই মান্যতা দিতেন, তাই ১৮৮১ সালের জনগণনায় তাঁরা তাঁদের অনুগামীদের, নিজেদের 'অ-হিন্দু' হিসেবে নাম রেজিস্ট্রি করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদিও ১৯০১ সালে এই নীতির তাঁরা বদল ঘটান, ১৯৮০ সালে আর্য সমাজের একাংশ আবার তাঁদের পুরোনো নীতিতে ফিরে গিয়েছিলেন, অর্থাৎ সে সময় তাঁরা নিজেদের 'অ-হিন্দু' বলে নাম নথিভুক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনও একবার নিজেদের 'অ-হিন্দু' সংখ্যালঘু হিসাবে পরিচয় নথিভুক্ত করতে একটি অসফল প্রয়াস চালায়। কেউ কেউ বলেন, এর পিছনে নাকি ছিল তাঁদের 'সংখ্যালঘু' হিসেবে সুযোগসুবিধা আদায়ের সুবিধাবাদী-সুলভ চিন্তা। হিন্দুধর্মের কোনো প্রাচীন গ্রন্থে কিন্তু হিন্দু শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায় না। বেদ, উপনিষদ থেকে শুরু করে শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ কোথাও হিন্দুধর্ম বলে কোনো ধর্মের উল্লেখ নেই। বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মগ্রন্থেও এর উল্লেখ লক্ষ করা যায় নি। মেগাস্থিনিসের 'ইন্ডিকা' গ্রন্থে প্রথম 'ইন্ডিয়া' শব্দের লিখিত রূপ পাওয়া যায়। ইন্ডিয়া থেকে ইন্ডু থেকে হিন্দু, এভাবে 'হিন্দু' শব্দের প্রচলনের প্রাচীন এক প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। সুলতান মামুদের সভাকবি আলবেরুনি রচিত কিতাবে 'হিন্দ্' শব্দটির ব্যবহার ছিল। দশম শতকের শেষের দিকে অজ্ঞাতনামা হুদুদ আল আলমের গ্রন্থে ভারতকে 'হিন্দুস্তান' হিসাবে উল্লেখ করা হয়। সে অর্থে দেখলে মূলত গ্রিক, তুর্কি, মুঘলদের গ্রন্থগুলোতেই 'হিন্দু' শব্দটা প্রথম পাওয়া যায়। মুঘল আমলের ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে মৈথিলি ব্রাহ্মণ কবি বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা' গ্রন্থে প্রথম কোনো, আজকের ভাষায় বললে তথাকথিত কোনো হিন্দু প্রথম 'হিন্দু' শব্দটা লেখায় ব্যবহার

করছেন। মুঘল আমলে বৃন্দাবনদাস, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, বিজয় গুপ্ত প্রমুখ কবিদেরও লেখাতে ভারতীয়দের 'হিন্দু' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্রিটিশরা 'হিন্দু' শব্দটিকে জনপ্রিয় করতে বিশেষ ভূমিকা নেয়। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও তখনও অবধি 'হিন্দু' শব্দটা জাতিবাচক অর্থেই মূলত বোঝাত। ১৮৭৩ সালে রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' বইটি লিখলেন এবং এর মধ্যে দিয়ে 'হিন্দু' শব্দটা 'ধর্ম' রূপে স্বীকৃতি পেল। যদিও মুঘল আমলে উচ্চবর্ণীয়দের 'হিন্দু' হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হত, কিন্তু ব্রিটিশ আমলেও উনিশ শতক পর্যন্ত এই মানসিকতা পোষণ করত ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। পরবর্তীতে আম্বেদকর তফশিলি জাতি/উপজাতিদের (এসসি/এসটি) জন্য পৃথক ভোটাধিকারের দাবি তুলতেই হিন্দুত্ববাদী নেতারা প্রমাদ গুনলেন। ১৯২২ সালে উত্তর প্রদেশের বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু মহাসভার আয়োজন করা হয়। সেখানেই হিন্দু মহাসভার নেতারা দলিত তথা শূদ্রদেরও হিন্দুধর্মের অন্তর্গত হিসাবে ঘোষণা করেন। যদিও শূদ্রদের সামাজিক মর্যাদা পরবর্তী কালেও এই ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুত্ববাদীরা মেনে নেয়নি।

হিন্দু মহাসভার অন্যতম 'থিঙ্ক ট্যাঙ্ক' এবং সংঘ পরিবারের আদর্শ পুরুষ বিনায়ক দামোদর সাভারকর 'হিন্দুত্ভঃ' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন, যেটি আসলে পার্সি এবং সংস্কৃত, এই দু'টি ভাষার মিশ্রণে তৈরি একটি খিচুড়ি মার্কা শব্দ। যাই হোক, হিন্দুত্ব নিয়ে আলোচনার আগে আমরা কিছুটা হিন্দুধর্মের বিস্তার এবং তার সংস্কার আন্দোলনগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় জেনে নেব। তাহলে আজকের সংঘ পরিবারের মতাদর্শ ও রাজনীতিটি বুঝতে আমাদের কিছুটা সুবিধা হবে।

সিন্ধু সভ্যতা

ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এদেশের সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতাটি বৈদিক সভ্যতা নয়, সিন্ধু সভ্যতা। যদিও দীর্ঘদিন অবধি পণ্ডিতদের একটা ধারণা ছিল, বৈদিক সভ্যতাই এদেশের সবচেয়ে প্রাচীনতম সভ্যতা, কিন্তু ১৯২২ সাল নাগাদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার থেকে প্রথম সিন্ধু সভ্যতার বিষয়টি ব্যাপকভাবে জনসমক্ষে আসে। যদিও এর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের কাজ শুরু হয়েছিল আরো অনেক আগে। প্রথমে ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিক চার্লস ম্যাসেনের উদ্যোগে এর অনুসন্ধান শুরু হয়। ১৮৫৩ সালে প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য শুরু হয়। দায়িত্বে ছিলেন তৎকালীন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা আলেকজান্ডার ক্যানিংহ্যাম। পরে ১৮৫৬ সালেও আবার ক্যানিংহ্যাম খননকার্য চালান। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দয়ারাম সাহানির উদ্যোগে যে খনন কাজ শুরু হয় তা প্রায় দশ বছর অবধি চলে। তখনই প্রথম হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়। তখন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা ছিলেন জন মার্শাল। এই আবিষ্কারের ধারাতেই পরবর্তীতে মেহেরগড় সভ্যতাও আবিষ্কার করা হয়।

সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে ঐতিহাসিকরা যতটুকু জানতে পেরেছেন, মোটের উপর তা ছিল এই যে – ১) এখনকার ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে মধ্যভারতের উত্তরভাগ পর্যন্ত যে জনগোষ্ঠীর বাস ছিল, সেই প্রাগার্য মানুষরাই সিন্ধু সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল। ২) এই সভ্যতা খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দ থেকে দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি পর্যন্ত অধুনা বালুচিস্তান, আফগানিস্তান, সিন্ধু, পঞ্জাব, গুজরাত, রাজস্থানের কিছু অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত

ছিল। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, লোথাল, কালিবঙ্গান ইত্যাদি ছিল এই সভ্যতার সময়কার বড়ো বড়ো নগরী। ৩) প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বলছে, প্রাগার্য এই সভ্যতা ছিল সময়ের হিসেবে যথেষ্ট বিকশিত। সেখানকার রাস্তাঘাট ছিল যথেষ্ট চওড়া, এছাড়া প্রাসাদ, দুর্গ, স্নানাগার, নদীবাঁধ, বাড়ির বারান্দা, সেসব সেই যুগেও ছিল। আর ছিল জলনিকাশি ব্যবস্থার নিদর্শন। একটা বাড়িতে শস্যভাণ্ডারেরও চিহ্ন পাওয়া গেছে। কিন্তু কোনো অস্ত্রভাণ্ডার পাওয়া যায়নি। এসব থেকে অনুমান করা হয় যে, সে যুগে জনসাধারণের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মোটের উপর ভালোই ছিল। এছাড়া সম্ভবত সমাজ ছিল কোনো কেন্দ্রীয় শাসনের অধীন, হয়তো পুরোহিত-শাসিত ব্যবস্থা ছিল এবং জীবনযাপন ছিল শান্তিপূর্ণ। বেশ কিছু উন্নতমানের মৃৎশিল্প পাওয়া গেছে, যা রঙিন চিত্র করা। এই সভ্যতার সময়কার যে ওজনের বাটখারাগুলো পাওয়া গেছে, সেগুলো পর্যন্ত সর্বত্র সম ওজনের ছিল! সিন্ধু সভ্যতার মানুষ লিখতে পড়তে জানত, কারণ সিলমোহরের উপর লেখায় তার প্রমাণ আছে। যদিও আজ অবধি সেই লিপির অর্থ উদ্ধার করা যায়নি। ৪) ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তা হল, একটা যোগীমূর্তি পাওয়া গেছে যাকে ঘিরে আছে হাতি, গন্ডার, বাঘ, ও ষাঁড়ের দল। মূর্তিটিকে ইতিহাসের পণ্ডিতরা শিবের মূর্তি বলে মনে করছেন। সিন্ধু সভ্যতার নারীমূর্তিগুলি থেকে পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে, সে সময় ধর্মবিশ্বাস ছিল দেবীপ্রধান বা মাতৃপ্রধান, যেখানে বৈদিক ধর্মবিশ্বাস ছিল পুরুষপ্রধান। ঋগ্বেদিক সাহিত্যে দেখা যায় যে, ইন্দ্র ঊষাকে আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করেছেন। অনুমান করা হয় যে ঊষা হলেন প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার মাতৃদেবীই। এখানে সম্ভবত বোঝানো হয়েছে, নারীপ্রধান সিন্ধু সভ্যতাকে ধ্বস্ত করেছে পুরুষপ্রধান আর্যসভ্যতা। বৈদিক কবিদের কল্পনায় তাই ইন্দ্রের আক্রমণে বিপর্যস্ত ঊষার শকট ধ্বস্ত হচ্ছে এবং ভীত ঊষা বিপাশার তীর ধরে পলায়ন করছেন। এর অর্থ হল, পিতৃপূজায় বিশ্বাসীদের অর্থাৎ আর্যদের আক্রমণে মাতৃপূজায় বিশ্বাসী অনার্য সভ্যতা বিপর্যস্ত হচ্ছে। এছাড়াও সিন্ধু সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে, উদ্ভিদ–পরিবৃতা দেবীমূর্তির খোঁজ মিলেছে, অনুমান করা হয়, ইনি হলেন শস্যের দেবী। সিন্ধু সভ্যতায় নারীপুরুষের যোনি ও লিঙ্গের মূর্তি পাওয়া গেছে। এই লিঙ্গমূর্তি তথা শিশ্নদেব আবার ঋগ্বেদে ধিক্কৃত হচ্ছেন। যেমন ঋগ্বেদে প্রার্থনা করা হচ্ছে, 'সেই প্রভু ইন্দ্র বিষম প্রাণীর শাসনে যেন আমাদিগকে উৎসাহ দেন এবং শিশ্নদেবগণ যেন আমাদের ঋতকে পরাজিত না করে'।আরেক জায়গায় আছে, 'অন্নের প্রাপয়িতা (ইন্দ্র) শত্রুদের ধন বিভাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া দুষ্ট পতন হইতে রক্ষার্থে নিকটে বসিয়া আছেন; সংগ্রামে বলপূর্বক শিশ্নদেবগণকে হত্যা করিতে করিতে (তিনি) শতদ্বার-বিশিষ্ট ধন (শত-দূরস্য বেদঃ) অভিভূত করেন'।

যোগসাধনাও আদিতে ছিল কোনো অবৈদিক সাধন পদ্ধতি। সিন্ধু সভ্যতার শিব ও অন্যান্য যোগীমূর্তির প্রত্ন নিদর্শন থেকে অনুমান করা যায়, তখন যোগ সাধনার প্রচলন ছিল। কৌষীতকি উপনিষদে ইন্দ্র আস্ফালন করছেন, 'আমি ত্রিশীর্ষ ত্বষ্টৃপুত্রকে হত্যা করেছি; আমি অরুন্মুখ যতিগণকে সালাবৃকগণের মুখে অর্পণ করেছি।' এখানে 'ত্রিশীর্ষক' হচ্ছে তিনটি শিংবিশিষ্ট। যেরকম মূর্তিকে জন মার্শালের মতো ইতিহাসবিদরা শিবের মূর্তি বলে অভিহিত করেছেন। 'যতি' অর্থে যোগী, যাকে সালাবৃকগণের অর্থাৎ হায়না বা নেকড়ে জাতীয় প্রাণীর মুখে তুলে দিয়েছিলেন ইন্দ্র। মুণ্ডকোপনিষদ বা গীতায় স্পষ্টভাবেই এই 'যতি'দের যোগী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই 'যতি' তথা যোগীদের হায়না বা নেকড়ের মুখে তুলে দেওয়ার উল্লেখ শুধু কৌষীতকি উপনিষদেই

আবদ্ধ নেই, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় সংহিতা, শতপথ ব্রাহ্মণ এবং জৈমিনীয় ব্রাহ্মণেও উল্লেখ আছে। এই উদাহরণগুলো দু'টো জিনিসকে সামনে আনছে – প্রথমত, এগুলোর মধ্যে দিয়ে আর্য এবং সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসী তথা অনার্যদের সংঘাতগুলো ফুটে উঠছে। দ্বিতীয়ত, শিশ্নদেব বা ত্রিশীর্ষক অর্থাৎ শিবকে পরাস্ত করা কিংবা যতিদের হত্যা করা এবং ঊষাকে পরাস্ত করা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে একটা কথা প্রমাণ হচ্ছে এই সমস্ত দেবদেবীর ধারণাই আর্য-পূর্ববর্তী। অবৈদিক এই সব দেবদেবী এবং অবৈদিক উপাচার, সাধনপদ্ধতিকে আর্যরা মেনে নিতে না পারায় এই সংঘাত। ৫) সিন্ধু সভ্যতার সময়কার সিলমোহরগুলো দেখে অনুমান করা হয় যে ওই সময় বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের ধারণা, মিশর ও সুমেরীয়দের সাথে নৌপথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। যদিও কোনো কোনো ঐতিহাসিক এই বাণিজ্যের তত্ত্বকে মানতে রাজি নন। ৬) এই সময় সমাজ সম্ভবত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এদের মধ্যে মৃতদেহ দাহ করার এবং সমাহিত করার দু'ধরনের অন্ত্যেষ্টি প্রক্রিয়ারই প্রচলন ছিল। সম্ভবত দুই শ্রেণীর জন্য দু'ধরনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চালু ছিল। ঐতিহাসিকদের অনুমান হল, এই সমাজ অন্তত এক হাজার বছর টিকে ছিল। ৭) আর্যসভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার একটা বৈশিষ্ট্যসূচক পার্থক্য হল আর্যসভ্যতার মতো এই সভ্যতায় ঘোড়া বা ঘোড়া চালিত রথের ব্যবহার দেখা যায় না। চাকার ব্যবহার ছিল, কিন্তু চাকায় স্পোকের ব্যবহার দেখা যায়নি, আর্যসভ্যতায় যা দেখা গেছে। এছাড়া সিন্ধু সভ্যতার মানুষ লিপির আবিষ্কার করেছিল। তারা লিপির ব্যবহার জানত। প্রত্নতত্ত্ববিদরা যদিও সেই লিপির মানে উদ্ধার করতে পারেনি কিন্তু আর্যরা লিপির ব্যবহার জানত না, তাই বেদের কোনো লিখিত রূপ ছিল না। আমরা জানি মুখে মুখে প্রচারিত হত বলেই বেদের অপর নাম 'শ্রুতি'। ৮) সিন্ধু সভ্যতার সমাজে ছিল সম্ভবত ব্রোঞ্জের যুগের নাগরিক সংস্কৃতি। কৃষির ব্যবহার তো তাঁরা জানেতেনই, পাশাপাশি পশুপালন এবং মৃগয়া করা ছাড়াও ধাতুবিদ্যা এবং বয়নশিল্পও যেমন তাঁদের জানা ছিল, তেমনই তাঁরা অলঙ্কারের প্রয়োজনে বহুমূল্য পাথর খোদাইয়ের কাজও করতে পারতেন। সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর 'ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য' বইটির মুখবন্ধে দাবি করেছেন যে, এই প্রাগার্য সভ্যতার অধিবাসীরা তুলা চাষ করে সুমেরীয়দের কাছে বিক্রি করত, এমন প্রমাণও আছে। মনে রাখতে হবে, এই সভ্যতার মূল অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল কৃষি। সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কৃষিকাজের চল ছিল এবং তার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল নাগরিক সভ্যতা। একটা বিরাট শস্যভাণ্ডার তথা গোলাঘরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। ৯) সিন্ধু সভ্যতা নিশ্চিতভাবেই ছিল আর্য-পূর্ব সভ্যতা, কেননা সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল কৃষির উপর ভিত্তি করে, কৃষির বিকাশ ছাড়া এত বড়ো নগর সভ্যতা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। উল্টো দিকে বৈদিক সভ্যতা ছিল প্রথমাবস্থায় পশুপালন নির্ভর, বৈদিক সাহিত্যেই তার প্রমাণ আছে। যে কারণে বৈদিক যুগে কোনো নগর সভ্যতা গড়ে ওঠেনি। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় বললে, 'বৈদিক ও প্রাক্‌বৈদিক সংস্কৃতির মূলে এই অর্থনৈতিক পার্থক্যের কথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সংস্কৃতির সত্তা নিরালম্ব নয়; শেষ পর্যন্ত তা অর্থনৈতিক জীবনের উপর নির্ভরশীল।' দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আরো বলেছেন, 'সিন্ধু-যুগেই এ-সভ্যতা সুস্পষ্টভাবে ভারতীয় সভ্যতার রূপ গ্রহণ করেছে এবং ওই সিন্ধু সভ্যতাই আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান ভিত্তি। কেননা, নির্মাণ কৌশল, কারুশিল্প – এবং বিশেষ করে বেশভূষা

এবং ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে – মোহেনজো-দাড়োর আবিষ্কৃত বৈশিষ্ট্যগুলিই সমগ্র ঐতিহাসিক যুগ ধরে ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য হয়ে থেকেছে।'

সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের কারণ

একদল হিন্দুত্ববাদী পণ্ডিত দীর্ঘদিন ধরেই দাবি তুলে আসছেন যে, এদেশের প্রাচীন সভ্যতা হল বৈদিক সভ্যতা। বেশ কিছু সুস্পষ্ট প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সিন্ধু সভ্যতাকে বৈদিক মানুষের কীর্তি বলে কল্পনা করেন। কিন্তু বিভিন্ন পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে যে ব্যাপারগুলো আজ স্পষ্ট তা হল – ১) সিন্ধু সভ্যতা বৈদিক সভ্যতার চেয়ে প্রাচীন। হরপ্পা সভ্যতা কমপক্ষে তিনহাজার বছরের পুরোনো, যেখানে ঋগ্বেদ রচিত হয়েছিল তার অনেক পরেই। ২) দুটো সভ্যতার ফারাকও লক্ষণীয়। সিন্ধু সভ্যতা ছিল মূলত কৃষিনির্ভর সভ্যতা, যেখানে বৈদিক সভ্যতার শুরুর দিকে তা ছিল মূলত পশুপালন নির্ভর সমাজ। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, একটিমাত্র প্রকটভাবে অর্বাচীন সূক্ত ছাড়া ঋগ্বেদের দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডলের কোথাওই জমিতে লাঙলের উল্লেখ নেই।

আজ পারিপার্শ্বিক প্রমাণাদির দাবি হল, বৈদিক মানুষদের পক্ষে সিন্ধু সভ্যতা গড়ে তোলা তো অসম্ভবই ছিল, বরং তারাই সিন্ধু সভ্যতার মতো এত উন্নতমানের একটা সভ্যতার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণাদি দেখাচ্ছে যে প্রথমত, কোনো এক লিপিহীন প্রাক-সভ্য মানবদলের আক্রমণেই সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয়েছিল। বৈদিক যুগের শুরুতে আর্যদের কোনো লিপি ছিল না, তা আমরা জানি। মুখে মুখে রচিত ছিল বলে বেদের অপর নাম ছিল 'শ্রুতি'। দ্বিতীয়ত, হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর নগরগুলি বারবার গড়ে তোলার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম দিকের স্তরগুলো যেখানে ছিল সুপরিকল্পিত, শেষের দিকে তা আর দেখা যাচ্ছে না। নাগরিকরা মাটিতে গয়নাগাটি পুঁতে রাখছে। উঠোনে বা সিঁড়িতে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা মৃতদেহের কঙ্কাল, এক কথায় নগর আক্রান্তের ছবি পরিষ্কার।

পাশাপাশি ঋগ্বেদের যুগে আমরা আগেই কিছুটা দেখানোর চেষ্টা করেছি আর্য, অনার্য সংঘাতের নানা দিকটা। বারবার সেখানে পুর বা নগরগুলি আক্রমণ করে বিপর্যস্ত করা হয়েছে। পুর বা নগর বিধ্বস্ত করায় সিদ্ধহস্ত ছিল বলেই ইন্দ্রের অপর নাম ছিল 'পুরন্দর'। এছাড়া ইন্দ্রকে 'অসুরঘ্ন' বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। অনুমান করা কঠিন নয় যে, এই অসুররা অনার্য গোষ্ঠীর লোকজন ছাড়া কেউ নয়!

তবে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ ডি ডি কোশাম্বি আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিককে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, শুধুমাত্র যুদ্ধে পরাজয়ের কারণেই সিন্ধু সভ্যতার মতো এত বড়ো একটা সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেল, তা সত্যিও নয়, এটা বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণও নয়। আর্যরা সিন্ধু সভ্যতার বাসিন্দাদের শুধু পরাজিতই করেনি, উপরন্তু তাদের অর্থনীতির ভিত্তি অর্থাৎ কৃষিব্যবস্থাতেই আঘাত হেনেছিল। আমরা আগেই বলেছি, সিন্ধু সভ্যতায় বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে চাষাবাদ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। যার উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে নগর বা পুরগুলি। সঠিক প্রণালীবদ্ধ জলসেচ ছাড়া, এরকম বিস্তৃত একটা অঞ্চলে চাষাবাদ করা সম্ভব নয়। ছোটো ছোটো নদীবাঁধ দিয়ে সেই জলসেচ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, যা বন্যা প্রতিরোধের পাশাপাশি ক্ষেতের জল

সরবরাহও করত। আর্যরা এর উপরেই আঘাত হেনেছিল। তারা নদীবাঁধগুলো ধ্বংস করে দিয়েছিল। ইন্দ্রের 'বৃত্রাসুর বধ'-এর বর্ণনা আসলে এরকমই এক উদাহরণ, যেখানে বলা হচ্ছে, বৃত্রাসুর সাপের মতো হয়ে নদীর জলকে আটকে রেখেছেন। ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বজ্র দিয়ে আঘাত হানার সঙ্গে সঙ্গে জল আবার গড়িয়ে চলতে শুরু করেছে। বা কোথাও বলা হচ্ছে, ইন্দ্র নদীকে মুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে নদী শতধারায় বেগবতী হচ্ছে। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের কীর্তিগাথায় বারবার বলা হচ্ছে, তিনি নদীকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

সিন্ধু সভ্যতা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আপাতত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'ভারতীয় দর্শন' থেকে একটা উক্তি দিয়ে শেষ করছি। ভারতীয় দর্শন এমনকি হিন্দু দর্শনকে বুঝতে গেলে তাঁর এই কথাটা আমাদের মাথায় রাখাটা আবশ্যক। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'কিন্তু আধুনিক বিদ্বানদের রচনায় প্রাচীন আর্য সংক্রান্ত এ-জাতীয় নানা মতের উত্থান-পতন সত্ত্বেও সুদীর্ঘ দিন ধরে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে যে-ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাকে মোটের উপর আর্য-কেন্দ্রিক বা বেদ-কেন্দ্রিকই বলতে হবে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি মানে বুঝি আর্য-সংস্কৃতিই : বৈদিক ধর্মই ভারতের প্রধান ধর্ম, বৈদিক দর্শনই ভারতের প্রধান দর্শন; ইত্যাদি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, ভারতীয় সংস্কৃতির উপাদান বলতে যেটুকু বেদ-বহির্ভূত বা অনার্য সেটুকুই এ-সংস্কৃতির স্থূল ও কদর্য দিক। অতএব সে প্রত্যাহার করে, বিশুদ্ধ বৈদিক ঐতিহ্যকেই আমরা ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ বলে সনাক্ত করব।

আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে এ-জাতীয় সংস্কারের প্রভাব যে কত গভীর ও ব্যাপক তার পরিচয় অত্যন্ত সুবিদিত। এবং এ-সংস্কার শুধু আধুনিক যুগেই নয়: আমরা আগেই দেখেছি সমগ্র মধ্যযুগ ধরে বেদ-নিরপেক্ষ দার্শনিক সম্প্রদায়গুলিকে কীভাবে শ্রুতিমূলক করে তোলবার প্রচেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সত্যিই কি এইভাবে বৈদিক ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করেই ভারতীয় সংস্কৃতির বাস্তব ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব? সম্প্রতি কোনো কোনো আধুনিক বিদ্বানের মনে এ-বিষয়ে গভীর সংশয় জাগতে শুরু করেছিল এবং তাঁরা ভারতীয় ঐতিহ্যে অবৈদিক বা আর্য-বহির্ভূত উপাদানগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করছিলেন। কিন্তু একটি প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায়নি: বেদ-বহির্ভূত এই উপাদানগুলির উৎস কী এবং ভারতীয় সংস্কৃতিকে এগুলি কেন এমন গভীরভাবে প্রভাবিত করল? সাম্প্রতিক-কালের প্রত্নতত্ত্বমূলক আবিষ্কার – সিন্ধু-সভ্যতা আবিষ্কার – শুধু যে এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর দিয়েছে তাই নয়; তারই ফলে ওই সাবেকী আর্যকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে ধূলিসাৎ হয়েছে। অতএব আজকের দিনে এই সিন্ধু-সভ্যতার কথা বাদ দিলে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের যে-কোনো পরিচিতি অবাস্তব হতে বাধ্য।' শ্রদ্ধেয় দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যটা সবসময় আমাদের মাথায় রাখা জরুরি, কারণ হিন্দুত্ববাদীদের মতাদর্শটা আবার উক্ত বৈদিক বিশুদ্ধতার উপরই দাঁড়িয়ে আছে, যা বাস্তবত হিন্দুধর্মের ব্যাপক অংশের জনগণের সাথে তাঁদের বিচ্ছিন্নতা ঘটাতে বাধ্য। বস্তুতপক্ষে 'হিন্দুধর্ম' আর 'হিন্দুত্ব' দুটো যে এক জিনিস নয়, হিন্দুধর্ম যার মধ্যে বহু ধরনের দার্শনিক চিন্তা এবং অনুশীলনের সংমিশ্রণ ঘটেছে, যার একটা বহুমাত্রিক চরিত্র আছে, তাকে অস্বীকার করে হিন্দুধর্মকে একটা একমাত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় বাঁধতে হিন্দুত্ববাদীরা এই বিশুদ্ধ

আর্যতত্ত্বকেই বারবার সামনে এনেছেন। তাঁদের এই ভুল প্রচারকে কিংবা ভ্রান্ত ধারণাকে বুঝতে গেলে সিন্ধু সভ্যতা নিয়ে আমাদের আরো বেশি চর্চা করা জরুরি।

বৈদিক সাহিত্যের যুগ তথা বৈদিক সভ্যতা

ইরফান হাবিব, রামশরণ শর্মা এবং সুকুমারী ভট্টাচার্যদের মতো ইতিহাসবিদদের মতানুযায়ী বলা যায়, বৈদিক সাহিত্য মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব পনেরোশো শতকে সম্ভবত ভারতের বাইরেই শুরু হয়ে, এদেশে খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতক অবধি রচিত হয়েছিল। ঋগ্বেদের একাংশ বাইরেই রচিত হয়েছিল, কিছু অংশ অবশ্য এদেশে আসার পরও রচিত হয়। প্রতিটি বেদেরই দু'টো ভাগ – কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ড অর্থাৎ সংহিতা ও ব্রাহ্মণ এবং জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ আরণ্যক ও উপনিষদ।

সুকুমারী ভট্টাচার্য আরো নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, ১) ঋগ্বেদের রচনাকাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতক থেকে দশমের শেষ বা নবমের শুরুর শতক পর্যন্ত ছিল। ২) যজুর্বেদ, সামবেদ, প্রাচীন ব্রাহ্মণগুলি এবং অথর্ববেদের প্রাচীনতম অংশগুলি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব নবম শতক থেকে সপ্তম শতক অবধি রচিত হয়েছিল। ৩) পরবর্তী ব্রাহ্মণগুলি এবং উপনিষদ খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকে পঞ্চম শতক অবধি রচিত হয়েছিল এবং সূত্রসাহিত্যগুলি খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতক থেকে চারশত খ্রিস্টাব্দ অবধি লিখিত হয়েছিল।

বেদ এবং প্রাচীন ধর্ম সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১) ভারতে বেদের মধ্যে ঋগ্বেদই হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন। এর মধ্যে রয়েছে প্রায় ১০১৯টি মন্ত্র বা স্তোত্র বা শ্লোক। এই মন্ত্র বা স্তোত্রগুলো কারোর একার রচনা নয়। স্তোত্রগুলোর সাহিত্যমূল্য সময়ানুসারে বেশ উঁচুদরের। মূলত অগ্নি, বায়ু, বরুণ, সূর্য বা সবিতা ইত্যাদি দেবতাদের উৎসর্গ করেই এগুলো লেখা হয়েছিল।

২) সামবেদ হল গানের বেদ। এর শ্লোকের পরিমাণ অল্প। এর অনেকগুলো নতুন শ্লোক বলা যেতে পারে ঋগ্বেদেরই পুনরাবৃত্তি। কী সুরে বা কী ধ্বনিতে এই শ্লোকগুলো উচ্চারিত হবে তারই নির্দেশ দেওয়া আছে এই শ্লোকগুলোতে।

৩) যজুর্বেদও প্রধানত ঋগ্বেদের মন্ত্র বা শ্লোকগুলোকেই সমন্বিত করা হয়েছে। যাগযজ্ঞ, উৎসর্গ করার ব্যাপারে এই বেদে নির্দেশ দেওয়া আছে।

৪) অথর্ববেদ হচ্ছে বেদসমূহের শেষতম রচনা। এর স্তবকগুলো গদ্যে এবং পদ্যে রচিত। সাধারণ মানুষের অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, তাবিজ, কবচ, মন্ত্র, জাদুটোনা, তুকতাক এইসব বিষয় সংক্রান্ত।

৫) ব্রাহ্মণসমূহ বেদের সঙ্গে যুক্ত এবং এগুলোতে যাগযজ্ঞ ইত্যাদির ব্যাখ্যা সমন্বিত টীকাগুলি পাওয়া যায়। আরণ্যকগুলি বানপ্রস্থ অবলম্বনকারী মানুষদের দ্বারা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রচনা করা হয়েছিল। বৈদিক যাগযজ্ঞের তাৎপর্য সংক্রান্ত কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও এতে পাওয়া যায়।

৬) সূত্রগুলি মূলত ব্রাহ্মণগুলির মূল বক্তব্যের সূত্রায়িত অংশ।

৭) উপনিষদগুলিতে দার্শনিক বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে জ্ঞানের মাধ্যমে বিশ্বকে জানার বা উপলব্ধি করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেছে উপনিষদে। তাই জীবন, মৃত্যু এবং বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে নানা প্রশ্নকে খোঁজার চেষ্টা হয়েছে এতে।

শাস্ত্রে ১০৮টি উপনিষদের তালিকা আছে, এর মধ্যে ১৩টি বেদ-ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট হিসাবে বিশুদ্ধ বলে গণ্য হয়। উপনিষদের যুগেই প্রথমদিকে জন্মান্তরবাদের উৎপত্তি হয়। ওই সময়ই আরো পরের দিকে আসে কর্মফলের ধারণা (অর্থাৎ, এজন্মের দুঃখ আসলে হচ্ছে গত জন্মের কৃতকর্মের ফল... ইত্যাদি।), যা আসলে তদানীন্তন সমাজকে আরো বেশি স্থায়িত্ব দিয়েছিল।

বেদের পর লেখা হয়েছিল বেদাঙ্গ। বেদাঙ্গগুলি ছয়প্রকারের – শিক্ষা, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ, নিরুক্ত ও কল্প। শেষোক্ত কল্প-সূত্রের আবার চারটি উপবিভাগ। শ্রৌত (যজ্ঞ, অনুষ্ঠান বিধি), গৃহ (দৈনন্দিন ও পারিবারিক অনুষ্ঠান নিয়ম), ধর্ম (সামাজিক বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধি), এবং (মূলত বেদি নির্মাণ সংক্রান্ত)।

আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে মনে করা হয় যে, বেদাঙ্গ সাহিত্যের অধিকাংশ খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে খ্রিস্টিয় তিন শতকের মধ্যে রচিত হয়েছিল।

বেদ সাহিত্যকে মূলত দু'টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, কর্মমূলক এবং জ্ঞানমূলক। গুপ্তযুগে বৈদিক সাহিত্যকে ব্যাখ্যা করে একাধিক শাখা গড়ে ওঠে। এর মধ্যে প্রথম অংশটির অর্থাৎ কর্মমূলক অংশটির ব্যাখ্যা করার কাজ করেছিল বৈদিক পণ্ডিতদের যে শাখা, তার নাম দেওয়া হয় পূর্ব-মীমাংসা এবং জ্ঞানমূলক অংশ অর্থাৎ উপনিষদের উপর আলোচনা করেছিল যে শাখা, তাকে বলা হয় উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত শাখা।

বৈদিক সাহিত্যের এই দেড় হাজার বছরের ইতিহাস কিন্তু স্থবির নয়। এটা হচ্ছে আর্যদের পশুপালনের স্তর থেকে শ্রেণীসমাজ গঠনের পর্যায়ে যাত্রার এক দীর্ঘ পথ পরিক্রমা। বেদের যুগের শেষ পর্বে অর্থাৎ উপনিষদের পর্বে এসে জন্ম নিচ্ছে জন্মান্তরবাদ, মায়াবাদের মতো নতুন নতুন ধ্যানধারণা, ভাবনা। বেদান্তের আবির্ভাবের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে প্রখ্যাত মার্কসবাদী দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তার 'লোকায়ত দর্শন' বইটিতে বলছেন – 'বেদ আর বেদান্তের মধ্যে একটা যুগান্তরের ইতিহাস আছে – প্রাচীন প্রাক্‌বিভক্ত পর্যায় থেকে একটি শ্রেণীবিভক্ত পর্যায়ে এসে পড়ার ইতিহাস। বেদের পর ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের পর উপনিষদ বা বেদান্ত। ঋক্‌বেদের যুগের শেষেই এবং ব্রাহ্মণের যুগে আরো স্পষ্টভাবে প্রাক্‌বিভক্ত প্রাচীন সাম্য সমাজ ভেঙে পড়ার ছবি দেখতে পাওয়া যায়। প্রাক্‌-বিভক্ত সমাজে সকলেই সমানভাবে যৌথশ্রমে অংশগ্রহণ করে, তাই শ্রম বা কৌশল বা craft সেই পর্যায়ে নিন্দিত বা হেয় বলে পরিগণিত নয়। কিন্তু সমাজের এই যৌথ সংগঠন ভেঙে যতই শ্রেণীবিভাগ ফুটে উঠতে থাকে – সমাজের শাসকমহল শ্রমের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থেকে যতই মুক্ত হয় – ততই এই শ্রম হেয় বা হীনবৃত্তি বলে পরিগণিত হতে থাকে। কেননা, নব পরিস্থিতিতে যে শ্রেণীর মানুষের উপর এই শ্রমের দায়িত্ব, সামাজিকভাবে তারা মর্যাদাহীন হয়ে দাঁড়ায়। এই নব্য পরিস্থিতিতে কীভাবে মানবচেতনায় ভাববাদের আবির্ভাব হয় তার সাধারণ যুক্তি আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। ভারতীয় দর্শনের বিশিষ্ট ক্ষেত্রে ভাববাদের আবির্ভাব প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, যে উপনিষদ বা বেদান্তে এই ভাববাদের আবির্ভাব তার নাম জ্ঞানকাণ্ড। বেদান্তে শুধু যে জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে বিরোধ কল্পিত হয়েছে তাই নয়, কর্ম নিন্দিত হয়েছে এবং একমাত্র জ্ঞানের গৌরবই স্বীকৃত হয়েছে।'

অনুরাধা গান্ধির 'স্ক্রিপ্টিং দ্য চেঞ্জ' বইটিতে এদেশে জাতি-বর্ণব্যবস্থার উৎস খুঁজতে গিয়ে যে কালপর্বকে ভাগ করা হয়েছে, তাতে তিনি দেখাচ্ছেন – ১) খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ শতক থেকে

খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ শতক অবধি আর্যদের পশুপালন পর্ব থেকে কৃষিকর্মের বিস্তারের পর্ব। ২) ৫০০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত শূদ্র শ্রমজীবীদের উপর নির্ভর করে কৃষিকাজের বিস্তার ঘটছে। এই কালপর্বেই বাণিজ্যের বিস্তার ও অবনমন লক্ষ করা যাচ্ছে এবং ছোটো রাজ্যের উৎপত্তি হচ্ছে। ৩) খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতক থেকে সামন্ততন্ত্র আরো বিকশিত হচ্ছে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থা জটিল জাতি-বর্ণব্যবস্থায় রূপান্তরিত হচ্ছে। যদিও ইতিহাসবিদরা আজ প্রায় প্রত্যেকেই স্বীকার করছেন যে, কুষাণ রাজত্বের সময় থেকেই বর্ণব্যবস্থার জাতি-বর্ণব্যবস্থায় রূপান্তরের সূত্রপাত।

আমরা জানি, মার্কসবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সাথে সাথে সমাজে উৎপাদন সম্পর্কগুলো পরিবর্তিত হয় এবং সেই অনুযায়ী সমাজের রাজনীতি, অর্থনীতি, রীতিনীতি আচার-আচরণ, সংস্কৃতির পরিবর্তন হয় এবং তার সাথে সাযুজ্য রেখেই সমাজে উৎপত্তি হয় নতুন নতুন দর্শন বা মতবাদের। আর্যসভ্যতার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। একেবারে শুরুর দিকে দেখব, যখন মূলত আর্যরা পশুপালনের স্তরে রয়েছে, তখন তারা মুখ্যত প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট রাখতে নানারকম যাগযজ্ঞ ইত্যাদি করত। প্রসঙ্গত, এখানে আমরা ধর্মের উদ্ভব সম্পর্কে মার্কসবাদী ব্যাখ্যাটা একটু বুঝে নেব। বস্তু এবং চেতনার মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্নে মার্কস স্পষ্টতই মনে করতেন, বস্তুনিরপেক্ষভাবে চেতনার কোনো অস্তিত্ব নেই, তাই চেতনা শুরু থেকেই একটা সামাজিক সৃষ্টি, যতদিন মানুষ থাকবে ততদিন চেতনার অস্তিত্বও থাকবে। মার্কস মনে করতেন, 'মানুষের জীবনে ধর্মীয় জগৎ হচ্ছে বাস্তব জগতেরই প্রতিফলন।' মানুষের মনে ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া, এবং প্রাকৃতিক নানা শক্তির শক্তিমত্তা সম্পর্কে মানুষের আশঙ্কা ধীরে ধীরে সেই প্রাকৃতিক শক্তিগুলি সম্পর্কে কীভাবে ভয়ভীতি তৈরি করে, তার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এঙ্গেলস তাঁর 'এ্যান্টি ড্যুরিং' বইটিতে বলেছেন, 'সব ধর্মই হচ্ছে মানুষের মনের মধ্যে সেই বহির্শক্তির একটা উদ্ভট প্রতিফলন, যে শক্তিগুলি তাদের প্রাত্যহিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটা এমন এক প্রতিফলন যেখানে পার্থিব শক্তিগুলি কতগুলো অতিপ্রাকৃতিক শক্তির রূপ পরিগ্রহ করে। ইতিহাসের প্রথম দিকে প্রাকৃতিক শক্তিগুলির প্রভাবেরই প্রতিফলন ঘটেছিল এবং পরে সেগুলি আরো বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপকতম বৈচিত্রতার সাথে বিভিন্নভাবে মূর্তরূপ ধারণ করেছে।'

মার্কসের ধর্ম-সংক্রান্ত গবেষণার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জর্জ টমসন দেখিয়েছিলেন, একদিকে প্রকৃতি সম্পর্কে অজানা আশঙ্কা, পাশাপাশি প্রকৃতি এবং সৃষ্টি রহস্যকে জানার প্রচেষ্টা থেকেই ধর্ম ও বিজ্ঞান দুটো ধারারই বিকাশ ঘটেছিল। প্রকৃতি সংক্রান্ত অজানা আশঙ্কা থেকে প্রথমে উৎপত্তি হয়েছিল জাদুবিদ্যার। এই জাদুবিদ্যা আবার দুটো ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। একটা বিকশিত হয় বিজ্ঞানের ধারায়, আরেকটা থেকে সৃষ্টি হয় ধর্মের। প্রকৃতির নিয়মাবলী অজানা থাকার ফলে, যারা প্রকৃতির মধ্যেকার সমস্যাকে জানার জন্য বস্তুজগতের মধ্যেই নিয়মাবলীকে খুঁজে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন, তাদের হাত ধরে যেমন শুরু হয়েছিল বিজ্ঞানের পথচলা, তেমনই আবার প্রকৃতির কাছে শুরুতেই আত্মসমর্পণ করা এবং প্রকৃতির মধ্যে তার সমস্যার সূত্রগুলোকে না খুঁজে নিজেদের মনোগত কল্পনার সাহায্যে তাকে খোঁজার প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে উৎপত্তি হয়েছিল ভাববাদ তথা ধর্মীয় চিন্তাধারার।

সিন্ধু সভ্যতার ক্ষেত্রে কিংবা আর্যদের সমাজের ইতিহাসেও সমাজবিজ্ঞানের এই মার্কস বর্ণিত গতিই লক্ষ করা যাবে। অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য যেমন সিন্ধু সভ্যতার গোড়াপত্তন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তাঁর 'প্রাচীন ভারতে দ্বন্দ্ব ও সামাজিক পরিবর্তন' প্রবন্ধে সিন্ধু সভ্যতার আভ্যন্তরীণ শর্ত এবং বাহ্যিক ভিত্তির দিকটিকে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, মেসোপটেমীয় সভ্যতার প্রভাব হল পরিবর্তনের শর্ত। এই শর্ত কার্যকরী হতে পেরেছিল দুটো আভ্যন্তরীণ কারণের জন্য। যা হল, উপমহাদেশের বাস্তব পরিস্থিতি এবং সামাজিক প্রস্তুতি।

আবার আমরা দেখব ঋগ্বেদের শুরুতে আর্যরা ছিল অনেকটাই পশুপালন-নির্ভর যাযাবর গোষ্ঠীভুক্ত। সমাজের উৎপাদিকা শক্তিও ছিল খুবই পিছিয়ে পড়া। সুকুমারী ভট্টাচার্য 'বেদের যুগে ক্ষুধা ও খাদ্য' বইটিতে দেখিয়েছেন ঋগ্বৈদিক যুগে মূলত দেবতাদের প্রশস্তিমূলক স্তবগুলি বাদ দিলে নিরাপত্তা, পরমায়ু, সম্পত্তি এবং খাদ্যের জন্য প্রার্থনা করা হত। দেবতা বলতে সেই সময় প্রকৃতির নানা উপাদানকে ভাবার রেওয়াজ ছিল। আর্যরা ছিল মূলত প্রকৃতির উপাসক। অগ্নি, বায়ু, সূর্য, বিভিন্ন নদ-নদী, প্রস্তরখণ্ড, এমনকি ইন্দ্রের দুটো ঘোড়া, সবাইকে তারা দেবতা-জ্ঞানে পূজা করত। খাদ্যের টানাটানি যে প্রবল ছিল, তা তাদের বিভিন্ন মন্ত্রে দেবতাদের কাছে খাদ্য প্রার্থনার বহর দেখলেই বোঝা যায়। বস্তুত ঋগ্বৈদিক যুগের শ্লোকগুলিতে ছিল প্রকৃতির কাছে অসহায় আত্মসমর্পণের প্রতিফলন।

সমাজে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সাথে সাথে মানুষ যখন উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি করতে শুরু করল, এক শ্রেণীর মানুষের শ্রম আত্মসাৎ করে উদ্বৃত্ত মূল্য লুণ্ঠনের বিষয়টাই সমাজে শ্রেণীশোষণ তথা শ্রেণীবিভাজনের বস্তুগত ভিত্তি তৈরি করল, যা সর্বত্রই আদিম সাম্যবাদ থেকে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উৎপত্তি ঘটিয়েছিল। প্রথম দিকে ঋগ্বেদে যেমন মূলত প্রকৃতির উপাসনাই ছিল প্রধান, শেষ বেদ অর্থাৎ অথর্ব বেদে কিন্তু আমরা দেখব জাদুবিদ্যা অর্থাৎ তুকতাক, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি সংক্রান্ত আলোচনা লক্ষ করা যাচ্ছে এবং বেদের শেষ পর্বে গিয়ে অর্থাৎ উপনিষদের পর্বে, সুকুমারী ভট্টাচার্যের বক্তব্য অনুযায়ী যা খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকে পঞ্চম শতক অবধি রচিত হয়েছিল, এই সময় থেকেই একদিকে জন্ম নিচ্ছে ভাববাদ অর্থাৎ বেদান্ত দর্শন এবং জন্মান্তরবাদের সঙ্গে সঙ্গে কর্মফলের তত্ত্ব অর্থাৎ 'এজন্মের দুঃখ-কষ্ট আসলে গত জন্মের কর্মফলের পরিণাম' বা 'ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদের কারণ আসলে পূর্বজন্মের কর্মফল' — এই তত্ত্ব। এই সময় থেকেই শ্রেণীবিভাগ স্পষ্ট হতে আরম্ভ করছে। কৌম সমাজ ভাঙছে। পরিবার বা কুলের উৎপত্তি হচ্ছে। তীব্র শ্রেণীসংগ্রাম এবং শ্রেণীবৈষম্যের পরিণতিতে এবং শাসক, শোষকশ্রেণীর শাসন, শোষণকে দীর্ঘস্থায়ী রূপ দিতেই এই সমাজে শাসকশ্রেণীর স্বার্থবাহী এইসব মতবাদ আবির্ভূত হচ্ছে। পাশাপাশি এটাও মাথায় রাখতে হবে, উপনিষদের যুগেই কিন্তু প্রাথমিকভাবে আর্য সমাজে লোহার ব্যবহার হচ্ছে, যা উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটাচ্ছে। অর্থাৎ উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ শ্রেণীসমাজের জন্ম দিচ্ছে, শ্রেণীবৈষম্যের একটা মাত্রায় তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে দার্শনিক জগতে পরিবর্তন ঘটছে। আসছে জন্মান্তরবাদ, কর্মফলের তত্ত্ব এবং মায়াবাদের প্রাথমিক ধারণা, যা তৎকালীন সমাজের শাসকশ্রেণীর হাতকেই শক্ত করেছে সন্দেহ নেই।

জন্মান্তরবাদের উৎপত্তির প্রেক্ষাপটকে যদি আমরা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি, দেখা যাবে শুরুতে উৎপাদিকা শক্তির পশ্চাদপদতার কারণে সমাজে খাদ্য সংকট এবং অন্যান্য সংকট থেকে প্রথমে আসছে ইহজীবনের দুঃখের পরিণতি সংক্রা চিন্তা এবং তার থেকে দুঃখবাদ। সমাজের নানারকম যন্ত্রণা এবং বৈষম্যের কারণকে সামাজিক উৎসের মধ্যে না খুঁজে, কিছু সাধুসন্তের সমাজবিছিন্ন চর্চার মধ্যে খোঁজার মধ্যে দিয়ে এই জীবন দুঃখময় এধরনের ধারণার থেকে প্রথমে দুঃখবাদ জন্ম নিচ্ছে। পরে ইহজীবনের দুঃখকষ্ট থেকে সান্ত্বনা পেতে ধীরে ধীরে আসে জন্মান্তরবাদ। এই জন্মান্তরবাদের সাথে যখন কর্মফলের তত্ত্ব সংযুক্ত হয়, তা শূদ্রসহ শ্রমজীবী মানুষকে শোষণ, শাসনের একটা শক্তিশালী মতাদর্শগত হাতিয়ারে রূপান্তরিত হয়, যা আসলে শূদ্রদের উপর শোষণের ব্যবস্থাটাকে একটা তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর দাঁড় করায়।

যাই হোক, শ্রেণীব্যবস্থার প্রাথমিক রূপটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে তার সাথে সাযুজ্য রেখে তৈরি হল জন্মান্তরবাদ এবং কর্মফলের তত্ত্ব, যা নাকি মূলত উপনিষদের সময়কার। যাজ্ঞবল্ক্যই প্রথম কর্মফলের ধারণাটিকে নিয়ে আসেন। আবার মায়াবাদের ধারণাটিও প্রাথমিকভাবে তাঁরই চিন্তায় প্রতিফলিত হয়। ৬৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যাজ্ঞবল্ক্যই প্রথম এই জন্মান্তরবাদের ধারণার জন্ম দেয়, যা বৃহাদারণ্যক উপনিষদে লিপিবদ্ধ আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে সম্ভবত প্রথম কর্মফলের ধারণা এসেছিল। যেখানে বলা হয়েছিল, এক জন্মের পুণ্যফলেই অপর জন্মে উচ্চজাতিতে জন্মানো যায় এবং পূর্বজন্মের পাপীরাই এজন্মে নিম্নবর্ণে জন্মায়। ভারতবর্ষের শোষণ ও নিপীড়নমূলক সমাজের দার্শনিক ভিত্তি নির্মাণে যাজ্ঞবল্ক্যের এই তত্ত্ব যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা, এখনও আমরা এই ভাববাদী মোহান্ধতা থেকে মুক্ত হতে পারিনি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও উল্লেখ আছে, 'শূদ্রের ন্যায়... অপরের সেবকরা, ইচ্ছামতো দূর করে দেবার কিংবা হত্যা করবার যোগ্য।'

বর্ণবিভাজনের প্রশ্নটির ধারণা প্রথমে অস্পষ্টভাবে দেখা যায় ঋগ্বেদে। কিন্তু তখন তা শ্রেণীবিভাজনের অর্থে বোঝাত না। উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি তাৎপর্যপূর্ণ না হওয়ায়, সমাজ তখনও শ্রেণীবিভক্ত হয়ে পড়েনি। তখন আসলে চতুর্বর্ণবিভাজনের একটা অস্পষ্ট ধারণা তৈরি হচ্ছিল। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সংকলিত নব্বইতম সূক্তটিতে অর্থাৎ পুরুষ সূক্তটিতে আছে — দেবতারা এমন একজন পুরুষকে হব্যরূপে গ্রহণ করছেন, যাঁর সহস্র চোখ, সহ মস্তক এবং পদ, যিনি পৃথিবীকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করেও দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে অবস্থান করছেন। তাঁকে খণ্ড খণ্ড করেই বিশ্বসৃষ্টি হল। তাঁর মুখ থেকে ব্রাহ্মণ জন্মাল, বাহুযুগল থেকে রাজন্য জন্মাল, ঊরু থেকে বৈশ্য হল এবং চরণ থেকে হল শূদ্র। পরে যাজ্ঞবল্ক্য নিয়ে এলেন জন্মান্তর ও কর্মফলের তত্ত্ব। শুধু জন্মান্তরবাদই নয়, এই যাজ্ঞবল্ক্যই আবার মায়াবাদেরও অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন। তিনি বলতেন, মানুষের মধ্যে যে 'আত্মা' আছে সেটাই 'ব্রহ্ম' এবং জগতে একমাত্র 'ব্রহ্ম'ই সত্য, বাকি সব মিথ্যা। জন্মান্তরবাদ এবং কর্মফলতত্ত্ব তথা কর্মবাদই পরবর্তীতে বর্ণব্যবস্থার ভিত্তিকে শক্তিশালী করে, যা আরো পরে এসে জটিল জাতি-বর্ণব্যবস্থার জন্ম দেয়।

সুকুমারী ভট্টাচার্য 'হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা' সংক্রান্ত নিবন্ধে বলেছিলেন, 'হিন্দুধর্মের দুটি মূল স্তম্ভের উদ্ভাবন হয়েছিল আড়াই হাজারেরও বেশি বছর আগে, এ দুটি — জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদ যা পৃথিবীর কুটিলতম ও নিষ্ঠুরতম উদ্ভাবন। এর দ্বারাই নির্ধনের ওপর ধনীর, তথাকথিত

নিম্নবর্গের মানুষের ওপর উচ্চবর্ণের এবং দুর্বলের ওপর প্রবলের অত্যাচার কায়েম হয়ে রয়েছে। জন্মান্তর-কর্মবাদের প্রথম প্রতিজ্ঞা হল বিত্তবান উচ্চকুলস্থ পুরুষই সমাজের নিয়ন্তা।'

প্রসঙ্গত, বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায়ের 'দৈবেন দেয়ম্' প্রবন্ধে জন্মান্তর ও কর্মবাদ তথা কর্মফলবাদ নিয়ে তাঁর একটি সরস মন্তব্য উল্লেখের লোভ সংবরণ করতে পারছি না, তিনি লিখছেন, "...তাহার উপর আবার কর্মবাদের জগদ্দলপাষাণভার। শাস্ত্রবচনের যথার্থ মীমাংসা শুনিবার উৎসাহ মানুষের নাই, তাই লৌকিক স্থূলসিদ্ধান্তকেই ঋষিবাক্যের মুখোশ পরাইয়া মানুষ শাস্ত্রানুশাসনের নামে চালাইতে চায়। এই লৌকিক সংস্কার বলে কর্মবন্ধনে হাত পা বাঁধিয়া মানুষ সংসারে আসে। পূর্বজন্মের সুকৃত দুষ্কৃতের নাগপাশ এইজন্মের জীবনযাত্রাকে বেষ্টন করিয়া থাকে। এই জন্মে এখন তুমি দুর্দশাভোগ করিতেছ তাহার মূল কারণ তোমার 'পূর্বজন্মকৃতং পাপং'। পূর্বজন্মের কর্মফলবীজ তোমার মধ্যে উপ্ত রহিয়াছে, তাই ইহজন্মের জীবনবৃক্ষে তাহারই অনুরূপে ফল ফলিবে। এ জন্মে কাঁঠাল খাইবার সাধ রাখ, তবে ও-জন্মে কুষ্মাণ্ডবীজ রোপণ করিয়াছিলে কেন? এ জন্মে শূদ্র হইয়াছ অথবা অস্পৃশ্য 'পঞ্চম' হইয়া জন্মিয়াছ, সে তোমার কর্মফলের দোষ। তবে আর মাথা তুলিতে চাও কেন? অযথা আর্তনাদ কর কেন? সংসারে কেউ ছোট, কেউ বড়, ইহাই তো স্বাভাবিক নিয়ম, কর্মফল অনুসারে সকলে যথাযোগ্য আসন পাইয়া থাকে। সুতরাং যে যেমন আছ তাহাতেই তৃপ্ত থাকিয়া সুবুদ্ধি মানুষের মতো আপন পথে নির্দ্বন্দ্ব থাক, তাহা হইলে সুকৃত সঞ্চয় করিয়া ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে পরজন্মে হয়তো উচ্চতর পদবী লাভ করিবে।"

বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা এই জাতি-বর্ণব্যবস্থার সমালোচনা করে বলেছেন – "একজন মূর্খ পুরোহিত যে সংস্কৃত মন্ত্রের অর্থ না জানিয়াই শ্রাদ্ধ বা বিবাহের মন্ত্র পড়ায়, তাহার সামাজিক সম্মান তাঁতী বা মুচীর অধিক হইবে কেন? তাঁতী বা মুচী পরিশ্রম দিয়া সমাজের একটা বিশেষ কাজ করে, কিন্তু মূর্খ পুরোহিতকে প্রতারক ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? কসাইয়ের 'ছেলের' যদি প্রতিভা থাকে, তাহা হইলে ইউরোপে সে Shakespeare হইতে পারিত, কিন্তু এদেশে প্রাচীন প্রথা অনুসারে সে 'রবীন্দ্রনাথ' বা 'কালিদাস' হইতে পারিত না, হইবার চেষ্টা করিলে ভগবানের অবতার রামচন্দ্র স্বয়ং আসিয়া তাহার মাথা কাটিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম রক্ষা করিতেন।"

বর্ণব্যবস্থাকে তাত্ত্বিকভাবে সুদৃঢ় করেন বশিষ্ঠের শাস্ত্র এবং মনুসংহিতা। বর্ণব্যবস্থার কথা উঠলেই মনুর প্রসঙ্গ এসে পরে। তাই এব্যাপারে কিছুটা প্রাসঙ্গিক আলোচনা করে নেওয়া যাক। মনু কে ছিলেন এব্যাপারে কোনো সরল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। ঋগ্বেদে ঋষিগণের স্তুতিতে মনুর উল্লেখ আছে। দেবতাদের কাছে তাঁরা প্রার্থনা করে বলছেন যে, তাঁরা যেন পিতা মনু থেকে আগত পথ থেকে ভ্রষ্ট না হন। বেদের অন্যতম ব্যাখ্যাকার সায়নদেব তথা সায়নাচার্য ঋগ্বেদের যজ্ঞকর্তা মনুকে 'বৈবস্বত মনু' বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর মন্ত্রে আরেকজন 'সাবর্ণি মনু'র উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতে অসংখ্যবার মনুর কথা উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে কখনো 'স্বায়ম্ভুব মনু'র কথা আছে, কখনো 'প্রাচেতস মনু'র কথা উল্লেখ আছে। এরকম বেদ, পুরাণ সব মিলিয়ে নয়জন মনুর উল্লেখ পাওয়া যাবে। মনুসংহিতাতেই সাতজন মনুর জন্মের কথার উল্লেখ আছে। উল্লেখ আছে, ব্রহ্মা দশজন প্রজাপতি ঋষির জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁরা আবার সৃষ্টি করেছিলেন সাতটি জন্তু, দেবতা, ঋষি এবং সাতজন মনুকে (৩৫।১)। ফলত সব দিক দিয়ে

ভেবে দেখলে মনু কোনো একক ব্যক্তি নন। একাধিক জন। তবে এর মধ্যে 'বৈবস্বত মনু'-ই সবচেয়ে প্রাচীন। সায়নদেবের ভাষ্য অনুযায়ী ধরলে তিনি সম্ভবত ঋগ্বেদের চেয়েও প্রাচীন। মনুর যা কিছু নির্দেশ সবকিছু পাওয়া গেছে ভৃগুর কাছ থেকে। ভৃগু স্বয়ং মনু কিনা সে নিয়েও অনেক বিতর্ক আছে। বিভিন্ন টীকাকার এবং ঐতিহাসিকদের মতগুলির মধ্যে সবচেয়ে গ্রাহ্য মতটা হল, 'মনুসংহিতা' আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২০০ শতক থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দ এই সময়কালের মধ্যেই রচিত এবং বিবর্তিত হয়েছে। পাশাপাশি এটাও মাথায় রাখতে হবে, ঐতিহাসিক এবং টীকাকারদের অধিকাংশের মতই হল, পৌরাণিক মনু এবং 'মনুসংহিতা'র রচয়িতা মনুরা এক নন। তাঁদের মতে ঋগ্বেদ এবং মনুসংহিতার মধ্যে রচনাকালের ব্যবধান হল আনুমানিক ১৫০০ থেকে ১৬০০ বছরের। মনুসংহিতা প্রসঙ্গে এল এম এস ও'ম্যালে বলেছিলেন – 'মনু কোনো একজন বিশেষ ব্যক্তি নন। মনুসংহিতা হল মূলত একটি সংকলিত গ্রন্থ।' রুদ্রসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি এরকম চোদ্দোজন ব্রাহ্মণসমাজের ব্যক্তির লেখার এটি একটি সংকলন বলে অনুমান। 'মনুসংহিতা'র সর্বপ্রাচীন টীকাকার হলেন মেধাতিথি। তিনি ৯০০ খ্রিস্টাব্দে জন্মেছিলেন। মনুসংহিতা হল সম্পূর্ণরূপে আচরণবিধি নির্দেশক ধর্মশাস্ত্র। এতে রয়েছে ১২টি অধ্যায় এবং এতে শ্লোকের সংখ্যা ২,৬৮৫টি। একজন মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি কীভাবে চলবেন, কোনটা মানবেন, কোনটা গ্রহণ করবেন, কোনটা বর্জন করবেন ইত্যাদি সব উল্লেখ আছে। এমনকি কোন ধরনের স্খলনে কী ধরনের শাস্তি দিতে হবে, এতে তারও উল্লেখ আছে। বারোটি অধ্যায়ে রচিত মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে ১১৯টি শ্লোকে প্রলয়কালে জগতের রূপ, ব্রহ্মার রূপ, স্বর্গ-নরকের রূপ, নারী-পুরুষের কর্ম ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২৪৯টি শ্লোকে জাতি, কর্ম এবং সংস্কার নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ২৮৬টি শ্লোকে আলোচনা হয়েছে গুরু-আশ্রম, গৃহাশ্রম, বিবাহ-সংস্কার ইত্যাদি নিয়ে। চতুর্থ অধ্যায়ে গৃহস্থের আচরণবিধি ও জীবিকা নিয়ে রচিত হয়েছে ২৬০টি শ্লোক। পঞ্চম অধ্যায়ে শৌচ-অশৌচ, খাদ্যাখাদ্য ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই অধ্যায়ে শ্লোকের সংখ্যা ১৬৯টি। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৯৭টি শ্লোকের মধ্যে দিয়ে সন্ন্যাসধর্ম বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়টিতে মোট ২২৬টি শ্লোক, রাজধর্ম বিষয়ক। অষ্টম অধ্যায়টি বৃহত্তম অধ্যায়। এতে ৪২০টি শ্লোক। নারীদের উপর নানা বিধিনিষেধ বিষয়ক। নবম অধ্যায় দ্বিতীয় বৃহত্তম অধ্যায়। এতে আছে মোট ৩৩৬টি শ্লোক। এই অধ্যায়টি শূদ্রদের উপর চাপানো নানা অনুশাসন বিষয়ক। দশম অধ্যায়ে আছে নানা সঙ্কর জাতির বিবরণ ১৩১টি শ্লোকে। একাদশ অধ্যায়ের ২৬৬টি শ্লোক পাপ এবং তার প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক এবং বারোতম অধ্যায়টিতে ১২৬টি শ্লোকে চর্চা হয়েছে কর্মফল বিষয়ে।

বস্তুত মনুসংহিতার মধ্যে দিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শূদ্র এবং নারীর সামাজিক অবনমনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন, মনুর বিধানে বলা হয়েছে কোনো শূদ্র যদি কোনো ব্রাহ্মণকে গালি দেয় তবে তার শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড (৮।১৪), ব্রাহ্মণকে কর্কশ বাক্য দ্বারা অপমান করলে শূদ্রের শাস্তি হবে জিহ্বাছেদন (৮।২৭০), শূদ্র দর্পভরে ব্রাহ্মণকে হিতোপদেশ দিলে রাজা তার মুখে তপ্ত তেল সিঞ্চন করবেন (৮।২৭২)। অর্থাৎ শূদ্ররা শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের গালিগালাজ করা থেকেই বিরত থাকলে চলবে না, এমনকি তারা ধর্মবাক্য বা নীতিকথাও বলার অধিকারী হবে না। এক কথায় মনুর বিধান অনুযায়ী শূদ্রদের মুখ বুজে সব মেনে নিতে হবে। শূদ্রদের দমিয়ে রাখার নানা বিধানের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্যবাদকে প্রতিষ্ঠা করার নানা বিধান

মনুসংহিতায় রয়েছে। যেমন মনু বলেছেন, যত অপরাধই করুক ব্রাহ্মণকে কখনো হত্যা করা যাবে না, কেননা ব্রহ্মহত্যা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ আর কিছুই জগতে নেই (৮।৩৮০ এবং ৮।৩৮১)। ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে মস্তকমুণ্ডনই মুণ্ডচ্ছেদের সমতুল্য দণ্ড বলে মনু বিধান দিয়েছিলেন (৮। ৩৭৯)। মনু আরো বলেছিলেন, কোনোভাবেই শূদ্র ধন সঞ্চয়ের অধিকারী হবে না, কেননা তাহলে এই অর্থাগম তাকে অহংকারী করে তুলবে। সে আর ব্রাহ্মণকে মানবে না এবং তা ব্রাহ্মণের পক্ষে হয়ে উঠবে পীড়াদায়ক (১০।১২৯)।

কেন রচনা করা হয়েছিল মনুসংহিতা? কোনোরকম রাখঢাক না করেই মনুসংহিতায় বলা হয়েছে শূদ্রকে দিয়ে দ্বিজদের দাসত্ব করাতে (৮।৪১০)। মনুসংহিতায় শুধু শূদ্রই নয়, নারীর উপরও চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে নানা বিধিনিষেধ। মনুসংহিতার চোখে নারী ফসলোৎপাদন ক্ষেত্র। নারীর চিত্ত কখনো শুদ্ধ হয় না, এঁরা 'স্মৃতি' ও 'শ্রুতি'-রহিত, এঁরা ধর্মজ্ঞানরহিত, মন্ত্রহীন। এঁরা মিথ্যার মতোই অশুভ। মনুসংহিতার চোখে শূদ্র, কুক্কুট (অর্থাৎ মুরগি), কুকুর এবং শূকর সমার্থক।

একইভাবে বশিষ্ঠের ধর্মশাস্ত্র হল বর্ণভেদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার আরেকটি শাস্ত্রগ্রন্থ। এই শাস্ত্রগ্রন্থ অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য হল দ্বিজ। এদের দু'বার জন্ম হয়। প্রথমবার মায়ের গর্ভে, দ্বিতীয়বার পৈতে তথা উপবীত ধারণের সময়। কিন্তু তাঁর মত অনুযায়ী শূদ্রদের পৈতে ধারণের কোনো অধিকার নেই। মনুসংহিতায় অবশ্য 'দ্বিজ' বলতে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদেরই বোঝানো হয়েছে। নারীর সম্পর্কেও বশিষ্ঠের শাস্ত্রে আছে সেই বহুচর্চিত শ্লোক — 'পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে। রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমহর্তি।।' অর্থাৎ 'নারীকে কুমারী অবস্থায় পিতা রক্ষা করবে, যৌবনে স্বামী রক্ষা করবে, বার্দ্ধক্যে পুত্র রক্ষা করবে — নারী স্বাধীনতার যোগ্য নয়'।

আগেই বলেছি উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ, উপনিষদের যুগে যে শ্রেণীবৈষম্যের (অবশ্যম্ভাবী ভাবেই শ্রেণীসংগ্রামেরও) সৃষ্টি করেছিল, তার পরিণতিতে দেখা যাচ্ছে, পুরোনো আর্য কৌমসমাজ ভেঙে পড়ছে। প্রথমে সৃষ্টি হচ্ছে পরিবার বা বড়ো বড়ো কুল। কুলে একজন কুলপতি থাকছেন, যিনি হলেন কুল বা পরিবারের কর্তা। শ্রমবিভাজনেরও জন্ম হচ্ছে। জন্ম নিচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার ধারণাও। নারীকে অন্দরমহলে পাঠানোরও সেই শুরু। সুকুমারী ভট্টাচার্য 'বৈদিক সমাজে নারীর স্থান' প্রবন্ধটিতে বলেছেন, '...যদিও ঋগ্বেদে যোদ্ধা নারী মুদ্গলিনী, বিশ্পলা, বধ্রিমতী, শশীয়সীর কথা পড়ি, যাঁদের কেউ যুদ্ধে আহত, কেউবা যুদ্ধে বিজয়িনী। তবুও ঋগ্বেদের প্রথম যুগের পরে প্রকাশ্য সমাজ-জীবনে নারীর কোনো ভূমিকা আর রইল না।' ..."গোষ্ঠীবদ্ধ কৌমবদ্ধ সমাজ ভেঙে পরিবার-আশ্রিত বা 'কুল'-বদ্ধ সমাজ প্রবর্তিত হচ্ছিল ধীরে ধীরে। একটি বৃহৎ পরিবারের বাসগৃহের নাম 'কুল', এখানে তিনচার পুরুষের সংসার। এ সংসারের ছোট ছোট বিভাগে একটি পুরুষকে ঘিরে তার নিজস্ব যে পরিবার সেখানে স্বামীই সর্বময় কর্তা। এবং ঐ বৃহৎ যৌথ পরিবারের পরিবেশের মধ্যেই, গুরুজন এবং ছেলেমেয়েদের সামনেই, সে পুরুষ বহু নারীকে একে একে নিয়ে আসছে পত্নীরূপে। এই স্বাধীনতা কিন্তু তার স্ত্রীর নেই, কারণ 'এক স্বামীর বহু স্ত্রী থাকলেও একটিই স্বামীই তাদের পক্ষে যথেষ্ট,' [ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩/৫/৩/৪৭]" এর সঙ্গে এঙ্গেলসের 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি' বইটির ধারণাকে মেলালে দেখা যাবে সমাজ বিকাশের মৌলিক নিয়ম সর্বত্রই একই রকম।

এরপর ধীরে ধীরে শক্তিশালী পরিবার বা কুলগুলোর হাতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল পরিবার বা কুলগুলো পদানত হচ্ছে এবং সেখান থেকে ধীরে ধীরে ছোটো ছোটো রাজ্য তথা রাষ্ট্রের প্রাথমিক রূপগুলি দেখা যাচ্ছে। ইতিহাসের দিকে যদি একটু ফিরে তাকানো যায়, উপনিষদের শুরু থেকে শেষ পর্যায়ের কাছাকাছি সময় অবধি এই শ্রেণীবিভাজনের প্রক্রিয়া চলেছে। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি থেকে বা তারও হয়তো কিছুটা আগে থেকে, ষোড়শ মহাজনপদের উদ্ভব হয়। এই সময় দ্বিতীয় পর্যায়ের নগরায়ণ শুরু হয়েছে। মগধ, কোশল, বৎস, গান্ধার, অবন্তী, বজ্জি, লিচ্ছবি, কাশী, মল্ল, কুরু, পাঞ্চাল, অঙ্গ, চেদি, অশ্মক, শূরসেন এবং কনৌজ – এই ছিল ষোলোটি শক্তিশালী মহাজনপদ। এদের মধ্যে খনিজ সম্পদের আধিক্যের কারণে, মূলত লোহার খনি অধিক থাকার থাকার কারণে এবং লোহার লাঙলের ব্যবহারের আধিক্যের কারণে মগধের উৎপাদিকা শক্তির একটা তাৎপর্যজনক বিকাশ ঘটে, ফলস্বরূপ তা সব থেকে শক্তিশালী ক্ষমতার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। অন্য দু'একটি জনপদকে পদানত করে মগধের প্রতিপত্তিও ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। উৎপাদিকা শক্তির এই বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই পুরোনো ব্যবস্থার স্থিতাবস্থাকে ভাঙার কথা, ঘটলও তাই, দেখা গেল, মগধ ক্রমশ মহাজনপদ থেকে প্রথম শক্তিশালী রাজ্যে রূপান্তরিত হচ্ছে, এবং তা রাজতন্ত্রের দিকে এগোচ্ছে। উৎপাদিকা শক্তির এই বিকাশের ফলেই উৎপাদন সম্পর্কেও স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তন ঘটছে, ফলত রাজনীতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন হচ্ছে। গোষ্ঠীসমাজ তো আগে থেকেই ভাঙতে শুরু করেছিল, তার সাথে ভাঙছিল উপজাতিগত বন্ধন এবং সংশ্লিষ্ট রীতিনীতি। প্রথমে পরিবার বা কুলের উৎপত্তি হয়েছিল, তারপর ধীরে ধীরে রাজতন্ত্রের উত্থানও লক্ষ করা যাচ্ছিল। ক্ষমতা তখন থেকে ব্রাহ্মণদের বদলে রাজার হাতে কুক্ষিগত হতে থাকে। ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের, বিশেষত শূদ্র ও বৈশ্যদের ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল। পাশাপাশি নব্য রাজতন্ত্রের সাথে ব্রাহ্মণ্যবাদের একটা ক্ষমতার সংঘাতের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছিল। রাজতন্ত্র তথা ক্ষত্রিয়দের কেন্দ্র করে ক্ষমতার একটা নতুন বৃত্ত তৈরি হয়। মানুষের দার্শনিক জগতেও আসে নতুন নতুন চিন্তাধারা। ব্যাপক দাসশ্রম এবং তীব্র শ্রেণীনিপীড়নের ভিত্তিতে যে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা জন্ম নিচ্ছিল, তা তখনকার প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস দিয়ে আর ধারণ করা যাচ্ছিল না। এর ফলে সামাজিক নিয়মেই জন্ম নিল বেদবিরোধী নতুন নতুন মতবাদ। চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, আজীবক ইত্যাদি। এর মধ্যে সব থেকে বেশি প্রসারিত হয়েছিল বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধসূত্র থেকে এরকম বেদবিরোধী ৬২টি ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং জৈনসূত্র থেকে ৩৬৩টি ধর্মীয় গোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে।

বুদ্ধ নিজেও ক্ষত্রিয় বংশজাতই ছিলেন। তাঁর ধর্ম জনপ্রিয় হয়েছিল কারণ, ব্রাহ্মণ্যবাদী অসাম্যের পরিবর্তে জাতিভেদ না থাকায় বৌদ্ধধর্মকে একটা সমতাবাদী দর্শন হিসেবেই সে সময় মানুষ দেখেছিল। বুদ্ধদেবের কর্মকাণ্ড ছিল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের শেষভাগ থেকে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের শুরু পর্যন্ত বিস্তৃত। বুদ্ধ বা জৈন উভয় ধর্মই ছিল বেদবিরোধী, যদিও তা ছিল ভাববাদী ধ্যানধারণায় পরিপূর্ণ। বৌদ্ধধর্মের মূল কথা ছিল – মানুষের পাপ ও দুঃখের মূলে তৃষ্ণা, অন্তর থেকে বাসনাকে উৎপাটন করতে পারলে তবেই একমাত্র 'নির্বাণ' লাভ করা যাবে অর্থাৎ পুনর্জন্ম হবে না। বৌদ্ধ যে ধর্ম প্রচার করতেন, তার মূল কথা চারটি। এর জন্য তাকে 'চার আর্য (শ্রেষ্ঠ) সত্য' বলা হয়। এই চার আর্য সত্য হল – ১) সকলই দুঃখ। ২) দুঃখের কারণ আছে। এই কারণ ব্যাখ্যায় তিনি প্রতীত্য-সমুৎপাদ নামে কার্যকারণের একটি সূত্র দিয়েছিলেন। ৩) এই

দুঃখের নিরোধ সম্ভব। ৪) দুঃখ নিরোধের সুনির্দিষ্ট মার্গ আছে। তার নাম অষ্টাঙ্গ মার্গ। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা নীতি হল – সম্যক দর্শন, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক ক্রিয়া, সম্যক জীবিকা, সম্যক অনুশীলন, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক ধ্যান। অনাত্মবাদী দর্শন হয়েও 'প্রতিসন্ধি' ও 'কর্ম সিদ্ধান্ত' তত্ত্বের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্ম ভিন্নভাবে পরলোক ও জন্মান্তরকে স্বীকৃতি দিল এবং কালক্রমে নানা অতীন্দ্রিয়বাদকে মান্যতা দেয়। বৌদ্ধধর্মগ্রন্থের মধ্যে মূল গ্রন্থটি হল 'ত্রিপিটক'। এই 'ত্রিপিটক' হল তিনটি গ্রন্থের সমষ্টি, সেগুলো হল সূত্রপিটক, বিনয়পিটক ও অভিধর্মপিটক।

গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর বৌদ্ধমতাবলম্বীদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত হীনযান এবং মহাযান এই দুই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। মৌর্যযুগের পরে কৃষিবাণিজ্যের বেশ কিছুটা শ্রীবৃদ্ধি ঘটার ফলে ব্যবসায়ীদের হাতে বেশকিছুটা পয়সাকড়ি আসে। তাঁরা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মঠে দানধ্যান করতে থাকেন দু'হাত ভরে। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল বৌদ্ধধর্মে। বুদ্ধের নির্দেশে সন্ন্যাসীদের সাদাসিধে জীবনধারণের কথা, তাঁরা সেভাবেই চলছিল, কিন্তু দানধ্যান বেড়ে যাওয়ায় হঠাৎ ধনী বৈশ্য শিষ্যদের বদান্যতায় একদল বৌদ্ধ ভিক্ষুর জীবনযাত্রায় হঠাৎ করেই পরিবর্তন আসে। তাঁরা অশনে-বসনে শৌখিন হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন মঠেও আরামপ্রিয়তা লক্ষ করা যায়। সন্ন্যাসীদের একাংশের ভোগের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই সময় ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে গৌতম বুদ্ধ ধর্মের পথিকৃৎ থেকে 'দেবতা'য় রূপান্তরিত হন। স্বাভাবিকভাবেই আচার-আচরণের এই পরিবর্তন বৌদ্ধধর্মে নতুন বিতর্কের জন্ম দেয়। যাঁরা বুদ্ধ নির্দেশিত সাদাসিধে জীবনযাপনের পক্ষে থাকলেন, তাঁরা হলেন একটা আলাদা বৌদ্ধ সম্প্রদায়। তাঁদের বলা হল হীনযান সম্প্রদায়। আর যাঁরা আচার-অনুষ্ঠান ও ভোগবিলাসে অভ্যস্ত হলেন এবং সে ধরনের জীবনযাপনকে মেনে নিতে চাইলেন, তাঁদের সম্প্রদায়ের নাম হল মহাযান সম্প্রদায়। এ হল ধর্ম সম্প্রদায়ের বিভাজনের কথা, এছাড়াও দার্শনিক চিন্তার প্রশ্নেও বৌদ্ধধর্মের অনেকগুলি ভাগ হয়, যার মধ্যে ভারতে চারটি সম্প্রদায়েরই কথা কিছু শোনা যায়। এরা হলেন – ১) বৈভাষিক সম্প্রদায়: এঁদের মতে অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগৎ উভয়েরই অস্তিত্ব আছে এবং প্রত্যক্ষভাবেই বহির্জগতের জ্ঞান লাভ করা যায়। ২) সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়: এঁরাও অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও মনে করেন বহির্জগতের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। বহির্জগতের মানসিক প্রতিবিম্বকে অবলম্বন করে আমরা তার সত্তা অনুমান করতে পারি। ৩) যোগাচার সম্প্রদায়: এঁদের মতবাদকে অনেক সময় বিজ্ঞানবাদও বলা হয়। (এখানে 'বিজ্ঞান'-কে আধুনিক সায়েন্সের অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে না, ব্যবহার করা হচ্ছে ভাববাদী দর্শনের বিশেষ পারিভাষিক অর্থে) এঁরা মনে করেন বহির্জগতের কোনো অস্তিত্বই নেই। মনই সব। বহির্জগৎ হল মনগড়া ব্যাপার। ৪) মাধ্যমিক সম্প্রদায়: নামান্তরে শূন্যবাদী। এঁদের মতে, পরিদৃশ্যমান বস্তুজগৎ বা অন্তর্জগৎ কিছুরই কোনো প্রকৃত সত্তা নেই। সবই শূন্য, শূন্যই চরম সত্য।

অন্যদিকে, জৈনরা বেদও মানেন না, ঈশ্বরও মানেন না। 'জিন' শব্দের অর্থ হল বিজয়ী। জৈনরা মনে করেন, প্রত্যেক জীবই জিনদের পন্থা অনুসরণ করে বন্ধনমুক্ত হতে পারে। জৈনধর্ম অনুযায়ী এপর্যন্ত চব্বিশজন মুক্ত-পুরুষ জন্ম নিয়েছেন। জৈনধর্মের ভাষায় তাঁরা হলেন 'তীর্থঙ্কর'। তাঁদের মতে মহাবীর হলেন শেষ তীর্থঙ্কর। জৈনদের সাহিত্য সুবিশাল এবং তা প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। মহাবীরের মৃত্যুর পর এই ধর্ম দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায় – শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর।

এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দার্শনিক প্রভেদ খুব একটা কিছু নেই, মূলত আচারবিচার সংক্রান্ত প্রভেদ থেকেই এই দুই ভাগের উৎপত্তি। সাধারণত শ্বেতাম্বররা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করেন আর দিগম্বররা বিবস্ত্র থাকেন। জৈন দর্শনের মূল কথা হল সাধারণ অভিজ্ঞতায় আমরা জগতকে যেভাবে দেখি তা-ই সত্য। বস্তুসমূহ দুইভাগে বিভক্ত, জৈব এবং অজৈব। প্রতিটা জৈব বস্তুর মধ্যেই 'আত্মা' আছে। তাঁরা মনে করেন, সত্তা বহুমুখী এবং তা বিবিধভাবে বর্ণনা হতে পারে। কোনো বর্ণনাই মিথ্যে নয়, আবার কোনো বর্ণনাই একমাত্র সত্য নয়। একমাত্র পূর্ণজ্ঞানীদের পক্ষেই সত্তার বহুমুখী দিক সম্বন্ধে সামগ্রিক জ্ঞানজনিত উক্তি করা সম্ভব। আমরা যেহেতু পূর্ণজ্ঞানী নই, অতএব আমাদের প্রতিটি উক্তিই শেষপর্যন্ত সম্ভাবনামূলক। জৈনধর্ম অনুসারে এই সম্ভাব্যতার নির্দেশক শব্দ হল 'স্যাৎ'। জৈনরা যেহেতু মনে করেন, আমাদের প্রত্যেকটা উক্তিই সম্ভাবনাময়, তাই সমস্ত বিকল্প সম্ভাবনার কথা মাথায় রাখা প্রয়োজন। প্রত্যেক উক্তির আগেই 'স্যাৎ' শব্দটা প্রয়োগ করা উচিত। 'ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট'-এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ অনুমান করেছেন জৈনদের এই স্যাৎ-বাদের মধ্যেই আধুনিক স্ট্যাটি টিক্সের আভাস পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম বাদ দিয়েও চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনের উত্থানও সে সময় লক্ষণীয়। লোকায়ত নাস্তিক্য মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা অজিত কেশকম্বলী ছিলেন গৌতম বুদ্ধেরই সমসাময়িক একজন বস্তুবাদী দার্শনিক। জন্মান্তরবাদের বিপরীতে দাঁড়িয়ে তাঁর মত ছিল, 'যখন দেহের মৃত্যু হয়, তখন মূর্খ ও জ্ঞানী নির্বিশেষে সকলেই ছিন্ন হয়ে যায় এবং লোপ পায়। মৃত্যুর পর তারা আর বেঁচে থাকে না'। চার্বাকপন্থীরা মনে করতেন, 'ইহজন্মের সুখ ইহজন্মেই ভোগ করে যাওয়া উচিত, কারণ পরলোক বলে কিছু নেই'। সুপ্রাচীন এই বস্তুবাদী দার্শনিক মতবাদের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, ১) দেহাত্মবাদ, ২) স্বভাববাদ, ৩) প্রত্যক্ষ-প্রাধান্যবাদ এবং ৪) পরলোক-বিলোপবাদ। চার্বাক বা অন্যান্য লোকায়তিক দর্শন সংক্রান্ত গবেষণার সমস্যা হল, এঁদের নিজেদের লেখা কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায়নি, মূলত এঁদের বিরুদ্ধবাদীদের মতামতকে বিশ্লেষণ করেই এঁদের বস্তুবাদী চিন্তাসমূহ সম্পর্কে আমরা খানিকটা জানতে পারি।

এছাড়াও ব্রাহ্মণ্যবাদবিরোধী আরো কিছু দার্শনিক সে সময় জন্মেছিলেন, যেমন পূরণ কশ্যপ, ম খলি গোশাল, পকুধ কচ্চায়ন প্রমুখ, যাঁদের বেদবিরোধী দার্শনিক বলে মনে করা হয়। চার্বাকের পরেও খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শতক থেকে খ্রিস্টিয় দশ শতকের মধ্যে আরো পাঁচজন বস্তুবাদী দার্শনিকের নাম পাওয়া যাচ্ছে, তাঁরা হলেন অবিদ্ধকর্ণ, উদ্ভটভট্ট (ভট্টোদ্ভট), কম্বলাশ্বতর, পুরন্দর এবং ভাবিবিক্ত।

সেই সময়ের বেদবিরোধী চিন্তাধারাগুলির মধ্যে চার্বাকপন্থী বস্তুবাদীদের দর্শন মূলত সে সময়কার শ্রমজীবীদের শ্রেণীস্বার্থের অনেক অধিকতর প্রতিনিধিত্ব করলেও বৌদ্ধধর্ম কিন্তু মূলত ক্ষত্রিয়দের ও বৈশ্যদের প্রতিনিধিত্ব করত। বহু রাজা সে সময় বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বি বলেছিলেন, 'বৌদ্ধ মতাদর্শ, বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভকাল থেকেই সার্বভৌম রাজতন্ত্রের আনুকূল্য লাভ করে এসেছিল'। বর্ণব্যবস্থাকে না মানলেও দাসব্যবস্থার বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্মগ্রন্থে কিন্তু একটা বিরুদ্ধ বাক্যও খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ বৌদ্ধ ধর্মের যখন উত্থান হচ্ছে, তখন সমাজে শ্রেণীবৈষম্য তীব্রতর হচ্ছে। আর দাসদের

অবস্থা সে সময় সবচেয়ে করুণ, তা সত্ত্বেও কেন শ্রমজীবী মানুষের বস্তুবাদী দর্শনের চেয়ে বৌদ্ধধর্মই বেশি বিস্তার লাভ করেছিল? তার একটাই কারণ – বর্ণব্যবস্থা না থাকায়, বৌদ্ধধর্মকে যেমন একটা ব্রাহ্মণ্যবাদী আচার-বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ধর্ম হিসাবে জনসাধারণ দেখেছিল, তেমনি আগেই বলেছি তা ছিল উদীয়মান রাজতন্ত্রের মদতপুষ্ট, যা সাময়িকভাবে হলেও ব্রাহ্মণদের আধিপত্যকে কিছুটা খর্ব করেই সংহত হচ্ছিল এবং অবশ্যই যা ছিল তৎকালীন সমাজের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের পক্ষে অর্থাৎ প্রগতির পক্ষে, সবচেয়ে অগ্রণী শক্তি। পাশাপাশি বৈশ্যরাও ছিল এই ধর্মের পৃষ্ঠপোষক, যারা ছিল তৎকালীন সমাজে কৃষিজীবী সমাজের অংশ। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের নিরিখে যাঁরা ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করতে চান, তাঁদের কিন্তু একটা কথা মাথায় রাখতে হবে তা হচ্ছে আদিম গোষ্ঠী সমাজের তুলনায় রাজতন্ত্রের উৎপত্তি আসলে সমাজের প্রগতির ইঙ্গিতবাহী, ফলত সেই সময় কিছুদিনের জন্য বৌদ্ধধর্মই ছিল সমাজের অপেক্ষাকৃত বেশি প্রগতিশীল দর্শন যা কৌমসমাজ ভেঙে রাজতন্ত্রকে সংহত করতে সাহায্য করেছিল।

বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মের প্রসারের আরেকটা কারণ হল তাঁদের অহিংসার তত্ত্ব। আমরা আগেই বলেছি, বৈদিক আচার-বিচারের একটা বড়ো অংশ জুড়ে থাকত যাগযজ্ঞ। এক একটা যজ্ঞে বিপুল সংখ্যক গবাদি পশু বধ করা হত, বিশেষত গরু এবং মোষ বধ করা ছিল রেওয়াজ। বৈদিক সাহিত্যগুলির থেকে যে চিত্র পাওয়া যায়, তা কিন্তু একথাই প্রমাণ করে যে আর্যরা গরুর মাংস খেত। 'চরক সংহিতা'য় যেমন বলা হয়েছে, গরু, মোষ এবং শুয়োরের মাংস প্রত্যেকদিন খাওয়া অনুচিত। স্বাস্থ্যহানিকর। বেদের যুগে একধরনের খাদ্য যাগযজ্ঞগুলোতে প্রায়ই ব্যবহার হত, তার নাম ছিল মধুপর্ক। এই খাদ্য ছিল গরুর মাংস এবং মধু সহযোগে তৈরি। বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের মূল্যবান আকরগ্রন্থ কৃষ্ণ-যজুর্বেদ ব্রাহ্মণে অসংখ্য এমন অনুষ্ঠানের কথা আছে যেখানে গরুর মাংস খাওয়ার উল্লেখ আছে। শুধু তাই নয়, কোন দেবতার তুষ্টির জন্য কী ধরনের গরু বলি দিতে হবে তারও উল্লেখ আছে। যেমন, বিষ্ণুর জন্য বলা হচ্ছে একটি বামন বলীবর্দ, পূষণের উদ্দেশ্যে একটি কালো গাই এবং রুদ্রদেবের জন্য লাল গাই দানের কথা আছে। রাজসূয়, অশ্বমেধ, বাজপেয় এই ধরনের যজ্ঞে গো-বধ ছিল অপরিহার্য। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে অশ্বমেধের বিবরণে ঘোড়া, গরু, ষাঁড়, ছাগল, হরিণ, নীলগাই ইত্যাদি ১৮০ রকমের পশু বলির কথা বলা হয়েছে। আশ্বালায়ন সূত্রে এমন যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, যার অন্যতম আচার ছিল গো-হত্যা। বিশেষত গৃহ্যসূত্রে বর্ণিত একটি খাদ্যের নাম ছিল 'শূলগব' অর্থাৎ শূলে পক্ক গোমাংস, বর্তমানে প্রচলিত শিককাবাব ধরনের কোনো খাদ্য। বলা হয়েছে, এই মাংসের খাদ্য যিনি প্রস্তুত করতে পারবেন, তিনি অতুল ধন, মান, পরিজন এবং পুণ্যের অধিকারী হতে পারবেন। এই ঘটনাগুলো থেকে আর্যদের যে গোমাংস খাওয়ার অভ্যাস ছিল তা প্রমাণ হয়। কিন্তু কৃষির ব্যবহারের শুরু থেকেই আমরা দেখব, অর্থাৎ উপনিষদের যুগেই যাগযজ্ঞের প্রতি তখনকার দার্শনিকরা সন্দিহান হয়ে পড়ছেন, ফলে যাগযজ্ঞের ব্যবহার কমছে। কৃষির ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সাথে, বিশেষত লোহার তৈরি লাঙলের ব্যবহারের শুরু থেকে যেহেতু গোরু, মোষ কৃষিকাজে অতি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে, তাই গোরু-মোষ হত্যাকে বন্ধ করাটা একটা সামাজিক আবেদনের জন্ম দিচ্ছে। ইতিহাসের গতিপ্রকৃতির দিকে যদি একটু নজর দিই দেখা যাবে, ঠিক এই সময় প্রাণী

হত্যা বন্ধের আবেদন নিয়ে বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মের উৎপত্তি হচ্ছে, যা স্বাভাবিকভাবেই সমাজে, বিশেষত কৃষিজীবী বৈশ্যদের মধ্যেও একটা ভালোমাত্রায় আবেদন তৈরি করতে পারছে।

তবে জৈনধর্মে অহিংসার ভাবনা এতটাই ব্যাপক ছিল যে, সাধারণত কীটপতঙ্গ মেরে ফেলার ভয়ে এরা মাটি কুপিয়ে চাষাবাদ পর্যন্ত করত না। এরা সংস্কৃতের বদলে সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষা অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায় সাহিত্য রচনা করত। হিংসাবিবর্জিত জীবনধারণের কঠোরতার কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধর্মকে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। প্রধানত বণিক ও শ্রেষ্ঠীরাই এই ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অনেক বণিক ও শ্রেষ্ঠী বৌদ্ধধর্মেরও পৃষ্ঠপোষণ করতেন।

প্রসঙ্গত, সেই সময়ের রাজনৈতিক চিত্রটার দিকে একটু নজর দেওয়া যাক। ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী মগধের রাজা বিম্বিসার রাজত্ব করেছেন ৫৪৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৪৯২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। তিনি ছিলেন বুদ্ধ অনুগামী। যদিও পরে তাঁর ছেলে অজাতশত্রু তাঁকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করেন এবং ঘটনা এটাই যে, তিনি ছিলেন প্রবল বৌদ্ধবিরোধী। এঁদের পর আসে যথাক্রমে শিশুনাগ ও নন্দবংশ। নন্দদের উচ্ছেদ করে মগধের ক্ষমতায় বসেন মৌর্যরা। মৌর্যদের প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় থেকেই (৩২৪ থেকে ৩০০খ্রিস্টপূর্ব) রাজতন্ত্র আরো বেশি সুসংহত রূপ পেতে শুরু করে। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' ওই সময়ই লেখা হয়, যা ছিল রাজতন্ত্রকে সুসংহতকরণের নানা বিধান। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নিজে পরে জৈনধর্ম গ্রহণ করেন। শোনা যায়, তাঁর মা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদবিরোধী আজীবক মতাবলম্বী। মৌর্যযুগ সম্পর্কে জানা যায় গ্রিক পর্যটক মেগাস্থিনিসের বিবরণ এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পড়ে। অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য তাঁর 'প্রাচীন ভারতে দ্বন্দ্ব এবং সামাজিক পরিবর্তন' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হল রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ; সেটিতে নিয়মিত সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র, বিচার ব্যবস্থা, গুপ্তচর ব্যবস্থা প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা আছে। যদিও অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত রাষ্ট্রযন্ত্রের অনেক উপাদানই ছিল পূর্বেকার ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা, তবুও মৌর্যদের শাসনকালে রাষ্ট্রযন্ত্র সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছোয়। বস্তুত অর্থশাস্ত্র শীর্ষক গ্রন্থটির অস্তিত্বই প্রমাণ করে সেই যুগটি বিভিন্ন সামাজিক শক্তির মধ্যেকার তীব্র বিরোধে পূর্ণ ছিল। কারণ তা না হলে এটি রচনা করার প্রয়োজন হত না।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পৌত্র অশোক মৌর্যযুগের শ্রেষ্ঠ রাজা বলে ইতিহাসে সুবিদিত। তাঁর চণ্ডাশোক থেকে ধর্মাশোক হওয়ার কাহিনি ইতিহাস বই থেকে আমরা সবাই জেনেছি। তিনি নিজে বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁর শাসনে বৌদ্ধধর্মের প্রসার হয়েছিল ব্যাপক।

মগধ এবং কোশলের উত্থানের সাথে সাথে যে নতুন বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা গিয়েছিল সেগুলো হল, ১) এই সময় শ্রেণীদ্বন্দ্ব তীব্র হচ্ছে এবং সমাজের শ্রেণীবিন্যাসে পরিবর্তন আসছে। ২) এই সময় প্রথম রাষ্ট্রের অর্থাৎ একটা কেন্দ্রীভূত শাসনের রূপ দেখা যাচ্ছে। ৩) চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, আজীবকের মতো বেদবিরোধী ধর্ম বা চিন্তাধারার উৎপত্তি ও বিকাশ হচ্ছে। ৪) উপহারের বদলে কর-ব্যবস্থা চালু হচ্ছে, যদিও ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়দের কর দিতে হত না। তা ছিল শুধু বৈশ্য ও শূদ্রদের জন্য নির্ধারিত। বিশেষত, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় থেকে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বিধি মেনে নানাধরনের রাজস্ব তথা কর আদায়ের ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল। ওই সময়ই প্রশাসনিক একটা কাঠামোও তৈরি হয়েছিল। অর্থাৎ এক কথায় কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রকাঠামোর উদ্ভব হচ্ছিল। জন্মান্তরবাদ বৌদ্ধ, জৈন বা উপনিষদে স্বীকৃত ব্যাপার বলেই পরজন্মের সুফলের আশায় বা উপনিষদের

ভাষায় 'মোক্ষলাভে'র আশার কথায় বা বৌদ্ধধর্ম অনুযায়ী 'নির্বাণ' লাভের আশার কথা শুনিয়ে শোষণ, শাসনকে আরো তীব্র করা হচ্ছে। বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মে জাতিভেদ স্বীকার না করলেও সমাজে তখনও ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব গভীরে। ফলে জাতিভেদজনিত শোষণ-বৈষম্য জাঁকিয়েই ছিল। এই সময় মহাভারত লেখা চলছে, যেখানে জন্মান্তরবাদের সঙ্গে কর্মফলকে মিশিয়ে এবং শাসনযন্ত্রের সাথে ধর্মশক্তিকে মিশিয়ে মানুষের উপর অত্যাচারকে বৈধ এবং শক্তিশালী করা হচ্ছে। এছাড়া সুনিয়ন্ত্রিত খাজনা, ঋণভার, জরিমানা ইত্যাদির চাপে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ওই সময়ই আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। ৫) মগধের উত্থানের সময় থেকেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারাও শক্তিশালী হয়। ৬) আর রাষ্ট্রের দমন-যন্ত্র হিসেবে গড়ে ওঠে শক্তিশালী স্থায়ী সামরিক বাহিনী।

খ্রিস্টপূর্ব ২০০ সাল নাগাদ শক্তিশালী মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পরে শক্তিশালী কোনো কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা না থাকায় বিদেশি আক্রমণ শুরু হয়। মৌর্য বংশের পর একে একে যাঁরা এসে এদেশের রাজনীতিতে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল তারা হল শক, কুষাণ, সাতবাহন এবং অবশেষে এল গুপ্তযুগ। এর মধ্যে কুষাণ আমলটি হিন্দুধর্মের ইতিহাসে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, একথা আজ প্রায় বেশিরভাগ পণ্ডিতই স্বীকার করবেন যে, হিন্দুধর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ শ্রীম ভাগবত গীতা কুষাণযুগেই রচিত হয়েছিল। গীতা বেদের যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের সময় থেকে পরবর্তী সময়ের উপনিষদের জ্ঞানতত্ত্ব এবং লোকায়ত ধর্ম, ভাগবত চিন্তা থেকে ঈশ্বরতত্ত্ব, সাংখ্যের দ্বৈততা, যোগের ধ্যান এই সব কিছুকেই মেলাবার একটা প্রচেষ্টা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বর্ণিত সমাজটা ছিল বর্ণাশ্রম, কর্মফলবাদ, নারীর সতীত্ব ধর্ম, রাজার আধিপত্য এবং শূদ্রের প্রশ্নাতীত আনুগত্য এবং সামাজিকভাবে অবনমনের এক নির্দেশিকা। কুষাণযুগের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল অনড় অচল ব্যবস্থা হিসেবে বর্ণব্যবস্থার সূত্রপাত। আমরা জানি, এই ব্যবস্থার মূল বা শিকড় অত্যন্ত প্রাচীন। ঋগ্বেদের সময়েই দেখা যাচ্ছে, একই পরিবারের সদস্যরা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণভিত্তিক বৃত্তিতে নিযুক্ত হচ্ছে। এরপরেও বর্ণগুলি অনেকটাই সঞ্চরণশীল ছিল। ধীরে ধীরে সমাজ বিবর্তনের ফলে বর্ণ (জাতি)-গুলি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করছে। কুষাণ আমলেই দেখব, প্রথম বর্ণব্যবস্থা অনড় অটল হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। এই বর্ণব্যবস্থার জাতি-বর্ণব্যবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার সূত্রপাতের কারণেও ইতিহাসে কুষাণযুগটি গুরুত্বপূর্ণ। কুষাণযুগটি আরেকটা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ই, বৌদ্ধধর্ম দু'ভাগে বিভক্ত হয়। জন্ম নেয় মহাযান সম্প্রদায়। বিশেষত, কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাযান সম্প্রদায়ের ব্যাপক প্রসার ঘটে।

হিন্দুধর্মের ভাবাবেগের সঙ্গে যুক্ত দু'টি মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত লেখা শুরু হয়েছিল বেদাঙ্গ রচনার যুগে। রামায়ণ ও মহাভারতের বিবাহ পদ্ধতির দিকে নজর রাখলে দেখব, রামায়ণে যেখানে এক স্বামীর বহুপত্নীর উল্লেখ আছে, সেখানে মহাভারতে আমরা পাঞ্চালীকে দেখতে পাচ্ছি, যাঁর পঞ্চস্বামী। বিবাহ পদ্ধতির এই তারতম্য থেকে অনুমান করা যেতে পারে, মহাভারতের রচনার শুরুর যুগটি ছিল রামায়ণের কিছু আগেই। কারণ, নারীর কঠোর একগামিতার রীতি সমাজে এসেছে পরে। কিন্তু মহাভারত লেখার কাজ শেষ হয়েছিল রামায়ণ লেখার শ'দেড়েক বছর পর। কুষাণ সাম্রাজ্যের আমলেই ভৃগু বংশীয় কিছু শাস্ত্রকার মহাভারতের শেষতম প্রক্ষেপটি রচনা শুরু করেন। যদিও তা শেষ হয় সম্ভবত আরো অনেক পরে। রামায়ণ লেখা শেষ হয়েছিল খ্রিস্টিয় তৃতীয় (বা চতুর্থ) শতকে।

গুপ্তযুগ থেকে আমরা দেখব বৌদ্ধধর্ম পিছু হটছে। এই সময়টাকে অনেক পণ্ডিত হিন্দুধর্মের 'স্বর্ণযুগ'ও বলে থাকেন। মূলত বৌদ্ধধর্মের প্রভাবেই পুরোনো যাগযজ্ঞ ছেড়ে এই সময় ব্রাহ্মণ্যবাদী ধারাটি অনেক বেশি জ্ঞানতত্ত্বের দিকে ঝুঁকছিল। এই সময় হিন্দু দর্শনের ছয়টি শাখার বিকাশ ঘটেছিল। সেগুলো হল, যথাক্রমে সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত। পাশাপাশি আবার ওই সময়ই শৈব ও বৈষ্ণবদের মতো একেশ্বরবাদী চিন্তাগুলিরও উৎপত্তি পর্ব। প্রাগার্য নানা আঞ্চলিক উপাসনা পদ্ধতি এবং বৈদিক পদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটছিল, যার ফলে তৈরি হয় পুরাণের মতো ধর্মগ্রন্থ। এই সময় রাজা এবং ধনীরা প্রভূত সম্পদশালী হয়ে ওঠে। বৌদ্ধ, জৈন এবং আজীবক প্রভাবে বৈদিক ধর্ম যতটুকু কোণঠাসা হয়েছিল, গুপ্তযুগে তা আবার বেশ জাঁকিয়ে ফিরে আসে। বর্ণাশ্রম না মানলেও, বৌদ্ধরা যেহেতু জন্মান্তরবাদ মানতেন, তাই তাত্ত্বিকভাবেই বৌদ্ধদের পক্ষে বর্ণাশ্রমের বিরোধিতাটা দুর্বল হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। তাছাড়া নানা অতীন্দ্রিয়বাদেও তাঁদের বিশ্বাস ছিল। জাতকের গল্পে বোধিসত্ত্বের নির্বাণ লাভের আগে বারবার জন্মগ্রহণের উল্লেখ আছে। গুপ্তযুগে জন্ম নিল পুরাণগুলি, যেখানে 'অবতার তত্ত্ব'-কে অর্থাৎ ঈশ্বরের বারবার জন্মগ্রহণের তত্ত্বকে সামনে আনা হল। এই সময় থেকে আবার এদেশে বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ের যুগ শুরু হচ্ছে। বৌদ্ধ আর হিন্দুধর্ম মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। আগেই বলেছি বৌদ্ধধর্ম ততদিনে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে গেছে। একটা হীনযান শাখা এবং অন্যটা মহাযান শাখা। মহাযান শাখায়, নানা মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, ইত্যাদির প্রতি ঝোঁক ছিল। পরে এর থেকে আরেকটা শাখা জন্ম নিল। বজ্রযান শাখা। এঁরা পুরোপুরি তান্ত্রিক সাধনায় বিশ্বাস করতেন। এঁরা নিজেদের তান্ত্রিক বলেই পরিচয় দিতেন। এদিকে ততদিনে হিন্দুধর্মও বৌদ্ধধর্মকে একদিকে হিন্দুধর্মেরই এক শাখা বলে দাবি করতে শুরু করেছে, শুধু তাই নয়, যে গৌতম বুদ্ধকে একসময় তারা নাস্তিক বলেছিল, পরে তাঁকেই তারা 'বিষ্ণুর অবতার' এবং 'মনুষ্যরূপী পরমেশ্বর' বলে প্রচার করতে শুরু করে, পাশাপাশি সেই সময় বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মাবলম্বী রাজাদের নানা সামরিক অভিযানও চলেছে। বিশেষত, বৌদ্ধদের উপর শৈবদের অত্যাচারের কাহিনি বৌদ্ধধর্মগ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের কারণ দেখাতে গিয়ে ডি ডি কোশাম্বি এর অর্থনৈতিক দিকটির দিকেই বেশি মনোযোগী হয়েছেন। তাঁর মতে, 'বৌদ্ধধর্ম অর্থনীতিহীন হয়ে পড়েছিল'। কোশাম্বি আরো বিস্তারিতভাবে বলতে গিয়ে বলছেন, "বৌদ্ধধর্মের সংস্কৃতি ও সভ্যতামূলক কাজকর্ম খৃষ্টজন্মের সপ্তম শতকেই শেষ হয়ে যায়। 'অহিংসা' সম্পর্কিত উপদেশাবলী সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত হয়েছিল, যদিও অনুশীলিত হয়নি। কদাচিৎ কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃপতি পুংগবের পুনঃপ্রবর্তনের প্রচেষ্টা ছাড়া বৈদিক পশুবলি দান পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং সাধারণ অর্থনীতির উপর কোন প্রভাব পড়েনি। অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ বিনা গ্রামের কৃষকদের রাজী করানোর ব্যাপারে নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছিল। ধর্মীয় অনুশাসন দিয়ে রাজী করান হয়েছিল, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কাজ করেনি। গ্রামাঞ্চল সমূহে জাতিবর্ণ হিসাবে গঠিত শ্রেণী বিভাজনকে বৌদ্ধরা ঘৃণার চোখে দেখত। আদিম জনগোষ্ঠীকে নতুন জাতির তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। উপজাতিবর্গ ও কৃষকরা প্রচণ্ড পরিমাণে লৌকিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল ছিল, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের এইসব লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান করা নিষিদ্ধ ছিল; ধর্মীয় ও লৌকিক আচার অনুষ্ঠান করা ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া ব্যাপার ছিল।

অধিকন্তু, সেই সময়ে ব্রাহ্মণই ছিল অগ্রদূত যারা শস্য উৎপাদনে প্রেরণা যোগাত। কারণ তারা সঠিকভাবেই বর্ষপঞ্জি রক্ষা করত এবং তার দ্বারা লাঙলের সাহায্যে জমি কর্ষণের সময়, বীজবপন এবং ফসল তোলার দিনক্ষণ স্থির করত। তারা নতুন ফসল এবং বাণিজ্যিক সম্ভাবনা সম্পর্কিত ব্যাপারে কিছুটা অবগত ছিল। পশুবলিদান অনুষ্ঠানকারী পূর্বপুরুষদের, বৃহৎ বৌদ্ধ বিহার বা মঠ ধ্বংস সাধন করার মত ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণ্যবাদ)-কে (ব্রাহ্মণকুলকে) নিঃশেষিত করা যায়নি। বুদ্ধকে বিষ্ণুর 'অবতার' বানিয়ে একটা আপস রফা হয়েছিল। সুতরাং আনুষ্ঠানিক বৌদ্ধধর্ম অনিবার্যভাবে অদৃশ্য হয়েছিল।"

স্বল্প কথায় বললে, সব মিলিয়ে এই সময় থেকেই বৌদ্ধধর্মের পিছু হটার শুরু, পরবর্তীতে তুর্কি আক্রমণের সময় থেকে বৌদ্ধরা এখান থেকে পুরোপুরি পিছু হঠে যায়। তাসত্ত্বেও বলা যায়, মোটের উপর প্রায় এক হাজার বছর অবধি এদেশে বৌদ্ধধর্ম টিকেছিল। খ্রিস্টিয় অষ্টম শতকেও হর্ষবর্ধন ছিলেন বৌদ্ধ রাজা। তখন বেদান্তকে হাতিয়ার করেই শঙ্করাচার্য এবং কুমারিল ভট্ট হিন্দুধর্মকে আবার প্রতিষ্ঠা করেন। শঙ্করাচার্য ছিলেন অদ্বৈতবাদী। কুমারিল ভট্ট প্রথম জীবনে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন। জনশ্রুতি আছে যে, তিনি তর্কে শঙ্করাচার্যের কাছে পরাজিত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সেই অর্থে দেখলে শঙ্করাচার্যের নেতৃত্বেই হিন্দু পুনরুত্থানবাদের পুনরায় আত্মপ্রকাশ ঘটল।

গুপ্তযুগের আমল থেকে হিন্দুধর্মের বিকাশের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু দুটো বিষয়কে মাথায় রাখা জরুরি। প্রথমত, ওই সময় একদিকে যেমন বেদান্তের মতো চূড়ান্ত ভাববাদের বিকাশ ঘটছে, পাশাপাশি ওই সময় থেকেই বৈদিক বিশুদ্ধতার থেকে বেরিয়ে বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতা তথা নানা অবৈদিক সভ্যতার মিশ্রণও ঘটছে। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক – এই দর্শনগুলোকে কিন্তু পরবর্তীতে বেদান্তের অন্যতম ব্যাখ্যাকার এবং প্রচারক শঙ্করাচার্য ও রামানুজ দু'জনই বেদবিরোধী বলেই উল্লেখ করেছিলেন। তবে মীমাংসা তথা পূর্ব-মীমাংসা এবং বেদান্ত তথা উত্তর-মীমাংসা যে বেদ-মূলক দর্শন, তা নিয়ে আমরা বৈদিক সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনার প্রথম দিকেই আলোচনা করেছি। এই দু'টির মধ্যে বেদান্ত নিয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করে নেওয়া দরকার। গুপ্তযুগে ভাববাদ সবচেয়ে বেশি বিকশিত হয় বেদান্ত দর্শনের মধ্যে দিয়ে। আগেই বলেছি, বেদের জ্ঞানমূলক শাখার উপর আলোচনার ভিত্তিতেই বেদান্ত দর্শনের উৎপত্তি। উপনিষদের যুগেই আমরা দেখেছি যে, যাজ্ঞবল্ক্যের বক্তব্যে মায়াবাদের ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। বেদান্তে এই মায়াবাদই জাঁকিয়ে এল। বৈদান্তিক সম্প্রদায়ও ব্যাখ্যা ভেদে নানা উপশাখায় বিভক্ত হয়েছে, যার মধ্যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অদ্বৈত মতে 'নির্গুণ ব্রহ্ম'-ই একমাত্র সত্য, বাকি সব মিথ্যা। 'ব্রহ্ম' ছাড়া দ্বিতীয় কিছুর কল্পনা অজ্ঞানের পরিণাম এবং এই অজ্ঞানতার নাম 'মায়া'। আমরা যে দৃশ্যমান জগতকে সত্য বলে মনে করি তা আসলে এই 'মায়া'। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী মতানুসারে 'ব্রহ্ম'-ই চূড়ান্ত সত্য, তবে তা 'নির্গুণ' নয়। পরিদৃশ্যমান জগৎও মিথ্যা নয়। 'ব্রহ্ম' হল অনন্ত কল্যাণময়। 'ব্রহ্ম'-ই ঈশ্বর। ঈশ্বরের মধ্যেই চেতনা এবং জড় উভয় বৈশিষ্ট্যই বর্তমান। জীবাত্মার সঙ্গে জড় দেহের সম্পর্কই বন্ধনের স্বরূপ। উপাসনা এবং সৎকার্যের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের করুণা উদ্রেক করলে এই বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অদ্বৈতবাদের প্রধান প্রচারক এবং ব্যাখ্যাকার হিসাবে শঙ্করাচার্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা

হয়, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যাকার হিসেবে সবচেয়ে বেশি উল্লেখ করা হয় রামানুজের নাম। বেদান্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়ে সুকুমার রায়ের 'দৈবেন দেয়ম্' থেকে একটা আরো একটি দীর্ঘ উক্তি উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না। সুকুমার রায়কে যদিও আমরা শিশুসাহিত্যের জন্য বিশেষভাবে চিনি, কিন্তু তাঁর চিন্তায় যে বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় ছিল, তার গুরুত্বকে নিশ্চয়ই সবাই স্বীকার করবেন। সুকুমার রায় তাঁর উক্ত প্রবন্ধে মায়াবাদ সম্পর্কে চমৎকার বলেছেন, "শাস্ত্রের অভিপ্রায় ও ভগবান শঙ্করাচার্যের শিক্ষা, আসলে যাহাই হউক, তাহার সংস্কারগত সহজ মন্ত্র এই যে, 'সংসারটা কিছুই নয়'। যাহা দেখি মিথ্যা দেখি, যাহা শুনি, তাহা মিথ্যা শুনি; তুমি আমি, জগৎসংসার এই ঘটনার পর ঘটনা, সব মিথ্যা সব মায়া। সুতরাং সুখই বা কি আর দুঃখই বা কি? 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ' ইত্যাদি। আসল কথা, সংসারটাকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেল। যে কর্মজীবন চায় সে সংসারের হাটে কোলাহল করিয়া ফিরুক, যে মানুষের সঙ্গ চায় সে সংসারের হাহাকার বহন করিয়া মরুক; তুমি এসবের শৃঙ্খল ভাঙিয়া, চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া, জগতের সুখ-দুঃখে উদাসীন হইয়া কর্মের জন্ম-জন্মান্তরবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ কর। কথাটা বলিলেই কাজটা সহজ হয় না, কারণ সংসারটাকে 'মায়া' বলিয়া উড়াইতে চাহিলেই সে সরিয়া দাঁড়ায় না বরং মায়াপুরীর যমদূতগুলি ক্ষুধার আকারে, ব্যাধির আকারে, সংসারের নানা তাড়নার আকারে জীবনের কণ্ঠরোধ করিবার উপক্রম করে। কি কুতর্কের কণ্ঠরোধ করিবে কে?"

একই প্রবন্ধে পরে সুকুমার রায় আরো বলেছেন, "এই শখের অদ্বৈতবাদ বলে, 'ভেদ যখন কোথাও নাই, আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সবই যখন একই আত্মার বহুধা প্রকাশ মাত্র, তুমি আমি বিষয়, আশয় ইত্যাদির যখন কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তখন ভালোমন্দের বিচার কেন? পাপপুণ্যের ও পঙ্কচন্দনের সংস্কার কেন? কর্মের কর্তা সেই একই আত্মা; সুতরাং কে কাহার অনিষ্ট করিবে, কে কাহার সম্মান করিবে? কে কাহাকে আশ্রয় দিবে, কে কাহাকে হনন করিবে? দোষগুণের দণ্ডপুরস্কার নিরর্থক, সমাজের শাসনবন্ধন নিরর্থক, মানুষের ধর্মভয় ও দায়িত্ববোধ নিরর্থক। কাজের মালিক যখন একজন, তখন তোমার পাপপুণ্যের ভাগী তুমিও যেমন, আমিও তেমন। আমার লাভও নাই ক্ষতিও নাই, কিছু করিলেও হয়, না করিলেও হয়; দশের ভাবনা ভাবিলেও হয়, না ভাবিলেও হয়; কারণ আমার কাজে ও অকাজে আমার কোনো কৃতিত্ব নাই।' "

শঙ্করাচার্য গুপ্তযুগের অনেক পরে জন্মালেও গুপ্তযুগেই মায়াবাদের প্রথম দার্শনিক মুক্তি ঘটে। সুকুমার রায় খুব সুন্দর করে দেখিয়েছেন এই মায়াবাদ কীভাবে নিয়তিবাদের দিকে মানুষকে নিয়ে যাওয়ার দার্শনিক ভিত্তি তৈরি করছে। বস্তুত হলও তাই, গুপ্তযুগে যেমন বৈদিক-অবৈদিক সভ্যতাগুলোর মিশ্রণ লক্ষ করা যায়, তেমনই নিয়তিবাদেরও ব্যাপক প্রসার ঘটে। পরে ৬৫০ থেকে ১১০০ খ্রিস্টাব্দ অবধি আমরা দেখব, একদিকে যেমন চিরায়ত পৌরাণিক হিন্দু চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, পাশাপাশি শঙ্করাচার্যের মতো বেদান্ত-দার্শনিকরা আরো বেশি বেশি করে অধ্যাত্মবাদী চিন্তার প্রসার ঘটাচ্ছেন। এই দুই ধারাই সামগ্রিকভাবে হিন্দুধারার অঙ্গীভূত হচ্ছে।

বৈদিক ধর্মের সঙ্গে এই সময় বা তারও আগে থেকেই এদেশের অবৈদিক ধারাগুলোর যে মিলন ঘটছিল, তার কারণ কিছুটা এটাই যে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবল প্রতাপ এবং যেহেতু রাজধর্ম হিসেবে বৈদিক ধারার একটা দীর্ঘদিন যাবৎ আধিপত্যের ইতিহাস রয়েছে, তাই অন্যান্য অবৈদিক

ধারাগুলিও তাদের চিন্তাধারাকে বৈদিক চিন্তাধারা বলে চালিয়ে এসেছে। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য যেমন সাংখ্য আর ন্যায় দর্শন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'ঐ দু'টি দর্শনই বেদপ্রামাণ্য স্বীকার করে ধর্মশাস্ত্রীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। এমন হতে পারে এ ছিল তাঁদের মুক্তিপণ। মুখে বেদপ্রামাণ্য স্বীকার করে কাজে তারা নিজেদের মতই বলেছিলেন।'

মেঘনাদ সাহাও তাঁর 'সবই ব্যাদে আছে!' শীর্ষক সুবিখ্যাত প্রবন্ধটিতে এ প্রসঙ্গে আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন, "এ দিকে প্রাগ্বৈদিক ভারতীয় সভ্যতায় যে সমস্ত লোকের ধর্মবিশ্বাস ছিল (সম্ভবত পাশুপত ধর্ম বা নারায়ণী ধর্ম) তাহারাও ক্রমে অন্যপ্রকারে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে চেষ্টা করিতে থাকে। দেশের রাজশক্তি ও পুরোহিতশক্তি বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে প্রগাঢ় বিশ্বাসবান, সুতরাং তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে নিজেদের মতবাদ প্রচার করার সাহস প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসীদের ছিল না, সুতরাং তাঁহারা বেদের অস্পষ্ট সূক্তাদির দোহাই দিয়া নিজেদের ধর্মমতাদির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। এইজন্যই প্রাগ্বৈদিক 'শিব পশুপতি' বেদের অমঙ্গলের দেবতা রুদ্রের সহিত এক হইয়া গেলেন এবং 'বেদের' সৌরদেবতা বিষ্ণুর সহিত নারায়ণীয় ধর্মের নারায়ণের একত্ব সম্পাদনের প্রয়াস হইল। পাশুপত ও নারায়ণীয় মতাবলম্বীগণ এইরূপে বেদের দোহাই দিয়া অবৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বা ধর্মবিশ্বাসকে 'জাতে' উঠাইয়া লইলেন..."

গুপ্তযুগে হিন্দুধর্মের যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পেল সংক্ষেপে বলতে গেলে তা হল – ১) এই সময় ব্রাহ্মণ্যবাদের একটা পুনরুত্থান ঘটল। ২) পাশাপাশি ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগের মতো এমন কিছু দর্শনের উদ্ভব ঘটেছিল, যাদের মধ্যে অনেক বেদবিরোধী, বাস্তববাদী উপাদান লক্ষ করা যায়। আবার বেদান্ত দর্শনের মধ্যে দিয়ে ভাববাদেরও চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল। ৩) এই সময় দেখা যাচ্ছে যে অদ্বৈতবাদের হাত ধরে প্রবল রকম অদৃষ্টবাদের উদ্ভব ঘটছে। ৪) লোকায়তিক ধর্ম এবং দেবদেবীরা অঙ্গীভূত হচ্ছে। জন্ম নিচ্ছে নানারকম পুরাণ এবং অবতারবাদের। ৫) গুপ্তযুগেই প্রথম আইন বিভাগকে দেওয়ানি ও ফৌজদারি, এই দুই ভাগে ভাগ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ৬) গুপ্তযুগের শেষের দিকে, বলা যায় সমুদ্রগুপ্তের আমল থেকে জাতি-বর্ণব্যবস্থা শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং তার পর থেকে আজ অবধি সামন্তব্যবস্থা যত জটিল হয়েছে, সে অনুযায়ী জাতি-বর্ণব্যবস্থাও যুগের সঙ্গে নিজেকে সাযুজ্যপূর্ণ করে নিয়েছে। কিন্তু একটা কথা মাথায় রাখা জরুরি, মুসলিম শাসক থেকে শুরু করে ব্রিটিশ শাসকরা কেউই কিন্তু এই জাতি-বর্ণব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করেনি, কারণ অর্থনৈতিক শোষণ, লুণ্ঠনের জন্য এমন পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত পৃথিবীর আর কোনো দেশে দেখা যায়নি।

এদেশের ইতিহাসকে জানতে গেলে, বিশেষত হিন্দুত্ববাদ তথা ব্রাহ্মণ্যব্যবস্থাকে বুঝতে গেলে জাতি-বর্ণব্যবস্থাকে বোঝা জরুরি। তাই আমাদের আলোচনায় ইত্যবসরে এবিষয়ে অতি সংক্ষেপে একটু আলোকপাত করে নেওয়া যাক। আমরা আগেই দেখেছি, উপনিষদ যুগ থেকে শুরু হচ্ছে বর্ণব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী মানুষকে সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী, তথা জন্মের ভিত্তিতে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই ব্যবস্থায় কে কোন বর্ণে স্থান পাবে তা জন্মের ভিত্তিতে নির্ণয় করা হয়। প্রতিটি বর্ণের জন্য সামাজিক কাজ নির্দিষ্ট করা হয়। যেমন, ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণই হবে, আবার শূদ্রের ঘরে জন্মালে তাকে সারাজীবন ব্রাহ্মণসহ উচ্চবর্ণের সেবা করতে হবে। আর এই ব্যবস্থাটাকে স্থায়িত্ব দিতে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়, সামাজিক

মেলামেশার ক্ষেত্রে নানা বিধিনিষেধ জারি হয়। এই ছিল চতুর্বর্ণ প্রথা। খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতক থেকে সামন্ততন্ত্রের বিকাশের সাথে সাথে তা জটিল আকার পেতে থাকে এবং নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এই বর্ণব্যবস্থা থেকে জাতি (cast)-গুলির উদ্ভব হয়। শূদ্র, অতি শূদ্র বর্ণগুলি থেকে পেশা অনুযায়ী বিভিন্ন জাতিগুলির উৎপত্তি হয়। যেমন তাঁতি, গোয়ালা, জেলে, কামার, কুমোর, চামার ইত্যাদি। জাতি-বর্ণব্যবস্থার অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে দুটো বৈশিষ্ট্য খুব মৌলিক। প্রথমত, এটি অন্তর্বস্তুতে একটা শ্রেণীব্যবস্থা। দ্বিতীয়ত, এই ব্যবস্থায় কার কী সামাজিক পেশা হবে তা তাঁর জন্ম দিয়ে নির্ধারিত হয়। পৃথিবীর আর কোথাও শ্রেণীব্যবস্থার এমন রূপটি নেই। গুপ্তযুগে হিন্দুধর্মের এই যে বৈশিষ্ট্যগুলি মোটের উপর পরবর্তী সময়ের ইতিহাসে তার খুব একটা পরিবর্তন ঘটেনি।

একটা অধ্যায়ের মধ্যে হিন্দুধর্মের এই বিস্তৃতির ইতিহাসটাকে ধরা সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য, তার চেষ্টাও করিনি। আমি শুধু হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি ও মতাদর্শকে বোঝার সুবিধার্থে কিছুটা সংক্ষিপ্তভাবে এর একটা রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। এই রূপরেখার মধ্যে দিয়ে যে বক্তব্যগুলো প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতে চেয়েছি তা হল, ১) আর্যরা নয়, সিন্ধু সভ্যতা হল এখনও অবধি প্রামাণ্য তথ্যানুযায়ী এদেশের প্রাচীনতম সভ্যতা। ২) সিন্ধু সভ্যতা এবং আর্যসভ্যতা দুটো ভিন্ন জনগোষ্ঠীর দ্বারা গড়ে তোলা দুই পৃথক সভ্যতা। সিন্ধু সভ্যতা আর্য সভ্যতার তুলনায় ছিল এক উন্নততর সভ্যতা। ৩) ভারতীয় সভ্যতা মানেই হল আর্যসভ্যতা, এই ধারণা সঠিক নয়, ইতিহাস-সম্মতও নয়। পাশাপাশি বৈদিক ধর্ম মানেই হিন্দুধর্ম এমনটাও সত্যি নয়। বর্তমানে হিন্দুরা যেসব দেবদেবীর পুজো করে থাকে, তাদের মধ্যে কালী, শিব, নারায়ণ প্রমুখের উপাসনা এবং সাধন পদ্ধতির মধ্যে যোগদর্শন, তন্ত্র সাধনা, শাক্ত সাধনা এসবই এসেছে অনার্য সিন্ধু সভ্যতার কাছ থেকে। ৪) বৈদিক ধর্ম থেকে বিশেষত উপনিষদের সময় থেকে এদেশে ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থার উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটতে শুরু করেছে, যা পরবর্তীতে এদেশে জাতি-বর্ণব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করেছে। এই জাতি-বর্ণব্যবস্থা শ্রেণীশোষণেরই এক রূপ, যদিও তা শুধু এদেশেরই শ্রেণীব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মধ্যযুগ ও ভক্তি আন্দোলন

৬৫০ থেকে ১১০০ খ্রিস্টাব্দ হচ্ছে মধ্যযুগের সূচনাকাল। এই সময় আমরা দেখব, একদিকে যেমন চিরায়ত পৌরাণিক হিন্দু চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, পাশাপাশি ওই সময়ই উত্থান হচ্ছে আদি শঙ্করাচার্যের, যিনি অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যকার হিসেবে হিন্দু পুনরুত্থানের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব-রূপে পরবর্তীতেও প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন এবং বাস্তববাদী চিন্তার বদলে আরো বেশি বেশি করে এদেশের সমাজ-সংস্কৃতি অধ্যাত্মবাদের আছে আত্মসমর্পণ করছে।

১১০০ থেকে ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ এদেশের ইতিহাসে মুসলিম শাসকদের শাসনকাল হিসেবে পরিচিত, যদিও সাম্প্রদায়িকভাবে এই বিভাজন না করে এই সময়টাকে আমরা 'মধ্যযুগ' বলেই উল্লেখ করব। এই সময়ের প্রথম দিকে, বলা যেতে পারে প্রায় চোদ্দোশো খ্রিস্টাব্দের শেষ অবধি মূর্তিপূজা, হিন্দুধর্মের কঠোরতা এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী গোঁড়ামি একটা চরম মাত্রা প্রায়। ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু রাজাদের সম্মিলিত প্রতিরোধ যখন মধ্য এশিয়া থেকে আগত তুর্কি শাসকদের কাছে পরাজিত হয়, তখনই উত্তর ভারতে হিন্দুধর্মও একটা নতুন বৈশিষ্ট্যের মুখোমুখি হল। এই প্রথম তার সামনে এল ইসলামের মতো একটা অপেক্ষাকৃত সুসংহত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম। ইসলাম ধর্ম ইতিহাসে যখন প্রথম আবির্ভূত হল, তখন তা ছিল অপেক্ষাকৃত আধুনিক এক চিন্তাধারা।

আরবের যাযাবর উপজাতিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েই ইসলাম অগ্রসর হয়েছিল এবং শুধু ধর্মীয় শক্তি নয়, পাশাপাশি এক রাজনৈতিক শক্তি হিসাবেও তার উত্থান ঘটেছিল। যদি আরব দুনিয়ায় ইসলাম উত্থানের দিকে তাকাই দেখব, প্রথম দিকে আরবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বানে সাড়া মিলেছিল অভূতপূর্ব। বিস্তারের উদ্দেশ্যে পরবর্তীতে যখন ইসলামপন্থীরা অগ্রসর হলেন, তখন বাইজেন্টাইন দুর্নীতি, পারসিক স্বৈরাচার এবং খ্রিস্টিয় কুসংস্কারকে অস্বীকার করে একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠী তাতে সামিল হয়েছিলেন। ইসলামের উত্থানের পিছনে বস্তুগত কারণ ছিল। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 'ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান' বইটিতে লেখক দেখিয়েছেন, হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের আগে আরবেরা যেসব যুদ্ধবিগ্রহ করত, তা ছিল পরস্পর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। তাসত্ত্বেও তারা যুদ্ধের ক্ষেত্রে একটা কিছু রীতিনীতি মেনে চলত। সে সময় তাদের কাজ ছিল মূলত দস্যুবৃত্তি। ইসলাম আসার আগে তাদের ধর্মীয় রীতিনীতিও ছিল উদ্ভট, বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান এবং যাগযজ্ঞ পরিপূর্ণ। এদিকে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতেও তখন খ্রিস্টান কিংবা ইহুদি ধর্ম প্রবল গোঁড়ামিপূর্ণ হয়ে পড়েছিল, যা কলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্বকে তীব্র করে তুলেছিল। এমন একটা অবস্থায় ইসলাম নিয়ে এসেছিল শান্তির বাণী। তারা মানুষকে শেখাল দস্যুতাবৃত্তি ও যাযাবরপূর্ণ জীবন ছেড়ে চাষাবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য করতে। এম এন রায় লিখছেন, 'প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে নতুন সমাজের ভিত্তি পত্তন করল আরবদের এই একেশ্বরবাদ। যারাই এ নূতন ধর্মের আওতায় আশ্রয় নিল, তাদেরই এ দিল বিবেক-বুদ্ধির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। ধর্মের নির্যাতনের বিরুদ্ধে আর নিপীড়িতদের আশ্রয়রূপেই ইসলাম এমনিভাবে মাথা তুলে দাঁড়াল।' 'নির্যাতিতের আশ্রয়দাতা' শব্দটা কোনো কথার কথা নয়, এ ছিল ইসলামের আবির্ভাবের সময়ের বাস্তবতা, যা আবির্ভাবের সময়কালে ইসলামের উদারতা এবং

পরমতসহিষ্ণুতারই পরিচায়ক বহন করে। এম এন রায় লিখছেন, 'মিশর, পারস্য এমনকি খ্রীষ্টজগৎ থেকেও নির্যাতিত সম্প্রদায়গুলো স্বাধীন অতিথিপরায়ণ মরুদেশে আরবভূমির দিকে পালিয়ে এসেছিল – কারণ সে দেশে তারা যা ভাবত তা প্রকাশ্যে বলতে পারত আর যা প্রকাশ্য বলত তা কাজে পরিণত করত। পারসীরা যখন আসীরীয়দের রাজত্ব দখল করে নিল আর সেই সঙ্গে যখন ব্যাবিলনের ধর্মবেদী প্রাচীন পারসিক পুরোহিতদের দ্বারা হল বিপর্যস্ত তখন নিসর্গপূজারী পুরোহিতরা তাদের প্রাচীন বিশ্বাস আর জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত মূল্যবান জ্ঞান নিয়ে পার্শ্ববর্তী মরুভূমির দিকেই দিল পাড়ি। এর কিছুকাল আগে আসীরীয় আক্রমণ বহু একনিষ্ঠ ইসরাইল বংশীয়দেরও সেই অতিথি সেবাখ্যাত মরুপ্রান্তরে চলে যেতে বাধ্য করেছিল। জন ব্যাপটিস্ট পর্যন্ত হিব্রু পয়গম্বরই তাই দেখি আরব মরুভূমির মধ্যেই বসবাস করছেন, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করছেন আর করছেন তাঁদের ধর্মমত প্রচার।'

ইসলামের মতে জগতে সবকিছুই সর্বশক্তিমান আল্লাহের সৃষ্টি। মানুষের সঞ্চালনের জন্য আল্লাহ্ ফেরেশতা (দেবদূত) জিব্রাইল মারফত একটা 'দিব্যগ্রন্থ' হজরত মহম্মদের কাছে প্রেরণ করেছেন, যাতে আল্লাহের পয়গাম (বাণী) লিপিবদ্ধ করা আছে। এই 'দিব্যগ্রন্থে'র নাম পবিত্র 'কোরান'। হজরত হচ্ছেন আল্লাহ্ প্রেরিত এখনও অবধি সর্বশেষ দূত (রসুল) বা নবী সাহেব। ইসলাম ধর্মমত অনুযায়ী মানুষের অস্তিত্বের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর উপাসনা করা। ইসলামিরা জগৎটাকে মায়া মনে করেন না, বরং তাঁদের ধর্মমত অনুসারে আল্লাহের দেওয়া জীবন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই জীবনে সুখও আছে, দুঃখ বা দুঃসময়ও আছে। এই বিশ্বের সবকিছুই আল্লাহ্ কর্তৃক পূর্বনির্দিষ্ট। ইসলাম একেশ্বরবাদী। পাশাপাশি তাঁরা মূর্তিপূজা-বিরোধী, কারণ তাঁরা মনে করেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ নিরাকার। কোরান ছাড়া ইসলামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল 'হাদিস'। হজরতের জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ হাদিস থেকেই পাওয়া গেছে। তাঁর উপদেশ, চরিত্র-মাহাত্ম্য, তাঁর তেইশ বছরের নবীজীবনের সময়ের আর্থসামাজিক অবস্থা, শাসন, আইন, বিচার, কৃষি, বাণিজ্য এবং সর্বশেষ অধ্যাত্মবাদী চিন্তাধারা সম্পর্কে এই গ্রন্থে গুরুত্বপূর্ণ সব কথা লেখা আছে। এছাড়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল 'সুন্ন' বা নিয়ম বা প্রথা যার একটা বড়ো অংশ হাদিসে উল্লিখিত আছে। অনুমান করা হয়, এই সুন্নগুলি সপ্তম শতকের শেষের দিক থেকে সংকলিত হতে শুরু করে অষ্টম শতকের শুরুর দিক অবধি লেখা হয়েছিল। ইসলামের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ হল 'শরিয়ত'। একজন মুসলমানের জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি এমনকি কবর দেওয়া অবধি সবকিছু আচার-আচরণ, নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ করা আছে এই শরিয়তে। একজন ইসলাম ধর্মাবলম্বীর জীবনে শরিয়ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই শরিয়তসহ ধর্মশাস্ত্রগুলো থেকে বোঝা যায়, একজন ধর্মবিশ্বাসী মুসলমানের জীবন কত কঠোর নিয়মকানুনে বাঁধা।

বলা বাহুল্য, মুসলিমরা এদেশে শাসক হিসেবে আসার পর তার প্রভাব হিন্দুধর্মেও পড়ল। একে রাজধর্মের বদল ঘটল, তায় আবার হিন্দুধর্মের কঠিন কঠোর এবং অবমাননাকর জাতিভেদপ্রথা শূদ্রকে ক্রমশ ব্রাহ্মণ্যবাদ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছিল, এদিকে ইসলামে কোনো জন্ম তথা জাতের ভিত্তিতে কর্মবিভাজন নেই, সামাজিকভাবে উঁচু-নিচু ভেদও নেই, ফলত স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুদের মধ্যে বিশেষত যাঁরা জাতপাতের ঘৃণ্য শিকার হয়ে হীনভাবে দিন

গুজরান করছিলেন, তাঁদের মধ্যে ইসলাম ধর্মের প্রতি আগ্রহ বাড়তে লাগল। এদিকে ততদিনে আবার হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণ্যবাদী বিধিনিষেধও কঠোরতর হতে লাগল। একদিকে ভারতে হিন্দু থেকে ইসলাম ধর্মে রূপান্তরিত হওয়াদের সংখ্যাও ক্রমশ বাড়ছিল, অন্যদিকে আবার হিন্দু, মুসলমান ধর্মের মানুষ পাশাপাশি বসবাস করতে করতে একটা নৈকট্যও তৈরি হচ্ছিল। ফলে হিন্দুদের মধ্যে যেমন এর এক প্রভাব পড়েছিল, মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় জায়গা থেকেই তার প্রভাব লক্ষ করা গেল। ফলে এদেশের মাটিতে ইসলামের মধ্যে কিছু নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যেতে থাকে। অন্যদিকে হিন্দুদের একাংশও মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিলেন। সুফি মতবাদের ঈশ্বর সাধনার বহুবিধ পথের দ্বারাও তাঁরা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। চতুর্দশ শতকের প্রথমদিকেই রাম-রহিম এক এবং অদ্বিতীয়, এধরনের ধারণা সামনে আসতে থাকে। আকবরের সময় তার প্রবর্তিত দীন-ইলাহি ধর্ম এই প্রক্রিয়াকে আরো ত্বরান্বিত করেছিল। কারণ, আকবর তাঁর প্রবর্তিত ধর্মে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় ধর্মেরই যেগুলো তাঁর যুক্তিসম্মত মনে হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা যেমন করেছিলেন, তেমনই উভয় ধর্মেরই কিছু কিছু আচারবিচার সাধন পদ্ধতির বিরোধিতাও করেছিলেন। এরজন্য তাঁকে ১৫৮০ সালে রক্ষণশীল মোল্লাতন্ত্রের বিদ্রোহের মুখোমুখিও হতে হয়েছিল। মোল্লাতন্ত্র আকবরকে 'ইসলাম বিরোধী' বলে প্রচারও করতেন। নমাজ পাঠের বিরোধী হলেও, আকবর কখনো তাতে বাধা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। যাই হোক, মোটের উপর এই সময়টাকে ইসলাম ধর্মের প্রসারেরই কালপর্ব বলে ধরে নিতে হবে। ইসলামের অগ্রগতির এই পর্যায়ে একদিকে যেমন কোরানের বিশুদ্ধতা রক্ষায় বিশ্বাসী উলেমাদের সঙ্গে সুফিদের বিরোধ লক্ষণীয়, তেমনি হিন্দু সমাজেও একদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদ আরো রক্ষণশীল হয়ে উঠছে, আবার পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রূপ হিসেবে ভক্তি আন্দোলন।

চোদ্দোশো থেকে সতেরশো খ্রিস্টাব্দের বিকাশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওই সময়টা ভক্তি আন্দোলন দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে, যা ব্রাহ্মণ্যবাদী আচার-আচরণকে অনেক ক্ষেত্রেই অস্বীকার করেই গড়ে উঠছে। উত্তর ভারতে এই আন্দোলনে উঠে আসছে রামানন্দ, রবিদাস, শ্রীমন্ত শংকরদেব, শ্রীচৈতন্য, বল্লভাচার্য, সুরদাস, মীরাবাঈ, কবীর, তুলসীদাস, নামদেব, ধ্যানেশ্বর, গুরু নানকের নাম, আর দক্ষিণ ভারতে এই আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিলেন আন্নামাচার্য, ভদ্রাচল রামদাস, ত্যাগরাজ প্রমুখ – যাঁরা মনে করতেন, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে, ধর্মীয় জটিল আচারবিচার (যা সমকালীন ব্রাহ্মণ্য সমাজ জনগণের মাথার উপর চাপিয়ে দিয়েছিল) এবং দর্শনের দুরূহ তত্ত্বকথা ছেড়ে স্রেফ প্রেমের পথেই ঈশ্বর সাধনা করা যায়। এছাড়াও এই আন্দোলন ধর্মাধর্ম ভেদাভেদ, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতার বিরোধী ছিল এবং অন্তর্বস্তুতে তা সুফি আন্দোলনের অনেক কাছাকাছি ছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবল পরাক্রমের যুগে যা নিঃসন্দেহে ছিল বেশ কিছুটা উদার চেতনার প্রকাশ। ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে তা ছিল দৃশ্যতই এক বিদ্রোহ। এই সময় প্রচুর গীতি, কবিতা, সাহিত্য তৈরি হয়। যদিও এই আন্দোলনে কৃষ্ণ এবং রামের অনুগামীদের প্রভাব ছিল, তা বলে শৈব অনুগামীদের প্রভাবও কম ছিল না। পরবর্তীতে বিশ শতকে বাসব শৈবধর্মের প্রসার ঘটান। এঁরা জাতি-বর্ণব্যবস্থা ও ব্রাহ্মণ্যবাদকে অস্বীকার করেছিলেন। সতেরোশো খ্রিস্টাব্দে বাংলায় রামপ্রসাদের শ্যামাসংগীতও খুব জনপ্রিয় ছিল। তিনি ছিলেন মা কালীর, তথা শক্তির উপাসক। ভক্তিবাদী নীতি অনুসারে ঈশ্বরের কাছে প্রতিটি

মানুষই সমান। এই নীতির মধ্যে যে একটা সাম্যের আদর্শ আছে, এব্যাপারে কারোর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয়। এছাড়াও ক্ষমতাবানদের কাছে এবং সমাজের ব্রাহ্মণ্যবাদী মাতব্বরদের কাছে এটা ছিল একটা প্রতিবাদও। ভক্তিবাদী আন্দোলনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল কবীর। কবীর বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন জাতিতে জোলা বা তাঁতির সন্তান। তাঁর দোহাগুলি ছিল সর্বপ্রকার মানুষের সমন্বয়ের নীতিমালা। তিনি প্রচার করতেন ঈশ্বর রামও নন, রহিমও নন, তাঁর বাস মানুষের মনে, তিনি কখনো মানুষের মধ্যে ধর্ম নিয়ে হানাহানি পছন্দ করতেন না। তিনি চেয়েছিলেন মানুষে মানুষে মৈত্রী। কবীর জাতিভেদেরও কঠোর সমালোচক ছিলেন। মহারাষ্ট্রে নামদেব ছিলেন এই আন্দোলনের আরেক নেতা। তিনিও ছিলেন দর্জির সন্তান। তিনিও জাতিভেদের কঠোর সমালোচক ছিলেন। ষোড়শ শতকের শুরুতে 'সৎপন্থ' (সৎপন্থা থেকে কথাটা এসেছে) নামক একটি ভক্তিবাদী গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। এঁরা গুজরাত, সিন্ধু, পঞ্জাবে প্রসারিত হয়েছিলেন। রবিদাস ছিলেন আরেকজন ভক্তিবাদী নেতা, যিনি চর্মকার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তার মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন। বিশেষত, সমাজের নিচুতলার মানুষদের তিনি সংগঠিত করেছিলেন। সুরদাস, শ্রীচৈতন্যরাও কৃষ্ণপ্রেমের কথা বললেও তাঁদের উদার ধর্মীয় ভাবধারার প্রেরণায় হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ব্যাপারে এবং জাতপাত ভেদাভেদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। ভারতের ধর্মসংস্কারের বিকাশে ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তা, আচার-অনুষ্ঠান এবং জাতিভেদের বিকল্প হিসেবে যে মতবাদগুলির উত্থান হয়েছিল তার মধ্যে শিখধর্ম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিখধর্মের মূল কথা ছিল জাতি, বংশ, রাজনৈতিক ক্ষমতা, ধর্মমত নির্বিশেষে সব মানুষ সমান। নানক মূলত ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদবিরোধী সন্তদের সাধারণ মানুষকে তাঁদের কথ্যভাষায় দার্শনিক মতবাদ পৌঁছে দেওয়ার যে পদ্ধতি, তা অনুসরণ করেছিলেন। মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী না হলেও তিনি অবশ্য পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, কর্মফলে বিশ্বাস করতেন।

মোটের উপর, এই গোটা পর্যায়ে আমরা দেখি, ইসলামের মতো একটা সুসংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের মুখোমুখি হয়ে হিন্দুধর্মের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ্যবাদ আরো বেশি বেশি রক্ষণশীল হয়ে উঠছে এবং আচার-বিচারের কঠোরতাও তাদের আরো বাড়ছে, বিপরীতে জন্ম নিচ্ছে ভক্তি আন্দোলনের মতো অপেক্ষাকৃত উদার চিন্তাভাবনা। কট্টর ইসলামবিরোধী এবং প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির উগ্র সমর্থক পাশ্চাত্য পণ্ডিত হ্যাভেল পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, 'হিন্দু সমাজ জীবনে মুসলমান রাজনৈতিক মতবাদের ফল ফলেছে দু'রকমে – জাতিভেদের গোঁড়ামিকে এ যেমন একদিকে শক্ত করেছে, তেমনি তার বিরুদ্ধেও সৃষ্টি করেছে এক বিদ্রোহ। হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের চোখের সামনে তা এঁকেছে এক প্রলুব্ধকর ভবিষ্যতের ছবি, তাতে মরুভূমির বেদুইনদের মতো তারাও হয়েছে আকৃষ্ট। ...শূদ্রকে এ দিয়েছে মুক্ত মানুষের অধিকার আর ব্রাহ্মণদের উপরও প্রভুত্ব করার ক্ষমতা। ইউরোপের পুনর্জাগরণের মতো চিন্তাজগতে এও তুলেছে তরঙ্গাভিঘাত, জন্ম দিয়েছে অসংখ্য দৃঢ় মানুষের আর অনেক অত্যাদ্ভুত মৌলিক প্রতিভার। পুনর্জাগরণের মতো এও ছিল আসলে এক প্রৌঢ় আদর্শ। এরই জন্য তাঁবু ছেড়ে যেতে হয়েছে যাযাবরকে আর শূদ্রকে ত্যাগ করতে হয়েছে তার গ্রাম। মোটের ওপর এরই ফলে গড়ে উঠল বাঁচার আনন্দে পরিপূর্ণ এক বিরাট মানবতা।'

তৃতীয় অধ্যায়

ঔপনিবেশিক ভারত : হিন্দু পুনরুত্থানবাদ

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পর্বে হিন্দু সংস্কার আন্দোলন এক নতুন মাত্রা পায়। এর পিছনে ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির এক সচেতন প্রয়াস লক্ষণীয়। আজকের সংঘ পরিবারের উৎপত্তিকে বুঝতে গেলে এই ব্রিটিশের স্বার্থবাহী ইতিহাস চর্চার প্রেক্ষিতে হিন্দু পুনরুত্থানবাদের ইতিহাস এবং চরিত্রটিকে ভালো করে বোঝা জরুরি।

১৮০০ শতকের শেষ দিক থেকে ১৯০০ শতকের শুরুর পর্যায়কালে প্রাচ্য গবেষণা এবং অনুবাদ ইউরোপীয় ইতিহাস পণ্ডিতদের হাতে আসে। উইলিয়াম জোন্স, ফিলিপ্পো সসেটির মতো ইউরোপীয়রা সে সময় থেকে দাবি জানাতে থাকেন, সংস্কৃত ভাষার সাথে ইউরোপীয় কিছু ভাষার মধ্যে বেশ কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। এই সময় থেকে তাঁদের তুলনামূলক ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে একটা উৎসাহ তৈরি হতে থাকে। এই ভাষাতত্ত্ব চর্চার মাধ্যমেই ওই সব ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মনে হতে থাকে গ্রিক, ল্যাটিন, পারসিক, এবং সংস্কৃত – এই চারটি ভাষার উৎসে আছে কোনো আদিভাষা। যে ভাষাকে তাঁরা মনে করতেন 'আর্যভাষা'। উনিশ শতকের ইউরোপে, বিশেষত জার্মানিতে আত্মপরিচয়ের উৎসমুখের অনুসন্ধানের যে আগ্রহ তৈরি হয়েছিল, মনে করা হয় যে তখনই আর্যভাষা ও আর্যজাতি এই দুই ধারণার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যায়, বা হয়তো সচেতনভাবেই তা করা হয়। এই আর্য চর্চা শেষ অবধি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাতকেই শক্ত করল। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় থেকেই হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, শাসক ইংরেজকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল। ইতিহাস বলছে যে, তার আগে এদেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মোটের উপর এক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই লক্ষ করা যায়। ব্রিটিশই প্রথম তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে মাথায় রেখে এদেশে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকে ভাঙতে সচেতন উদ্যোগ নেয়। লর্ড কার্জন রোমান সাম্রাজ্যের অনুকরণে 'ভাগ কর, শাসন কর' এই নীতিতে দেশ চালানোর সাম্রাজ্যবাদী নীতির কথা শুধু প্রকাশ্যে ঘোষণাই করেননি, আমরা জানি ১৯০৫ সালে তিনি বঙ্গভঙ্গেও উদ্যোগী হয়েছিলেন। মহারানি ভিক্টোরিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে এদেশের শাসনভার গ্রহণের পর থেকেই ব্রিটিশ সরকার এদেশের প্রাচীন গ্রন্থাদি পুনরুদ্ধারের কাজটি শুরু করে, যা বস্তুত হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের চিন্তার ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছিল। ব্রিটিশদের এই কাজে অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখেন জার্মান ভাষাতত্ত্ববিদ ম্যাক্সমুলার। রোমিলা থাপারের মতন ঐতিহাসিকদের মতে, এই মানুষটি ছিলেন গোঁড়া, রক্ষণশীল। ইউরোপে একদিকে যখন নব্য বুর্জোয়াশ্রেণীর সমর্থক দার্শনিকদের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসার ঘটছে তখন তা সহ্য করতে না পেরে ম্যাক্সমুলারের মতন রক্ষণশীলরা ভারতে এসে প্রাচীন ভারতীয় তথা বৈদিক সংস্কৃতির মধ্যে 'মোক্ষ' খুঁজেছিলেন। তিনি নিজেকে মোক্ষমুলার বলতে পছন্দ করতেন। তিনি বেদ উদ্ধার ও সংকলনের কাজ করতেন। আর এই কাজে তিনি ছিলেন ব্রিটিশের মাইনে-করা কর্মচারি। ম্যাক্সমুলার ছিলেন মূলত ভাষাতত্ত্ববিদ। তাঁর মতে, ঋগ্বেদ ছিল ইন্দো-ইউরোপীয়দের প্রাচীনতম স্তর। তাঁর মতানুযায়ী, আর্যদের আদিবাস ছিল মধ্য এশিয়ায়। এদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী ইউরোপে চলে যায়, অন্য গোষ্ঠীটি প্রথমে চলে যায় ইরানে। ইরানের অংশটি

পরে বিভাজিত হয়ে একটা অংশ ভারতে আসে। ম্যাক্সমুলারের মতে, আর্য সভ্যতাই হচ্ছে এদেশে প্রথম প্রাচীন সভ্যতা। তিনি মুসলমান শাসনকে অত্যাচারী শাসন বলে অভিহিত করেছিলেন, যদিও এর সপক্ষে কোনো সদর্থক যুক্তি দিতে পারেননি। তাঁর উক্তি ব্যবহার করে ব্রিটিশ শাসকরা দেখাত যে, এদেশে মুসলমান শাসকদের আমলে একটা অত্যাচারের যুগের সূত্রপাত হয়েছিল, যার হাতে থেকে ব্রিটিশরা হিন্দুদের রক্ষা করেছে। দেখাত, ব্রিটিশরা অর্থাৎ ইউরোপীয় নর্ডিকরা, আসলে আর্য হিন্দুদেরই এক অর্থে জাতিভাই। ম্যাক্সমুলারের এদেশীয় সমর্থক ছিলেন তথাকথিত হিন্দু পুনরুত্থানবাদীরা। বিবেকানন্দ ম্যাক্সমুলারকে 'দ্বিতীয় সায়নাচার্য' বলে অভিহিত করেছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের মতো হিন্দু সংস্কারবাদী নেতা বলেছিলেন, 'ইংরাজ জাতির ভারতবর্ষে আগমনের ফলে আমরা যেন দুই বিচ্ছিন্ন ভ্রাতার মিলন দেখতে পাই, যারা সুপ্রাচীন আর্যজাতির অন্তর্গত দুই পৃথক পরিবারের উত্তরাধিকার।'

ম্যাক্সমুলারের আর্যতত্ত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে সেকালের হিন্দু পুনরুত্থানবাদীরা এতটাই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে রাজনারায়ণ বসুর মতো ব্রাহ্ম পণ্ডিতও 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব'-এর মতো বই লিখে ফেললেন! ম্যাক্সমুলারের এই 'আর্যদের শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্ব' উগ্র হিন্দুয়ানার উপর ভিত্তি করে এক উগ্র জাতীয়তাবাদের বনিয়াদ তৈরি করেছিল, যেখানে হিন্দু ছাড়া আর সকলেই বহিরাগত, ব্রাত্য। এই 'হিন্দু' হল গিয়ে আবার তারাই, যারা আর্যদের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নেবে। আর এরই হাত ধরে গোঁড়ামিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পরিপুষ্ট হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ ছিলেন এই চিন্তার সামনের সারিতে, যাঁরা 'হিঁদুয়ানি'র নামে বস্তুত দেশকে পিছনের দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের অন্যতম ধারা আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী অবশ্য ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে আর্য আগমনের প্রশ্নে ভিন্নমত পোষণ করতেন। তিনি মনে করতেন, আর্যরা তিব্বত থেকে এসেছিল। ১৮৭৫ সালে তিনি আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। আর্যসমাজের সদস্যরা বেদকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ বলে মনে করতেন। তাঁরা পুরাণকে মানতেন না। এঁদের আরাধ্য দেবতা হচ্ছে 'ওঁ' (ওঙ্কার), এঁদের প্রতিষ্ঠিত 'গুরুকুলে' তাই মূর্তিপূজার জায়গায় উপাসনা, সান্ধ্যপ্রার্থনা ইত্যাদি দেখা যায়। আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী বৈদিক সাহিত্যকে জনপ্রিয় করতে সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে হিন্দি ভাষায় ধর্মীয় তর্ক শুরু করেন। 'শুদ্ধি আন্দোলন' চালিয়ে তাঁরা ধর্মান্তরিত মুসলমান এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষকে পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। মূলত রক্ষণশীল গোঁড়া মনোভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও কিছু কিছু ধর্মসংস্কারে তাঁরা কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপও নিয়েছিলেন। যেমন, এঁরা অস্পৃশ্যতা এবং বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ছিলেন। এছাড়াও নারীর অধিকার (ভোটাধিকারসহ) এবং বিধবাদের সুরক্ষা দেওয়ার প্রশ্নে ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে, এমন সময় এঁরা বিধবাদের সুরক্ষার কথা বলতেন, যখন ব্রাহ্মণ্যবাদ সতীদাহের পক্ষে ওকালতি করছে। এছাড়াও কাংরা ভূমিকম্পের সময় এঁরা ভূমিকম্পপীড়িত আর্তদের জন্য খুব দ্রুত একটা বড়ো পরিমাণ ত্রাণের ব্যবস্থা করেছিলেন। অবশ্য একথাও মনে রাখতে হবে যে, জনসেবামূলক কাজকর্ম সব ধর্মীয় সংগঠন, মঠ-মিশনেরই ধর্মপ্রচারের অপরিহার্য দিক।

হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের আরেক নেতা ছিলেন বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণকে অনেকে নয়া বেদান্তবাদী তথা নয়া হিন্দুত্ববাদী ধারার প্রতিনিধি হিসাবেই চিহ্নিত করে থাকেন। যদিও বিবেকানন্দের জীবনের সমস্ত পর্বটাতেই তিনি প্রচুর স্ববিরোধী কথাবার্তা বলে গেছেন। এবিষয়ে একজন বেদজ্ঞ পণ্ডিত শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষালকে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর জানাচ্ছেন, "রামমোহন, বিদ্যাসাগর যে বিচারশীলতা ও যুক্তিবাদের ধারা বইয়ে দিয়েছিলেন আমাদের দেশে তার স্রোত রুদ্ধ করে দেন বিবেকানন্দ Neo- Hinduism-এর বালির বাঁধ খাড়া করে। স্বামীজী সম্পূর্ণ split personality, তার উক্তিগুলি contradiction-এ ভরা। অদ্বৈতবাদের সঙ্গে মূর্তিপূজা মেলাবার অসাধ্য সাধন করেছেন। যে অলস মনগুলি রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির ধাক্কায় জেগে উঠেছিল, ভিতরে ভিতরে অসোয়াস্তি বোধ করছিল, সেগুলোকে তিনি আশ্বাস দিলেন যে ঘেঁটু পূজার মধ্যেও সত্য আছে। অজ্ঞানরা এই আশ্বাস পেয়ে – যত মত তত পথ – আবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে লাগল। ...intellectual sphere-এ 'যত মত তত পথ' কথাটি একেবারে ভুল কথা, বাজে কথা। সব মত পথ নয়, অনেক মত অপথ ও কুপথ। তাই পথ বলতে যদি সত্যের পথ হয় তাহলে সব মত সত্যের পথ নয়, হতে পারে না। ...বিবেকানন্দ সাংঘাতিক ক্ষতি করেছেন আমাদের। তিনি রথের যাত্রাটিকে উল্টোরথের যাত্রা করে দিয়ে চলে গেছেন।"

মুখে আধুনিকতার কথা বললেও স্বামীজি শুধু রক্ষণশীলই ছিলেন না, তিনি ছিলেন শোষণমূলক জাতি-বর্ণব্যবস্থার সমর্থকও। একদিকে তিনি 'শূদ্র জাগরণের' কথা কিংবা 'চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই' কথা বলেছেন, পাশাপাশি তিনি এদেশের জাতি-বর্ণব্যবস্থার প্রশংসা করে বলছেন – 'জাতিভেদ না থাকলে [ভারতে] ইওরোপীয়ানদের শিক্ষণীয় কিছুই থাকত না। মুসলিমরা সব ধ্বংস করে দিত।' বিবেকানন্দের এধরনের অসংখ্য উক্তি দিয়ে লেখাটিকে আমি দীর্ঘায়িত করব না। শুধু এই একটা উক্তি থেকেই শূদ্র এবং মুসলমানদের সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে। তবুও এদেশের বর্ণাশ্রমপ্রথা নিয়ে তাঁর মতামতকে আরেকটু স্পষ্ট করার জন্য তাঁর আরেকটা উক্তিকে তুলে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না। উক্তিটি তাঁর বাণী ও রচনার (নবম খণ্ড) থেকে নেওয়া হয়েছে। বিবেকানন্দ বলছেন, "ঋষি ও মুনিগণের মতো চলতে হবে; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষির মন্ত্রে দেশটাকে দীক্ষিত করতে হবে। তবে সময়োপযোগী কিছু কিছু পরিবর্তন ক'রে দিতে হবে। ...প্রথমত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারভাগে দেশের লোকগুলোকে ভাগ করতে হবে। সব বামুনকে এক করে একটা বামুনজাত গড়তে হবে। এইরূপ সব ক্ষত্রিয়, সব বৈশ্য, সব শূদ্রকে নিয়ে অন্য তিনটে জাত ক'রে সকল জাতিকে বৈদিক প্রণালীতে আনতে হবে। নতুবা শুধু 'তোমায় ছোঁব না' বললেই কি দেশের কল্যাণ হবে রে? কখনোই নয়।"

বিবেকানন্দের মধ্যে আবার এতটাই স্ববিরোধ যে এই তিনিই আবার শূদ্রদের ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হওয়ার কথাও বলেছেন। 'ভারতের ভবিষ্যৎ'-এ জাতিভেদ সমস্যা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'ভারতের আদর্শ সবাইকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করা, ব্রাহ্মণ মনুষ্যজাতির আদর্শ।' ...'উচ্চতর বর্ণকে নীচে নামাইয়া এ সমস্যার (জাতিভেদ) সমাধান হইবে না, নিম্ন জাতিকে উন্নত করিতে হইবে।' ...'চণ্ডালকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করতে হবে।' তাঁর এই শূদ্রদের এবং

তথাকথিত অন্ত্যজদের ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করা প্রসঙ্গে শিবরাম চক্রবর্তী তাঁর 'শূদ্র না ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধে সবচেয়ে মজার কথাটি বলেছেন, 'সমস্ত শূদ্রকে ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করা হোক, এই মর্মে একটা প্রস্তাব সম্প্রতি হয়েছে। এই প্রস্তাবে আমার আপত্তি। পৃথিবীর কোথাও একদল মানুষ আছে যারা নরখাদক, সেই কারণে পৃথিবীর সব মানুষকে নরখাদক বলে ঘোষণা করা হোক – এই মতে আমি কিছুতেই সায় দিতে পারিনে। বরং আমার মতে, সম্ভব হলে নরখাদকদেরই মানুষ করার পক্ষে চেষ্টা হওয়া উচিত।'

নিরঞ্জন ধর, আশীষ লাহিড়ী, কণিষ্ক চৌধুরী, রাজেশ দত্ত, সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো গবেষকরা যাঁরা বিবেকানন্দকে প্রচলিত ধারার বাইরে থেকে গবেষণা করে প্রকৃত সত্যকে সামনে আনতে চেষ্টা করেছেন এবং করছেন, তাঁরা কতগুলি বিষয়কে ধারাবাহিকভাবে আমাদের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন যে, ১) বিবেকানন্দ আদৌ সর্বধর্মসমন্বয়কারী, অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, তিনি হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে গিয়ে ইতিহাস, বিজ্ঞানের আধুনিক ব্যাখ্যাগুলোর শুধুমাত্র ধারই ধারতেন না, কেবল তা-ই নয় সমস্ত ধারণাগুলোকে বস্তুত তালগোল পাকিয়ে ফেলতেও তাঁর জুড়ি ছিল না। ২) মোটের উপর পরধর্মের প্রতি তিনি অসহিষ্ণুই ছিলেন। ৩) বৈদিক যুগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি বস্তুত আধুনিক বিজ্ঞানের বিরুদ্ধেই অবস্থান নিয়েছিলে এবং বেদের যুগকে মহিমান্বিত করার নামে তিনি আসলে চরম রক্ষণশীল চিন্তার পক্ষেই দাঁড়িয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, উন্নত সিন্ধু সভ্যতাকে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত আর্যসভ্যতা কর্তৃক ধ্বংসসাধন বিবেকানন্দের চোখে ছিল 'পশু প্রকৃতির মানুষদের উন্নত করা'। কারণ, বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'ভারতে প্রথম বিজেতা আর্যগণ ভারতের আদি অধিবাসীদের সেরূপ নির্মূল করার চেষ্টা করেন নি; বরং তাঁদের প্রয়াস ছিল কি করে পশুপ্রকৃতি মানুষদের উন্নত করা যায়।' (বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৭) ইতিহাস-সম্পর্কিত অজ্ঞতার কী নিদারুণ পরিণতি! ৪) 'শূদ্র জাগরণ'-এর কথা কিংবা 'চণ্ডাল ভারতবাসী'কে 'ভাই' বলে সম্বোধন করলেও তিনি মূলগতভাবে জাতিবর্ণের কাঠামোকে টিকিয়ে রাখার পক্ষেই ছিলেন। ৫) নারীর প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পুরোনো সনাতনী সামন্তবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। যে কারণে পাশ্চাত্যের নারীদের গাড়ি চালানো, কিংবা অফিস যাওয়াকে তিনি যে ভালো চোখে দেখেননি, তা তিনি তাঁর লেখাতেই উল্লেখ করে গেছেন। স্বামীজি বাল্যবিধবাদের পুনর্বিবাহের প্রশ্নে খুব একটা আপত্তি না করলেও প্রাপ্তবয়স্ক বিধবাদের পুনর্বিবাহের বিপক্ষে ছিলেন। অর্থাৎ এপ্রশ্নে তাঁর অবস্থান ছিল মোটের উপর বিদ্যাসাগরের বিপক্ষে। ৬) বিবেকানন্দও ম্যাক্সমুলারদের সঙ্গে কোরাস মিলিয়ে বলেছিলেন, 'ভারতে মুসলমানরাই প্রথম পরধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করিয়াছিল'। অর্থাৎ আজ যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষটি এদেশের মাটিতে ফুলে-ফলে পল্লবিত হয়েছে, ব্রিটিশ সরকারের সৌজন্যে তার উৎপত্তি এবং তা একসময় বিবেকানন্দের মতো তথাকথিত হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছিল।

ঔপনিবেশিক আমলের ধর্ম সংস্কারের দিকে যদি আমরা নজর দিই, স্পষ্টতই দেখব হিন্দু এবং ইসলাম উভয় ধর্মের মধ্যেই দুটো ধারা দেখা যাচ্ছে, যার একটা অপেক্ষাকৃত যুক্তিবাদী ধারা। হিন্দু ধর্মীয় সংস্কারে এই ধারার প্রতিনিধি হিসেবে বাংলায় রামমোহন, বিদ্যাসাগরদের নাম উল্লেখযোগ্য। মহারাষ্ট্রে এই যুক্তিবাদী উদার ধারাটির প্রসঙ্গে এলে সবার আগে যে ব্যক্তিটির নাম

উল্লেখ করতে হয়, তিনি হলেন মহাদেব গোবিন্দ রানাডে। এই ধারাটি অপেক্ষাকৃত যুক্তিবাদী ধারা হিসেবে পরিগণিত হলেও, এঁদের প্রধান দুর্বলতা ছিল ব্রিটিশ শাসনকে এঁরা 'আশীর্বাদ' বলে মনে করতেন। অন্য ধারাটি ছিল এই হিন্দু পুনরুত্থানবাদী ধারা, যে ধারার অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি হিসাবে বাংলায় ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, বিবেকানন্দ প্রমুখ। আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ছিলেন মূলত গুজরাতের বাসিন্দা, যদিও তিনি বোম্বে অধুনা মুম্বাইয়ে প্রথম আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়া এই ধারার প্রতিনিধি হিসাবে যাঁর নাম করতে হয়, তিনি হলেন মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক।

হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের অনেকেই শুরুর দিকে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের প্রেরণাদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও, শেষ পর্যন্ত তাঁদের চিন্তাধারা ব্রিটিশ শাসকদের 'ডিভাইড্ অ্যান্ড রুল' পলিসিকেই শক্তিশালী করেছিল এবং স্বভাবতই তাঁদের এই ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে ব্যাপক মুসলমান জনগণের আস্থা তাঁরা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। পরবর্তীতে এই চিন্তাই আরো বেশি প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র অর্জন করে সংঘ পরিবারের মতাদর্শের জন্ম দিয়েছে। সে বিষয়ও আমরা পরে আসব।

এই সময় ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও একইভাবে একটা অপেক্ষাকৃত উদার চিন্তাধারা এবং আরেকটা গোঁড়া রক্ষণশীল ধারাকে আমরা দেখতে পাব। মুসলিম সমাজের মধ্যে আধুনিক চিন্তার প্রসারে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন যে ব্যক্তি তিনি হলেন সৈয়দ আহমেদ খান। তিনি কোরানকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, তার সাথে প্রাচীনপন্থীদের ব্যাখ্যার অনেকাংশেই বিরোধ লক্ষ করা যায়। ইংল্যান্ডে গিয়ে ইংরাজি শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে তিনি মুসলমান সমাজের মধ্যে ইংরাজি ভাষা শিক্ষার ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রসারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। যদিও রামমোহনের মতো তিনিও ব্রিটিশ শাসনকে স্বাগত জানাতে দ্বিধা করেননি। শুধু তাই নয়, মহাবিদ্রোহের সময় তিনি বিদ্রোহীদের বিরোধিতাও করেছিলেন এবং ভারতীয় মুসলমানদের ব্রিটিশ রাজকে ভক্তির পরামর্শ দিয়েছিলেন। উল্টোদিকে মহম্মদ আলির মতো মুসলিম নেতারা প্যান-ইসলামিক ধারণা এবং তুরস্কের খলিফার প্রতি ধর্মীয় আনুগত্যের জায়গা থেকেই ব্রিটিশবিরোধী অবস্থান নিয়েছিলেন এবং খিলাফত আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। যদিও তিনি দেশবাসীকে হিন্দু-মুসলমান এই দুই ধরনের সাম্প্রদায়িক জাতীয় চেতনা হিসেবে দেখতেন, তথাপি গান্ধিজির সঙ্গে একযোগে অসহযোগ আন্দোলনে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। ইসলামি আলোকপ্রাপ্তদের মধ্যে অন্যতম মহাকবি ইকবাল ছিলেন মুসলিম মনস্বীদের মধ্যে সবচেয়ে রক্ষণশীল চিন্তাধারার প্রতিনিধি। ইকবাল মূলত কবি ছিলেন। তাঁর কবিতা উর্দু ভাষার ভাণ্ডারে এক মূল্যবান সম্পদ সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি ইসলাম ধর্মীয় শুদ্ধতা রক্ষায় অর্থাৎ এক কথায় বললে কোরানের বিশুদ্ধতা রক্ষার পক্ষে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে অবস্থান নিয়েছিলেন। ১৯৩০ সালের 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগে'র সম্মেলনেই তিনি মুসলিমদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্রের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন।

এই সময় আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের ধারাকে দেখতে পাওয়া যায়। প্রধানত তামিলনাড়ু এবং মহারাষ্ট্রেই এই ধারাটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল। এটি হল ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের ধারা। এই ধারা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সবার আগে যাঁর নাম আসে তিনি হলেন মহারাষ্ট্রের জ্যোতিবা ফুলে। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে তিনি জন্মেছিলেন।

অন্যান্য হিন্দু ধর্মীয় সংস্কারকদের বিপরীতে দাঁড়িয়ে তিনিই প্রথম বেদ ও বেদ-পরবর্তী আর্যসভ্যতার বিরোধিতা করেছিলেন। মূলত যুক্তিবাদের উপর নির্ভর করে তিনি জাতিভেদ প্রথা দূর করে প্রকৃত অর্থেই শূদ্র জাগরণে ব্রতী হয়েছিলেন। ১৮৭৩ সালে তিনি 'সত্যসাধক সমাজ' প্রতিষ্ঠা করে নিম্নবর্ণের জনগণ, বিশেষত কৃষকদের জাগরণের কাজ শুরু করেন। জাতিভেদ বিরোধী তথা ব্রাহ্মণ্যবিরোধী আন্দোলনের প্রসঙ্গ এলে জ্যোতিবা ফুলের সাথেই যাঁর নামটি উচ্চারিত হয়, তিনি হলেন রামস্বামী নাইয়ার। যিনি 'পেরিয়ার' নামেই বেশি জনপ্রিয় ছিলেন। ১৯২৫ সালে পেরিয়ার কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসেন এবং গড়ে তোলেন আত্মমর্যাদা (self-respect) আন্দোলন। নাম থেকেই এই আন্দোলনের সম্পর্কে অনুমান করা যায়। বাস্তবত এই আন্দোলন অস্পৃশ্যতা এবং জাতিভেদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন সংগঠিত করে, যা দলিত ও নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে একটা শক্তিশালী স্ব-মর্যাদা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা দরকার, তথাকথিত যুক্তিবাদী ধারাই বলা হোক আর পুনরুত্থানবাদী ধারাই বলা হোক, এই দু'ধরনের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনগুলো যখন মূলত শহুরে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে, তখনও কিন্তু এই দেশের গ্রামীণ জীবনের দিকে তাকালে দেখে যাবে, একের পর এক কৃষক বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসকের বুকে কম্পন ধরিয়ে দিচ্ছে, অথচ মজার ব্যাপার হল এই কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে কোনো ধরনের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের কোনো আত্মিক যোগ লক্ষ করা তো যাবেই না, উল্টে রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্রদের মতো অনেককেই দেখা যাবে, যাঁরা ছিলেন সরাসরি জমিদারতন্ত্রের সমর্থক! শ্রেণীস্বার্থের কারণে কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধেই ছিল তাঁদের অবস্থান। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ্যবাদবিরোধী আন্দোলনগুলোতে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁরা ব্যাপক কৃষক জনসাধারণকে সংগঠিত করছেন। যদিও সেই সময় যত বড়ো বড়ো কৃষক বিদ্রোহগুলো এদেশে ঘটেছে, তার অধিকাংশই ঘটেছে বাংলা, বিহার, অসম, ত্রিপুরার মতো পূর্ব ভারত ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায়। ফলত দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের সাথে তাঁদের প্রত্যক্ষ সংযোগ হয়তো ঘটেনি, কিন্তু দক্ষিণ ভারতের এইসব ব্রাহ্মণ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের নেতারা নিজেরাই সরাসরি কৃষক ও মেহনতি মানুষদের সংগঠিত করেছিল।

আর্য বিতর্ক নিয়ে আরো কিছু কথা

আর্যদের আগমন এবং তাদের সামাজিক জীবন সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী বিশ্লেষণটা আগেই সংক্ষিপ্ত আকারে রাখা হয়েছে। কিন্তু আর্য-বিতর্ক নিয়ে একটা সামগ্রিক চিত্র না দিলে হিন্দুত্বের উৎসে পৌঁছানো মুশকিল হবে। তাই এই বিতর্কের আরো কিছু দিক, বিশেষত হিন্দুত্ববাদীরা যেখান থেকে রসদ সংগ্রহ করে থাকেন, সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা যাক।

১৫৮৩ সালে ইটালিয় পর্যটক ফিলিপ্পো সসেটি গোয়ায় এসে প্রথম লক্ষ করেন যে, ল্যাটিন এবং সংস্কৃত ভাষার মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে। তিনি স্রেফ এই সাদৃশ্যের কথাই লিখেছিলেন। পরবর্তীতে জেমস পার্সনস্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে একটা আদি মাতৃভাষা ছিল। ১৭৮৬ সালে উইলিয়াম জোনস্ অ্যানুয়াল কনফারেন্সের ভাষণে প্রথম বললেন, সংস্কৃত, গ্রিক, ল্যাটিন, ও আরো কিছু ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে মিল আছে। বস্তুত তাঁর এই ভাষণ থেকেই প্রথম কম্পারেটিভ লিঙ্গুইস্টিক তথা তুলনামূলক ভাষাচর্চার সূত্রপাত। ১৮১৩ সালে টমাস ইয়ং এই

ভাষাটা কে 'ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষা' (জার্মান ভাষায় শব্দটা হল 'Stramma Prache') বলে উল্লেখ করলেন। ১৮২৩ সালে জুলিয়াস ক্ল্যাপ্‌রথ প্রথম এই ভ্রান্ত আর্য জাতি (race)-র ধারণাটিকে সামনে আনছেন। তিনি বলছেন, এই ভাষাগোষ্ঠীকে বলা উচিত ইন্দো-জার্মানি। কারণ, এটার সঙ্গে আদি জার্মানের মিল আছে। জার্মান আধিপত্যবাদকে আরো কিছুদূর অগ্রসর করার লক্ষ্যে বার্নথ্ এবং ল্যাসেন বললেন যে, যে মানব গোষ্ঠী এই ইন্দো-জার্মান ভাষায় কথা বলেন, তাঁরা নর্ডিক রেসের (আজকে যাঁরা ইউরোপের শ্বেতকায়) অন্তর্ভুক্ত। মোটামুটি নর্ডিকদের চেহারারও একটা বর্ণনা দেওয়া হল। তাঁরা উঁচু লম্বা, টিকালো নাসিক, পিঙ্গল বর্ণের চুল, দুধেআলতা গায়ের রঙ ইত্যাদি। ১৮৪৭ সালে ম্যাক্সমুলারই প্রথম ভাষার সাথে যুক্ত করে 'আর্য' শব্দটা ব্যবহার করলেন। তিনি বললেন, এই আদি ভাষাটা হল আর্যভাষা। যদিও আর্যজাতির কথা তিনি সরাসরি বলেননি। ল্যাসেন তাঁর জার্মান আধিপত্যকে যুক্তিগ্রাহ্য করতে গিয়ে গল্পের গরুকে আরো গাছে চড়ালেন। তিনি বললেন, আর্যরা এমন এক জাতি, যারা সবচেয়ে বেশি সংগঠিত এবং উদ্যোগী। আর্যজাতির যে আদিপুরুষরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে মানবজাতির সমস্ত গুণাবলীগুলিই লক্ষ করা যায়। ভারতের উচ্চবর্ণজাতরা যেহেতু আর্য বংশোদ্ভূত, অতএব তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত করা হবে। ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর মানুষরা ইউরোপ থেকে ভারতে এসেছেন এবং এঁরাই ভারতকে সভ্য-ভদ্র করে তুলেছেন। ১৮৫৮ সালে জন উইলিয়ন্‌স বলছেন, বহুদিন আগে আর্যরা ভারতে এসেছিল। তারা দস্যুদের ধ্বংস করেছিল। (পাঠক লক্ষ রাখুন, এই 'দস্যু' কথাটার ব্যবহার!) বর্তমানে সেই আর্যজাতির আরেকটি শাখা (পড়ুন, ইংরেজ) ভারতে এসেছে দস্যুদের উপর আধিপত্য করতে। ব্রিটিশ শাসনের যথার্থতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে কী চমৎকার ব্যাখ্যা! মোটের উপর, এই হচ্ছে ব্রিটিশ, জার্মানসহ ইউরোপিয়ান পণ্ডিতদের একাংশের মনগড়া ব্যাখ্যা।

যাই হোক, আর্য প্রশ্নে আরো নানা বিতর্ক আছে। আগেই যেমন বলেছি, আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মনে করতেন, আর্যরা এসেছিল তিব্বত থেকে। বাল গঙ্গাধর তিলক আবার গণনা করে দাবি করেন যে, আর্যদের পূর্বপুরুষদের আদিনিবাস ছিল উত্তর মেরু। আর্যদের আদি নিবাস সংক্রান্ত আরো এক নতুন 'তত্ত্ব' হাজির করেছিলেন 'থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা মাদাম ব্লাভাৎস্কি এবং কর্নেল অলকট। তাঁরা বললেন যে, আর্যগণ হল আধুনিক হিন্দুদের পূর্বপুরুষ। তারা ভারতেরই বাসিন্দা এবং তারাই ইউরোপীয় সভ্যতার জনক। সমকালীন সময়েই অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের একেবারে শেষ লগ্নে এসে নারায়ণ পাগবী দাবি করলেন ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে আর্যাবর্তই হল সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তিস্থল এবং সংস্কৃতই হল সমস্ত আর্যভাষার মাতৃভাষা। এইভাবে ধীরে ধীরে আর্য-শ্রেষ্ঠত্বের গল্পটা পল্লবিত হতে লাগল।

পাঠকদের সুবিধার্থে শুধু মনে করিয়ে দেওয়া ভালো, এঁরা যখন আর্য-শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে গলা ফাটাচ্ছেন লক্ষ করুন, তখনও কিন্তু হরপ্পা, মহেঞ্জোদারোর সভ্যতা তথা সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কৃতই হয়নি। গোল বাঁধল তা আবিষ্কার হওয়ার পরই। যাই হোক, এই আর্যাবর্তই আর্যদের উৎপত্তিস্থল বর্তমানে এই ভ্রান্ত তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব নিয়েছেন সংঘ পরিবার ঘনিষ্ঠ ঐতিহাসিকরা। ১৯৯১ সালে ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত একটি আর্য বিষয়ক সেমিনারে ডি এস ত্রিবেদী, গঙ্গানাথ ঝা'র মতো ইতিহাসবিদরা আবার এই তত্ত্বকে সামনে আনেন। এঁদের যুক্তি হল, ঋগ্বেদে নাকি আর্যদের স্থানান্তরের কোনো উল্লেখ নেই। এই দাবির মধ্যে যদিও একবর্ণও সত্যি নেই। কেননা,

ঋগ্বেদের বহু জায়গায় আর্য-অনার্যদের সংঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার প্রত্নতত্ত্বও এই নিদর্শনের পক্ষেই ইঙ্গিত করছে। কোশাম্বি এই বিতর্ক শুরুর অনেকদিন আগেই ঋগ্বেদে আগ্রাসী শক্তির পরিচয়ের কথা উল্লেখ করে গেছেন। ডি এস ত্রিবেদী এবং গঙ্গানাথ ঝা-রা আরো দাবি করে বসেন যে, হরপ্পা সভ্যতা নাকি আর্য সভ্যতারই অঙ্গ! তাঁদের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মোদ্দা যা বলেছেন তা হল, যেভাবে সেমিনারটি সংগঠিত করা হয়েছিল এবং তাতে পেপার পাঠ করা হয়েছিল তা থেকে মৌলবাদী চিন্তার প্রতিফলন স্পষ্ট। কেননা, যদি প্রমাণ করা যায় যে আর্য সভ্যতা আর বৈদিক সভ্যতা একই, তাহলে এটা প্রমাণ হবে যে মুসলমানরাই এদেশে প্রথম বহিরাগত এবং আর্যরা এদেশের ভূমিপুত্র।

সরস্বতী নদী নিয়েও হিন্দুত্ববাদী ইতিহাসবিদদের অদ্ভুত সব ব্যাখ্যা আছে। যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসবিদ আর্যদের আদি বাসস্থান ভারতবর্ষ বলে মনে করেন, তাঁরা বলেন সরস্বতী সভ্যতার বিকাশ বৈদিক সভ্যতার অন্যতম প্রকাশ। শুধু তাই নয়, তাঁরা বলেন হরপ্পা সভ্যতা, সিন্ধু এবং সরস্বতী এই দুটো নদীর কাছেই ঋণী, কিন্তু সিন্ধুর চেয়ে সরস্বতী নদী বা তার শাখা নদীর গুরুত্বই এক্ষেত্রে অধিক। তাদের দাবি, সরস্বতী এবং তার শাখা নদীর ধারে কাছে প্রায় ৭০০ সভ্যতার হদিশ পাওয়া যাচ্ছে। সিন্ধু ও তার আশেপাশে একশোরও কম সভ্যতার হদিশ পাওয়া যাচ্ছে। ইতিহাসবিদ রামশরণ শর্মার দাবি সরস্বতী নদীকে কেউ কেউ আরো দু'টো নদীর সঙ্গে এক করে দেখান। সেগুলো হল ঘগগ্‌র (Ghaggar) এবং হাক্‌রা (Hakra)। পঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থানে নাম ঘগগ্‌র এবং অধুনা পাকিস্তানে এর নাম হাক্‌রা। শ্রী শর্মার মতে, হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, ধলাভিরা (Dholavira)-র মতো বড়ো বড়ো যে সভ্যতাগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে, সবই এই দুই নদীর আশেপাশে। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে, এই দুটি নদী যে সরস্বতী নদীই তার কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন, এই দুটি নদী হল সিন্ধু নদীর দুটি শাখানদী। বস্তুত সরস্বতী নামক নদীটির উল্লেখ বেদের একাধিক জায়গায় স্থানকালভেদে থাকলেও সেগুলোর কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। শর্মার মতো ইতিহাসবিদদের মতে, সাম্প্রদায়িক চিন্তার জায়গা থেকে যেহেতু সিন্ধু পাকিস্তানের অন্তর্গত, তাই দেশ বিভাজনের সাথে সাথে তার গুরুত্বকে খাটো করার মানসিকতার কারণে সরস্বতীর গুরুত্বকে বাড়িয়ে দেখানোর এই মানসিকতা। বস্তুত ঋগ্বেদে অনেকগুলো সরস্বতী নদীর উল্লেখ আছে। সেগুলো যেসব আদি সরস্বতীর অন্তর্গত তার কোনো প্রমাণ প্রথমত নেই, দ্বিতীয়ত ঘগগ্‌র বা হাক্‌রার সঙ্গে তাকে মেলানোও যাবে না। কথিত সরস্বতী নদীর আবার নানা জায়গায় নানা নাম। যেমন, এই আদি নদীর নাম ছিল হেলমন্ড (Helmond)। ইরানের 'জেন্দ আবেস্তা' গ্রন্থে এর নাম হিসেবে পাওয়া যায় হরকবইতি (Harkhwati)-র কথা। আসলে আর্যরা যে কোনো জাতি ছিল না, ছিল একটা যাযাবর ভাষাগোষ্ঠী এবং প্রথম অবস্থায় তাদের কোনো লিপিও ছিল না, তাই স্থানভেদে আমরা দেখব নদীদের এই নাম পরিবর্তন।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই পরিষ্কার করা গেছে তা হল, হিন্দু পুনরুত্থানবাদী এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আর্য-সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার সাথে হিন্দুত্ববাদীদের চিন্তাভাবনার কিছু মৌলিক সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন, প্রথমত উভয়ই বলছে আর্যরাই হল সবচেয়ে প্রাচীন এবং সবচেয়ে সুসভ্য 'জাতি'। এইভাবে উভয়েই 'আর্যজাতি' তত্ত্বের আমদানি করেছে। দ্বিতীয়ত, তাঁরা বলছেন, বেদ হল সবচেয়ে উন্নত জ্ঞানের আধার। সুকুমারী ভট্টাচার্যের মতো

বেদের বস্তুবাদী ভাষ্যকার বলছেন, 'বৈদেশিক শাসনের ফলে ভারতীয়দের মনে জাতীয় অসম্মানের ক্ষতিপূরণের প্রবণতা থেকে একধরনের মিথ্যা উন্নাসিকতার জন্ম হয়েছিল। বৈদিক সাহিত্য চর্চায়ও তার অনিবার্য প্রভাব ছিল। অন্যদিকে পরাধীন জীবনের অনগ্রসরতার ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির ক্ষতিপূরণের জন্য আধুনিকীকরণ ও প্রগতির বিপরীত মেরুতে বৈদিক সাহিত্যের কল্পিত গৌরবকে উপস্থাপিত করা হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বৈদিক সাহিত্যের বিষয়ে আলোচনা তখন নতুন করে আমাদের দেশে শুরু হল যখন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। তখনকার বৈষয়িক জীবনের হীনতা ও অভাববোধকে চাপা দেওয়ার জন্য দেশপ্রেমিক চিন্তানায়করা বৈদিক সাহিত্যের তথাকথিত তুরীয় আধ্যাত্মিকতার মধ্যে আশ্রয় নিলেন। আমাদের সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের মধ্যে যা কিছু যথার্থ গৌরবের দিক ছিল, তার স্বাস্থ্যকর আলোচনার সম্ভাবনা এতে বিশেষভাবে ব্যাহত হল। পরিবর্তে দেখা গেল রুগ্ন এক গর্ববোধ, অর্থহীন উন্নাসিক আত্মতুষ্টি, দৃষ্টিভঙ্গির চূড়ান্ত বিভ্রান্তি এবং গবেষণার নামে অবৈজ্ঞানিক কাল্পনিকতার প্রসার...।' বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে স্বামী বিবেকানন্দ অবধি প্রত্যেকেই প্রকারান্তরে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি তত্ত্বই নাকি বেদে অনেক আগে বলা হয়েছে, এমন এক অবৈজ্ঞানিক দাবি বারবারই করে এসেছেন। এই বেদ সম্পর্কে আদিখ্যেতা দেখে প্রথিতযশা বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা তো আক্ষেপ করে লিখেই ফেললেন তাঁর সেই বিখ্যাত প্রবন্ধ 'সবই ব্যাদে আছে!'। সেখানে পরিষ্কার তিনি লিখলেন, 'বলা বাহুল্য যে বিগত কুড়ি বৎসরে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ইত্যাদি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থ এবং হিন্দু জ্যোতিষ ও অপরাপর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আমি কোথাও আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই নাই যে, এই সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে বর্তমান বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব নিহিত আছে।' তৃতীয়ত, তাঁরা আর্যজাতি তত্ত্ব থেকে মোটামুটি এই সূত্রে উপনীত হচ্ছেন যে আর্যরা হল নর্ডিক জাতিভুক্ত, অর্থাৎ ইউরোপের শ্বেতকায় এবং এদেশের বর্ণহিন্দুরা একই জাতিভুক্ত। আর এই চিন্তার জায়গা থেকেই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের থেকেও এদেশের 'প্রকৃত বিদেশি' মুসলমানরা এবং তাঁদের বিতারণ করাই মুখ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে, যা শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ফাটল ধরিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনকে দুর্বল করেছে বারবার। হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের নানা বক্তব্য থেকে তা আমাদের কাছে আরো পরিষ্কার হবে। হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের এক অন্যতম হোতা বঙ্কিমচন্দ্র যেমন 'আনন্দমঠ'-এ লিখছেন, 'ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হবে বলিয়াই সন্তান-বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে।' আবার সরাসরি এমন কিছু না বললেও বিবেকানন্দ বাংলার তরুণ দলকে বলেছেন, 'বঙ্কিমের রচনা বারংবার পাঠ কর। তাঁহার দেশভক্তি এবং সনাতন ধর্মকে অনুসরণ কর।'

প্রকৃতপক্ষে আজকের হিন্দুত্ববাদীদের সঙ্গে সেকালের হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের পার্থক্য শুধু এক জায়গাতেই — ম্যাক্সমুলারের অনুগামী বা তিলক, দয়ানন্দের মতো পুনরুত্থানবাদীরা অন্তত এটুকু মানছেন যে আর্যরা ছিলেন বহিরাগত (কোথা থেকে তারা এসেছিল তা নিয়ে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও) আর থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি থেকে শুরু করে নারায়ণ পাগবী হয়ে, আজকের ডি এস ত্রিবেদী এবং গঙ্গানাথ ঝা-রা মনে করেন, আর্যদের আদি বাসস্থান এদেশেই ছিল। আর বিবেকানন্দকে দেখব এপ্রশ্নে দুই তত্ত্বের মাঝে দোলায়মান। একটু ভালো করে লক্ষ করলেই বোঝা যাবে, এই 'আর্যতত্ত্ব' মূলগতভাবে একই। একদিকে তা হিন্দুধর্মকে ব্রাহ্মণ্যবাদের সমার্থক করে তুলতে চাইছে, পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকে ধ্বংস করার তাত্ত্বিক যুক্তি নির্মাণ

করছে। যদিও কোনো সমাজের প্রগতিশীল মানুষই তাদের এই বিভেদকামী তত্ত্বকে মুখ বুজে মেনে নেয়নি। এমনকি রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মহেঞ্জোদারো সভ্যতা আবিষ্কারের ঘটনার আগে থেকেই একদল পণ্ডিত বলে এসেছিলেন, আর্যসভ্যতার চেয়েও প্রাচীন সভ্যতা এদেশে অবশ্যই ছিল। শেষ অবধি হরপ্পা, মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কার 'আর্য-শ্রেষ্ঠত্বের' তত্ত্বের কফিনে শেষ পেরেকটা পুঁতে দেয়। যদিও ব্রাহ্মণ্যবাদীরা যেমনটা করে থাকেন, এক্ষেত্রেও তাঁর ব্যতিক্রম ঘটেনি। একসময়ের 'নাস্তিক' গৌতম বুদ্ধকে যেভাবে হিন্দু দেবতাদের 'অবতারে' রূপান্তরিত করার চেষ্টা হয়েছে, আজ সেভাবেই আবার সিন্ধু সভ্যতাকেও 'আর্যসভ্যতা' বলে চালানোর অপচেষ্টা শুরু হয়েছে।

'আর্য-শ্রেষ্ঠত্বে'র দাবিদারদের সমালোচনা করে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এবং মেঘনাদ সাহার দু'টি উক্তি দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখছেন, "আমাদের দেশের একটা বিশিষ্ট মত যা শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত অধিকাংশ লোককে অভিভূত ক'রে আছে, সেটার নাম দেওয়া হয়েছে 'আর্য্যামি', এই জিনিসটি অতি হালের, গত শতাব্দীর (উনিশ শতকের) ভাষাতত্ত্ব আর প্রত্নতত্ত্ব আলোচনায় এর উদ্ভব, রাজার জাতের সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব কল্পনার পুলকে, পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে সাকুল্য লাভের আশায় এর প্রসার।" সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আরো বলেছেন, 'আমাদের হিন্দু সভ্যতাটা যে একটা মিশ্র ব্যাপার, তা সর্ববাদিসম্মত। নামের মোহে প'ড়ে হিন্দু সভ্যতা গড়তে অনার্যের সাহায্যকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করলে চলবে না।' এপ্রসঙ্গে মেঘনাদ সাহার একটা মন্তব্যও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলছেন, "...বিগত ১৯২৩ খৃঃ অব্দে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পাঞ্জাবের হরপ্পা ও সিন্ধুদেশের মহেঞ্জদারোতে দুইটি অতি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন – যাহার ফলে ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও মোটামুটি ভারতীয় সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছে। সমস্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও অধিকাংশ দেশী পণ্ডিতের মতে (যেমন রামপ্রসাদ চন্দ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিরজাশঙ্কর গুহ) এই সভ্যতা প্রাগ্বৈদিক ও প্রাক্-আর্য। এই দুইটি নগরী আনুমানিক ৩৫০০ খৃঃপূঃ অব্দ হইতে ২৫০০ খৃঃপূঃ অব্দ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। এই দুই নগরীর ধ্বংসাবশেষে বৈদিককালীন সভ্যতা বা অসভ্যতার কোনো নিদর্শনই পাওয়া যায় না। সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ববিভাগ আবিষ্কার করিয়াছেন যে এই সিন্ধুবাহিত সভ্যতা দক্ষিণে গুজরাট ও পূর্বে গঙ্গাযমুনার অববাহিকার উত্তরাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং এই সভ্যতা তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুমেরীয় ও মিশরীয় সভ্যতার মত উন্নতস্তরের ছিল। বর্তমানে পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে হিন্দুর ধর্ম ও দর্শনের অধিকাংশ উপাদানই উক্ত প্রাগ্বৈদিক, প্রাক্-আর্য সভ্যতা হইতে গৃহীত – যেমন শিব-পশুপতির পূজা, ধ্যান, যোগ, ফুলনৈবেদ্য দিয়া পূজা-পদ্ধতি এবং সম্ভবতঃ পশু, সর্প ও বৃক্ষদেবতার পূজা।'

কাজেই হিন্দুর সমস্তই 'ব্যাদে' আছে একথা প্রস্তরীভূত (fossilized) পণ্ডিতাভিমানী ব্যতীত এই যুগে কেহ বলিতে সাহসী হইবেন না।"

চতুর্থ অধ্যায়

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূত্রপাত

ব্রিটিশ আসার আগে অবধি এদেশের ইতিহাস হল মোটের উপর বহু ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এবং ধর্মীয় সমন্বয় প্রক্রিয়ার অগ্রগতির ইতিহাস। যদিও সংঘাত একেবারে ছিল না, তা নয়। আমরা আগেই দেখেছি অতীতে আর্য এবং অনার্যদের মধ্যে সংঘাত ঘটেছে। শৈব এবং বৌদ্ধদের মধ্যে সংঘাতের ঘটনা এবং হিন্দু রাজা কর্তৃক বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংসের ঘটনা বা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনারও ইতিহাসে নজির আছে। নজির আছে বর্ণহিন্দু এবং নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যেকার সংঘাতেরও। হিন্দু-মুসলমান সংঘাতও ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে কিছু ঘটেছিল, যেমন ঘটেছিল শিয়া-সুন্নি, বা মুঘল-পাঠানের মধ্যেকার যুদ্ধের ঘটনা। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, মূলগতভাবে এগুলি ছিল কখনো রাজায় রাজায় বা ক্ষমতাবানদের সাথে ক্ষমতাবানদের যুদ্ধের, কখনো বা সামাজিক শ্রেণীদ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত সংঘাতেরই, নানা প্রকাশ। সাধারণ জনজীবনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা সংঘাতের নজির খুব ছিল না। মূলত রাজায় রাজায় যুদ্ধগুলির পিছনে ছিল রাজ্য দখল এবং রাজত্ব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা। এইসব সংঘাতে হিন্দু রাজাদের অধীনে মুসলমান সেনাও যেমন নিয়োজিত ছিলেন এবং রাজ আনুগত্য দেখিয়েছিলেন, তেমনি মুসলমান রাজাদেরও ছিল বহু হিন্দু সেনাপতি। তাঁরাও রাজ আনুগত্য দেখাতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, আকবরের মান সিংহ, অওরঙ্গজেবের যশবন্ত সিংহ, জয় সিংহের মতো সেনাধ্যক্ষরা ছিলেন, বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁ-র ছিলেন জগৎশেঠ, রামজীবনের মতো অমাত্যরা। আবার শিবাজীর একজন মুসলিম নৌ-সেনাধ্যক্ষ ছিলেন, বারো ভুঁইয়ার মধ্যে সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি ছিলেন একজন মুসলমান, মহারাজ সীতারাম রায়ের সেনাপতি ছিলেন বক্তিয়ার খাঁ।

বস্তুতপক্ষে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আমদানি করেছিল ব্রিটিশরা। এর পিছনে ছিল তাদের 'ডিভাইড্ অ্যান্ড রুল' তথা 'ভাগ কর, শাসন কর' এই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ। ব্রিটিশরা সাম্রাজ্যবাদী শাসনের স্বার্থে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষের বীজটি বপন করেছিল। বিশেষত, ১৮৫৮ সালের মহাবিদ্রোহের পর থেকেই তাদের এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ১৮৭৫ সালে ডব্লু ডব্লু হান্টার 'দ্য ইন্ডিয়ান মোসলমান' নামে একটি বই লেখেন, যা ছিল ব্রিটিশের পক্ষ থেকে এদেশে 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' আমদানির প্রথম পদক্ষেপ। এছাড়াও হিন্দু-মুসলমান বিভেদ এবং আধুনিক সাম্প্রদায়িকতার প্রচার শুরু করেছিলেন অষ্টাদশ শতকে দুই ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জেমস মিল এবং ইলিয়ট। তাঁরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে এদেশে এসেছিলেন। ব্রিটিশ আসার আগে এদেশে দুই সম্প্রদায়ের দাঙ্গার নজির প্রায় ছিল না বললেই চলে। ঘটনা হল এটাই যে, কুপল্যান্ডের মতো সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষের পণ্ডিতও তাঁর 'ভারতে মুসলিম সমস্যা' বইটিতে দেখিয়েছেন ১৮৮৫-র আগে এদেশে মাত্র দু'টো হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার ঘটনার নজির আছে, যেখানে ১৮৮৫-পরবর্তী সময়ে, পর পর ঘটে গেছে একের পর এক দাঙ্গার ঘটনা। তার আগে অবধি যে সম্প্রীতির দিকটাই প্রধান ছিল — সাহিত্যে, শিল্পকর্মে, স্থাপত্যে তার বহু নিদর্শন পাওয়া যাবে।

আগেই আমরা দেখিয়েছি, সাম্রাজ্যবাদের বেতনভুক বিভিন্ন ঐতিহাসিক কীভাবে 'আর্য-শ্রেষ্ঠত্বের' ধুয়ো তুলে তাদের শাসনকে বৈধ করার তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি করেছিলেন। তাঁরা দেখাতে চেয়েছিলেন, আর্যরা হচ্ছে নর্ডিক জাতির (race) এবং এদেশের উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরাও একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। পাশাপাশি তাঁরা এটাও দেখাতে চেয়েছিলেন যে, মুসলিমরাই হচ্ছে প্রথম এবং প্রকৃত বহিরাগত। তারা আরো দেখাতে চেয়েছিলেন, ইতিহাসের মধ্যযুগ অর্থাৎ যে সময়টা এই দেশের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মূলত মুসলিম শাসকরা শাসন করতেন, তা ছিল একটা 'অন্ধকারাচ্ছন্ন' যুগ। 'প্রবল স্বৈরাচারী শাসনের' এই যুগে হিন্দুদের 'রক্ষা' করতেই তাঁদের জ্ঞাতিভাই ব্রিটিশরা এদেশে এসেছে এবং তাদের লক্ষ্য হল এই দেশটাকে 'সভ্য-ভদ্র' করা এবং হিন্দু এবং মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেকার সাম্প্রদায়িক সংঘাতকে প্রশমিত করতে 'তৃতীয় পক্ষ' হিসেবে কাজ করা। এপ্রসঙ্গে ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র বলেছেন, "...ইংরেজ ঐতিহাসিক, প্রশাসক, ও লেখকরা যে ব্যাখ্যা ও সাধারনীকরণগুলি রেখে গিয়েছিলেন সেগুলি অনেক সময়ই, উভয় সাম্প্রদায়িকতাবাদী ব্যাখ্যা ও সাধারণীকরণের ভিত্তি হত। ঐ ঐতিহাসিক প্রমুখও সব সময়ে নিরীহ ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁরা অনেকে, অনেক সময়েই, ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা ব্যতীত অন্য চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। প্রথমত তাঁরা দেখাতে চেয়েছিলেন যে ভারতীয় জনগণকে চিরকাল নিষ্ঠুর প্রজাপীড়নকারী শাসনকর্তা ও অনিয়ন্ত্রিত স্বৈরাচারীরা শাসন করেছে। সুতরাং ব্রিটিশ শাসন যদি স্বৈরতান্ত্রিক বা স্বেচ্ছাচারী হয় তবে তাতে অন্যায় কিছু নেই; বরং তা প্রজাহিতৈষী, ন্যায়-পরায়ণ এবং আইনের শাসনের মাধ্যমে তা পরিচালিত হয়। তদুপরি মুসলিমরাও ব্রিটিশদেরই মতো বিদেশী ছিল; সুতরাং ব্রিটিশরা ভারতে বিদেশী শাসনের সূত্রপাত করেনি, বরং একটি বর্বর ও অমানবিক বিদেশী শাসনের পরিবর্তে একটি মানবিক ও সুসভ্য বিদেশী শাসন এনেছে। দ্বিতীয়ত, তাঁরা দেখাতে চেয়েছিলেন যে হিন্দুরা অত্যন্ত নৃশংস ও ভয়াবহভাবে মুসলমানদের দ্বারা শোষিত, পদদলিত ও অত্যাচারিত হয়েছিল। ইংরেজ কার্যত তাদের 'মুক্ত' করেছিল। যেহেতু হিন্দুরা ব্রিটিশ শাসনে অনেক সুখে আছে, তাই তাদের ব্রিটিশদের প্রতি ঋণগ্রস্ত বোধ করা উচিত এবং ব্রিটিশদের পূর্ণ সমর্থন করা উচিত। তৃতীয়ত, তাঁরা দৃঢ়ভাবে দাবী করেছিলেন যে হিন্দু ও মুসলমানরা চিরকাল বিভক্ত ছিল এবং পরস্পরের রক্তের জন্য উৎসুক ছিল, তাই একটি তৃতীয় পক্ষ, অর্থাৎ ব্রিটিশ পক্ষ, না থাকলে তারা পরস্পর শান্তিতে বাস করতে পারত না।"

আসলে শুধু ব্রিটিশরাই নয়, হিন্দু পুনরুত্থানবাদী পণ্ডিতদেরও অনেকে এই সব কথায় বিশ্বাস করতেন। কেশবচন্দ্র সেন যেমন ইংরেজ আগমনের মধ্যে 'দুই বিচ্ছিন্ন ভ্রাতার মিলন'-কে খুঁজে পেয়েছিলেন আগেই বলেছি, তেমনই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আবার দেখব 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে সত্যানন্দকে মহাপুরুষের মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন – 'শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্র রাজা।' কিংবা বিদ্রোহীদের নেতা সত্যানন্দ যখন ব্রিটিশ শাসনের আগমনে উৎকণ্ঠিত, বঙ্কিমচন্দ্র তখন চিকিৎসকের মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন – 'সত্যানন্দ কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখনও পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশ উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর ফল যাহা হইবে ভালই হইবে, ইংরেজ না হইলে সনাতন-ধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।' ইংরেজ শাসনের প্রশস্তি করে বঙ্কিমচন্দ্র আরো

বলেছেন – 'ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব।' কেশবচন্দ্রের 'বিচ্ছিন্ন ভ্রাতাদের মিলন' বঙ্কিমের কাছে যেন – 'কে কাহার হাত ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে, ধর্ম আসিয়া কর্মকে ধরিয়াছে।' ব্রিটিশরাও এমনটাই দাবি করত, তাঁরা এসে এদেশকে 'সুসভ্য' করে তুলছে। 'মধ্যযুগীয় পশ্চাদপদতা', যা ছিল মুসলিম 'বহিরাগত' শাসকদের অবদান তা থেকে এই দেশকে তারা 'পুনরুদ্ধার' করেছে। এক কথায়, মুসলমান শাসকদের হাত থেকে হিন্দুদের 'রক্ষা' করেছে। এই বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্রিটিশরা সবথেকে বেশি যা করেছিল, তা হল ইতিহাসের বিকৃতি, আর একাজে তাদের দোসর ছিল কিছু হিন্দু সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন শক্তি। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বিবেকানন্দ প্রত্যেকেই ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়ে মুসলমানদেরই 'প্রথম বহিরাগত আক্রমণকারী' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। বিবেকানন্দ যেমন ব্রিটিশবিরোধী বহু কথা বলার পরও বিপ্লবী যুবকদের বঙ্কিমচন্দ্র পড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'-এর অন্যতম নেতা হেমচন্দ্র ঘোষ বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি তাঁকে বলেছিলেন, 'বঙ্কিমচন্দ্রের বই পড়বি, বার বার পড়বি। তাঁর দেশভক্তি ও সনাতন ধর্মের অনুশীলন কর।' পরে হেমচন্দ্র, ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে চিঠিতে একথা জানান। বঙ্কিমের 'দেশভক্তি'-র উল্লেখ তো আমরা তাঁর 'আনন্দমঠ' থেকে পেয়েই গেলাম, তার সাথে বিবেকানন্দ বিশেষভাবে জুড়ে দিলেন 'সনাতন ধর্মে'র লেজুড়। এঁদের এই মনোভাব নিয়ে বিশিষ্ট কবি সমর সেনের 'বাবু বৃত্তান্ত' নামক এক অসাধারণ কবিতা রয়েছে – 'ঘৃণ্য শূদ্র যত শতহস্ত দূরে রেখে / গৌরবে পড়েছি গীতা শ্রীমদ্ভাগবত, / দুর্দান্ত যবনকালে ধরেছি উপনিষদ। / ভাগ্যক্রমে ইংরাজ এলো; স্বাগতম! / পড়েছে মুসলমান, বন্দেমাতরম / ধ্বনি ওঠে ঘটিরাম ডিপুটির ঘরে, / যবন দুর্যোগশেষে, আহা মরি, শ্বেতাঙ্গ সকাল!'

সেদিন দেশপ্রেমে হিন্দুত্বের চোলাই ঢুকিয়ে এই হিন্দু পুনরুত্থানবাদীরা এদেশের সাম্রাজ্যবাদী আন্দোলনকে বিভক্ত করে কার্যত তাকে দুর্বলই করেছিলেন। একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, সেদিন তাঁরা যা বলতেন, তার সাথে সাভারকর, হেডগেওয়ার, গোলওয়ালকরদের বক্তব্যের অন্তর্বস্তুতে কোনো ফারাক নেই। এটাই বাস্তব সত্য। এই সত্যকে আজ মানার সময় এসেছে।

সত্যিই কি ইংরেজ শাসন মঙ্গলজনক একটা ব্যবস্থা ছিল? সত্যিই কি ইংরেজ আমলে হিন্দুরা মুসলিম আমলের চেয়ে ভালো ছিল? সত্যি কি মধ্যযুগে এদেশের সভ্যতার প্রভূত অবনমন ঘটেছিল? সত্যি কি এদেশে ব্রিটিশ আসার আগে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের এতটাই অবনতি ঘটেছিল, অথবা বলা ভালো, পরিস্থিতি এতটাই উদ্বেগজনক হয়ে পড়েছিল যে এদেশে ব্রিটিশের মতো একটা 'তৃতীয় পক্ষের' দরকার জরুরি ছিল? যেমনটা ব্রিটিশরা দাবি করত! এব্যাপারে খুব সুন্দর আলোকপাত করা হয়েছে সখারাম গনেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' নামক ব্রিটিশ জমানায় নিষিদ্ধ হওয়া বইটিতে। সখারাম গনেশ দেউস্কর আঠারো শতকের একজন প্রগতিশীল এবং উদারমনস্ক সাংবাদিক। প্রথমে 'হিতবাদী' পত্রিকায় সহ-সম্পাদক এবং পরে অল্প কিছুদিনের জন্য সম্পাদকের পদে তিনি কাজ করেছিলেন। তিনি একজন সাংবাদিক হিসেবে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কিত সত্যান্বেষণে ব্রতী হয়ে বইটি লিখেছিলেন। তাঁর লেখা এই বইটি এক সময় স্বাধীনতার ব্রতী যুবসমাজের কাছে এক প্রেরণার কাজ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই বইটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'আমাদের জাতির মধ্যে যে নিত্য পদার্থটি, যে প্রাণ পদার্থটি আছে, তাহাকেই

সর্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে – আমাদের চিত্তকে, প্রতিভাকে মুক্ত করিতে হইবে, আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয়, স্বদেশের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা চাই – যাহা শিক্ষা ও অবস্থার গুণে অন্যদিকে ধাবিত হইয়াছে, তাহাকে ঘরের দিকে ফিরাইতে হইবে। আশা করি, দেউস্কর মহাশয়ের বইখানি আমাদিগকে সেই পথে যাত্রায় সহায়তা করিবে...'। ১৯১০ সালে বইটি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। বইটিতে ব্রিটিশ আসার আগে মধ্যযুগে, অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক ইতিহাসবিদদের বহুচর্চিত সেই 'মুসলমান যুগ'-এর সাথে ইংরেজ জমানার তুল্যমূল্য আলোচনা করতে গিয়ে দেউস্কর বলেছেন – 'মুসলমান আমলে আমাদের আর যাহাই কষ্ট থাকুক, মানসিক শক্তি বিকাশের পথ এরূপ রুদ্ধ হয় নাই, বরং সে পথ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ছিল। আকবরের রাজ্যে ৪১৪ জন মনসবদারের মধ্যে ৫১ জন হিন্দু ছিলেন। শাহজাহানের আমলে হিন্দু মনসবদারদিগের সংখ্যা ১১০ হইয়াছিল। তাহার মনসবদারের মোট সংখ্যা ৬০৯ ছিল। প্রায় মনসবদারের তুল্যক্ষমতা-বিশিষ্ট রাজকর্মচারীর সংখ্যা ইদানীং ভারত-সাম্রাজ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ২ হাজার ৩ শত ৭৩টির কম নহে। ইহার মধ্যে কেবল ৯২টি পদে ভারতবাসীর নিয়োগ হইয়াছে।' ...'৯০ বৎসর কাল আন্দোলন, আলোচনা, আবেদন, নিবেদন, রোদন ও চীৎকারাদি করিয়া আমরা গড়ে বৎসরে একটি করিয়া উচ্চপদ লাভ করিয়াছি, ইহা চিন্তা করিলে আমাদিগের হৃদয়ে লজ্জার সঞ্চার হয়।' ইংরেজরা এদেশকে কেমন 'সুশিক্ষিত', 'সুভদ্র' করতে উদ্যোগী হয়েছিল, এই হচ্ছে তার নমুনা। এর সাথে বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্রের 'দুই ভাইয়ের হাতে হাত ধরি ধরি'-র তত্ত্বকে কি মেলানো যায়? ব্রিটিশ দাবি করেছিল, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় 'তৃতীয় পক্ষ' হিসেবে তাদের প্রয়োজনীয়তার কথা। আগেই বলেছি, ব্রিটিশ শাসনের আগে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নজির নেই বললেই চলে। কুপল্যান্ডের মতো সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষের পণ্ডিতও মানতে বাধ্য হয়েছেন যে ১৮৮৫ সালের আগের একটা দীর্ঘ পর্যায়ের মধ্যে মাত্র দুটো ছোটোখাটো হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার নজির আছে, যেখানে ১৮৮৫-র পর থেকে পর পর দাঙ্গার ঘটনাগুলো ঘটেছে। ঘটনা এটাই যে, এই স্বঘোষিত 'তৃতীয়পক্ষ'-রা আসার পর থেকেই এদেশে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে অবনতি ঘটে!

দুই ধর্মের রাজার যুদ্ধকে দুই সম্প্রদায়ের সংঘাত বলে চালিয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাদের চিন্তায় আচ্ছন্ন এদেশের হিন্দু পুনরুত্থানবাদী পণ্ডিতরা। যেমন, শিবাজী এবং মুঘলদের যুদ্ধ, কিংবা রানা প্রতাপের সাথে মুঘলদের যুদ্ধ, যেগুলি বস্তুত ছিল দুই সামন্তশক্তির যুদ্ধ, তাকে দেখানো হল দুই সম্প্রদায়ের যুদ্ধ হিসাবে এবং রানা প্রতাপ বা শিবাজীকে (যাঁরা আর পাঁচটা সামন্তরই দলভুক্ত ছিলেন), তাঁদের 'মহান' 'হিন্দু বীর' হিসেবে চিত্রায়িত করা হল!! এবং সচেতনভাবে চেপে যাওয়া হল, দুই সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ইতিবাচক নজিরগুলো। যেমন, আয়ুধের নবাব সফদরজং (১৭৩৯-৫৪) হনুমানঘেড়া গড়ার জন্য বাবা অভয়দেবকে সাত বিঘা জমি দান করেছিলেন, তাঁর নাতি আসফাদুল্লার সময় সেখানে মন্দির ও দুর্গ নির্মাণের জন্য একটা তহবিল গড়ে তোলা হয়। দুঃখজনক যে, সেই হনুমানঘেড়াই পরে সংঘ পরিবারের আখড়ায় পরিণত হয় এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদের বিষ ছড়ানোর একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়। এবার বিপরীতে একটা নেতিবাচক উদাহরণে আসা যাক। আমরা জানি, সিপাহী বিদ্রোহ তথা মহাবিদ্রোহের সময় হিন্দু-মুসলিম কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাতে সামিল হয়েছিলেন, যা ইংরেজ সরকারের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, বস্তুত তারপর থেকেই ব্রিটিশরা এদেশে

সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াতে সবচেয়ে বেশি তৎপর হয়েছিল, কারণ হিন্দু-মুসলমান জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই চালালে তা যে কত বড়ো আকার ধারণ করবে এবং তা যে কত শক্তিশালী একটা বিদ্রোহের জন্ম দিতে পারে, ব্রিটিশ রাজশক্তি সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। যাই হোক, এই বিদ্রোহ দমনের পর পরই ব্রিটিশরা অযোধ্যা এবং ফৈজাবাদে তাদের পছন্দসই বেশ কিছু পুরোহিত, মোহন্ত এবং পান্ডাকে পুরস্কৃত করে, কারণ এঁরা তাদের সাহায্য করেছিল।

ব্রিটিশ আসার আগে এদেশে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণের সম্পর্কের মধ্যে যে একটা মোটের উপর শান্তিপূর্ণ বাতাবরণই ছিল তা সাধু, সন্ত, সুফি সাধকদের মধ্যে দিয়ে বা ভক্তি আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বারে বারে প্রকাশ পেয়েছে। কিছু কিছু দেবদেবীও উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা মিলেই সৃষ্টি করেছিল যেমন সত্যপীর, ওলাবিবি, কালু রায়, দক্ষিণরায়, বনবিবি ইত্যাদি।

সখারাম গনেশ দেউস্কর তাঁর উক্ত বইটিতে উল্লেখ করছেন, 'মুসলমানেরা কয়েক শতাব্দী এদেশে বাস করিয়া হিন্দুদিগের সহিত মিশিয়াছে, তথাপি তাহাদের আচার-ব্যবহার বা ধর্ম্মবিশ্বাসে সবিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই। পক্ষান্তরে বিগত প্রায় এক-শতাব্দী কাল মুসলমানেরা প্রতিবেশী হিন্দুদিগের কুসংস্কারসমূহের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং তাহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানাদির প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতি বা অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছে।' ...'দক্ষিণাপথে নিজাম রাজ্যে অনেক মুসলমানের বাস, কিন্তু সেখানকার নিম্নশ্রেণীর কৃষিজীবী মুসলমানেরা হিন্দুদিগের প্রায় সমস্ত আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করিয়া থাকে।

বেলুচিস্তানের রাজধানী খেলাতনগরে প্রায় চারশত ঘর হিন্দু বণিকের বাস। ইঁহারা প্রধানতঃ মুলতান ও শিকারপুর হইতে গিয়া তথায় বাস করিয়াছেন। এই সকল হিন্দু বণিক যে সেখানে স্বেচ্ছামত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবারই অধিকারপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা নহে; তাহাদের অত্রত্য ধর্ম্মমন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য তাহারা নগরের আমদানী মালের উপর একটি কর বসাইবার পর্যাপ্ত অধিকার লাভ করিয়াছেন।' গনেশ দেউস্কর এই লেখাতেই আরো দেখিয়েছেন কাবুল, কান্দাহার-সহ আফগানিস্তানে অবধি হিন্দুরা এমনকি হিন্দু ব্রাহ্মণরা তাঁদের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা নিয়ে কীভাবে সুখেই দিনযাপন করছেন। একইভাবে তিনি দেখান যে, মালাবারের রাজা হিন্দু হলেও সেখানে অধিক সংখ্যক মুসলমানের বাস এবং 'সেখানকার রাজারা ধর্ম্ম-বিষয়ে উদার এবং উদাসীন। বিধর্ম্মীরা শান্তভাবে স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে হিন্দু রাজারা কখনও তাহাতে বাধা দেয় না'।

একজন প্রগতিশীল সাংবাদিক হিসেবে গনেশ দেউস্করের এই বই কিন্তু বেশ কিছু সত্য কথাকে তুলে ধরেছে, যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বেতনভুক ইতিহাসবিদদের এবং হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের বক্তব্যের বিপরীত সত্যটাকেই প্রতিফলিত করে। ইংরেজরা যে সাম্প্রদায়িক বিভেদের বিষ ছড়াতে ইতিহাস বিকৃতিও করেছে, তার কথাও গনেশ দেউস্কর জানাতে ভোলেননি। হিন্দু পুনরুত্থানবাদের অন্যতম হোতা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের জবাব দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "...কিন্তু ভেদনীতির বলে যাঁহারা ভারত শাসন করিতে চাহেন, তাঁহারা হিন্দু মুসলমানে বিরোধ-বর্ধনের জন্য মুসলমানদিগকে অত্যাচারপরায়ণ ও অসভ্যরূপে ভারতীয় কোমল-হৃদয় ছাত্রদিগের সমক্ষে চিত্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাই আমরা বাল্যকাল হইতে শিখিয়াছি, মুসলমানেরা এক হস্তে কৃপাণ ও অপর হস্তে কোরাণ লইয়া কৃতান্তের বেশে

নানা দেশে উৎসাদিত করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন হইল লাহোর গবর্মেন্ট কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক টমাস আরণল্ড সাহেব 'Preaching of Islam' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সমগ্র সভ্য জগৎকে দেখাইয়াছেন যে, ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতার দ্বারা কেবল মুসলমান বণিকেরাই সমস্ত পৃথিবীতে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়ার প্রত্যেক প্রদেশে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে কিরূপ শান্তভাবে 'ইসলাম' প্রচারিত হইয়াছে, প্রত্যেক প্রচারকের নামধাম লিখিয়া তাহা অতি বিশদভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। চীন-সাম্রাজ্যের প্রায় এক-চতুর্থাংশ লোক যে ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন তাহা কি তরবারির বলে? চীনে কোনো সময়েই মুসলমানগণ দিগ্বিজয়ীরূপে প্রবেশ করেন নাই, বা রাজত্ব করেন নাই। সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বোর্ণিও এবং আফ্রিকায় আরব বণিকদিগের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের দ্বারাই ইসলাম প্রচারিত হইয়াছে। খৃষ্টানদিগের মধ্যে ধর্ম্ম-প্রচার একদল লোকের ব্যবসায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু মুসলমানগণ প্রত্যেকেই তাঁহাদিগের স্ব-ধর্ম্মের প্রচারক; তাঁহাদের ধর্ম্মে পুরোহিত প্রথা না থাকাতে সকল লোকই, বিশেষত আরব বণিকগণ অবসরমত ধর্ম্ম-বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া এবং সুদৃষ্টান্তের দ্বারা বহু দেশে ইসলাম ধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছেন। কোরাণে বিধর্ম্মীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার জন্য ভুরি ভুরি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।" এইভাবে গনেশ দেউস্কর ব্রিটিশদের সাম্প্রদায়িকতার বিষকে ছড়াতে ইতিহাসের যে মিথ্যা বিকৃতি, তাকে উন্মোচন করে দিয়েছেন।

শুধুমাত্র গনেশ দেউস্করই নন, পরবর্তীতে নানা প্রগতিশীল ঐতিহাসিক এই ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ এনেছেন। বিপান চন্দ্র যেমন বলেছেন, 'সাম্প্রদায়িক চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার হাতিয়ার হিসেবে, এবং সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের একটি মৌলিক অঙ্গ এবং ঐ মতাদর্শ কর্তৃক সৃষ্ট বস্তু হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হল ভারতীয় ইতিহাসের বিশেষত তার প্রাচীন ও মধ্যযুগের একটি সাম্প্রদায়িক এবং বিকৃত অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী।' বিপান চন্দ্রের 'আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ' বইটিতে তিনি লালা লাজপত রাইয়ের উদ্ধৃতি তুলে দিয়েছেন, যেখানে লাজপত রাই বলছেন – 'সে সময়ে সরকারী স্কুলগুলিতে ওয়াকিয়াত-ই-হিন্দ নামে ভারতের ইতিহাসের উপর একটি বই পড়ান হত। বইটি আমার মনে এই গভীর বোধের জন্ম দেয় যে মুসলমানরা হিন্দুদের প্রতি গভীর নিষ্ঠুরতার সঙ্গে আচরণ করেছিল। বাল্যকালে ইসলামের প্রতি যে শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেম ওয়াকিয়াত-ই-হিন্দ পাঠের সাথে সাথে তা ঘৃণায় পরিণত হতে থাকে।'

এই ইতিহাস বিকৃতির ট্র্যাডিশন মেনেই পরবর্তীতে আমরা দেখি হিন্দুত্ববাদী তথা সংঘ পরিবারের 'স্বরচিত ইতিহাস' চর্চা, যেখানে সিন্ধু সভ্যতাকে প্রাচীন আর্যসভ্যতা বলে দাবি করা হয়, বা আর্যদের এদেশেরই আদি বাসিন্দা বলে চালানোর চেষ্টা করা হয় এবং আর্য-শ্রেষ্ঠত্বের মহিমা কীর্তন করা হয়। আসলে ইতিহাসের নিজস্ব গতিতে তাকে ব্যাখ্যা না করে হিন্দুত্ববাদের সুবিধামতো তাকে তারা উপস্থাপিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে জুতোটাকে পায়ের মাপে করার প্রয়াসের পরিবর্তে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটি হল পা দু'টিকে কেটে ছেঁটে জুতোর মাপে করে নেওয়া!

মধ্যযুগটি কি অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ ছিল? এবার আসা যাক এই প্রশ্নে। উত্তর মোটের উপর হল –না। যদিও এই মধ্যযুগেই আবার বেশ কিছু এমন উপাদান পাওয়া যাবে, যা অন্ধকারের যুগের সাথেই তুলনীয়, কিন্তু মনে রাখতে হবে তার সাথে মুসলমান শাসনের কোনো সম্পর্ক নেই।

মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ্যবাদ তার চরম রক্ষণশীল দিকটির প্রকাশ ঘটিয়েছে। এই সময়ই সতীদাহ, কুলীনপ্রথা, বাল্যবিবাহ, অস্পৃশ্যতা, সবকিছুর চরম প্রকাশ ঘটেছিল। এক কথায়, ব্রাহ্মণ্যবাদ তার সবচেয়ে কুৎসিত রূপটি নিয়ে হাজির হয়েছিল এই মধ্যযুগেই। গুপ্তযুগ যদি হয় প্রথম হিন্দু পুনর্জাগরণের যুগ, তাহলে অদ্বৈত মায়াবাদের প্রধান ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য কিংবা তাঁর শিষ্য কুমারিল ভট্টের হাত ধরে মধ্যযুগেই হিন্দুদের দ্বিতীয় পুনরুত্থান ঘটেছিল। ভাববাদী চিন্তার চরম এক বিকাশ এই সময়েই ঘটেছিল। এই 'মায়াবাদ' হচ্ছে এমন এক দর্শন, যা বস্তুত নিয়তিবাদ এবং নিষ্ক্রিয়তাবাদের জন্মদাতা। জাতি-বর্ণব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে বর্ণব্যবস্থা আরো জটিলতর হয়েছিল মুখ্যত এই সময়কালেই। সেই অর্থে এই মধ্যযুগ ছিল সত্যিই অন্ধকারাচ্ছন্ন এক কালপর্ব। কিন্তু মুসলমানরা এদেশকে 'অন্ধকার'-এর দিকে নিয়ে গেছে, একথা সত্যি নয়, যেমন সত্যি নয় ব্রিটিশরা এদেশটাকে 'আধুনিক ও সুসভ্য' করার 'মহান লক্ষ্য' নিয়ে এখানে এসেছিল এই দাবিটাও। ঘটনা এটাই ব্রিটিশরা এদেশে এসেছিল তাদের সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের স্বার্থে। কার্ল মার্কস যেমনটি বলেছিলেন যে, পুঁজিপতিরা তাদের আদিম পুঁজিটি মূলত লুঠতরাজের মধ্যে দিয়েই সংগ্রহ করে থাকে, তেমনই ব্রিটিশও এদেশ থেকে তাদের আদিম পুঁজিটি লুণ্ঠনের মাধ্যমেই সংগ্রহ করেছিল। শ্রদ্ধেয় কমিউনিস্ট নেতা এবং সমাজ বিজ্ঞানী সুনীতি কুমার ঘোষ তাঁর 'বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি-রাজনীতি' বইটিতে পরিসংখ্যান সহযোগে দেখিয়েছেন যে কীভাবে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ও যখন বাংলার অর্ধেক কৃষক এবং মোট জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশ মানুষ মারা গেলেন, তখনও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার রাজস্বের ৫ শতাংশও ছাড় দেয়নি। ব্রিটিশরা রেলপথ, আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কিছু কলকারখানা তৈরি করেছিল ঠিকই এবং তা দেখিয়ে কেউ কেউ তাদের 'সভ্যতার অগ্রদূত' হিসেবে অভিহিতও করেন, কিন্তু বাস্তব সত্য হল এটাই যে তারা যখন এদেশটাকে লুণ্ঠন শুরু করছিল, তখন এদেশটা দাঁড়িয়েছিল শিল্পবিপ্লবের দোরগোড়ায়। ব্রিটিশ লুণ্ঠনের কারণেই দেশটার শিল্পবিপ্লব ব্যাহত হল এবং এখানকার লুণ্ঠনের থেকে প্রাপ্ত আদিম পুঁজি ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখল। সুনীতি কুমার ঘোষ লিখছেন, 'ইংলন্ডের শিল্পবিপ্লব যা শুরু হল প্রায় পলাশীর সময় থেকে তাতে বাংলার বিবিধ অবদান ছিল। প্রথম, বাংলা থেকে লুণ্ঠিত ও শোষিত বিপুল সম্পদ ইংলন্ডের শিল্পবিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের এক বিরাট অংশ যুগিয়েছিল। দ্বিতীয়, বাংলার বস্ত্রশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পকে ধ্বংস করে বাংলায় এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে গড়ে তোলা হয় ইংলন্ডের যন্ত্র শিল্পের বাজার। একজন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক হোরেস উইলসন বলেছিলেন প্যাসলি (paisley) ও অন্যান্য ম্যাঞ্চেস্টারের মিলগুলি শুরুতেই বন্ধ হয়ে যেত এবং বাষ্পের সাহায্যেও তাদের চালানো বোধ হয় সম্ভব হত না যদি না এদেশ থেকে ইংলন্ডে আমদানি করা বস্ত্রের উপর শুল্ক ধার্য করে তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হত। ভারতবর্ষের শিল্পীদের ধ্বংসের উপর সেই মিলগুলি গড়ে উঠেছে।' সুনীতি কুমার ঘোষ আরো বলেছেন, 'প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে বাংলার ও

ভারতের অন্যত্র শিল্পে ধনতন্ত্রের সূচনা দেখা দিয়েছিল তাকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ধ্বংস করে; যে ধনতান্ত্রিক শিল্প ও কারিগরি বিদ্যা বিকশিত হয়েছিল তা বিনষ্ট হয়।'

মধ্যযুগকে 'অন্ধকারাচ্ছন্ন' বললে তা হবে বস্তুকে দেখার একদেশদর্শিতাও। কেননা, ব্রাহ্মণ্যবাদী রক্ষণশীলতা যেমন ছিল সমাজের একটা অন্ধকার দিক, পাশাপাশি আবার মনে রাখতে হবে, এই যুগ আমাদের অনেক কিছু দিয়েছেও। যেমন, সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা পদাবলি সাহিত্যকে এই যুগেই প্রথম পাই। পাঁচালি, কীর্তন, বাউলগানও এই যুগেরই অবদান। বস্তুত মুসলমান শাসনের হাত ধরে স্থাপত্য, রন্ধনশিল্প, সংগীতেরও এক চরম উৎকর্ষ ঘটে এই যুগেই। শিল্পবিকাশের কথা তো সুনীতিবাবুর বক্তব্য থেকেই পরিষ্কার, যা ঘটেছিল ব্রিটিশ আসার আগে মধ্যযুগের একদম শেষদিকে। ভুলে গেলে চলবে না, ভক্তি আন্দোলনও মধ্যযুগেরই পরিণতি, যা তথাকথিত হিন্দু পুনরুত্থানবাদের থেকে গুণগতভাবেই ছিল আলাদা। হিন্দু পুনরুত্থানবাদ যেখানে ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী রক্ষণশীল গোঁড়া চিন্তার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস, সেখানে ভক্তি আন্দোলন ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ। ভক্তি আন্দোলন ছিল প্রগতি অভিমুখী, যখন দয়ানন্দ, বঙ্কিম, তিলক, বিবেকানন্দ প্রমুখ-পরিচালিত হিন্দু পুনরুত্থানবাদ ইতিহাসকে পিছনের দিকে (বৈদিক যুগে) নিয়ে যেতে চাইছিল। ভক্তি আন্দোলন আমাদের দিয়েছিল কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য, মীরাবাঈ, রামানন্দ, রবিদাসদের মতো উদার ও উন্নত চিন্তার মানুষদের।

ওই যুগে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশের প্রশ্নে সখারাম গনেশ দেউস্কর বলছেন — 'মুসলমান-শাসনে হিন্দুগণ নব প্রাণ লাভ করিয়াছিলেন। বারুদ, কামান, কাচ, মোমবাতি, ঘরের আসবাব, লোহার জিন, প্রভৃতি নির্ম্মাণের উন্নত কৌশল মুসলমানেরাই এদেশে প্রবর্ত্তিত করেন। মুসলমানদিগের চেষ্টায় ভারতীয় সঙ্গীত, চিকিৎসা, জ্যোতিষ, স্থাপত্যবিদ্যা, উদ্যানশাস্ত্র, প্রভৃতির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। মুসলমানদিগের দৃষ্টান্তে হিন্দুদিগের ভূগোল, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতির উন্নতি সাধিত হয়। রাস্তা, ঘাট, খাল, পান্থশালা, ডাকঘর, প্রভৃতি বিষয়ে মুসলমান-শাসনে ভারতের সামান্য উন্নতি হয় নাই — ইংরাজ লেখকেরা স্বার্থ-বশে যাহাই বলুন, এ সকল কথা কোন হিন্দুর বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।'

ব্রিটিশরা ইসলামের শাসনকে সাধারণত 'বর্বরতার প্রতিনিধি' হিসাবে দেখাতে চেয়েছে। ট্র্যাজেডি হল এটাই যে, এদেশের একটা বৃহৎ আলোকপ্রাপ্ত অংশও এভাবেই ভাবতে অভ্যস্ত যে 'সাদা চামড়ার' সাহেবরা হল 'সভ্যতার প্রতীক', 'উদারমনস্ক' আর আরব থেকে আসা মুসলমানরা হল 'বর্বর', 'লুঠেরা', 'অত্যাচারী' ইত্যাদি ইত্যাদি। বাস্তবটা কিন্তু ছিল ঠিক তার উল্টো। 'ইতিহাসে বিজ্ঞান' (Science in History) বইয়ের লেখক জে ডি বার্নালের মত অনুযায়ী, নবম, দশম এবং একাদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ এই মধ্যযুগেই দুনিয়াতে 'ইসলামী বিজ্ঞান উচ্ছ্বসিতভাবে বিকাশ লাভ করছিল।' বার্নালের দাবি অনুযায়ী, মধ্যযুগে 'ইসলামী দেশগুলোতে যে সময় এক উজ্জ্বল সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করছিল, ঠিক সেই সময়ে ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চল বিভ্রান্তির কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়েছিল।' বার্নাল আরো বলছেন, 'ইসলামী বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি স্পষ্টতই গ্রীক বিজ্ঞানের ধারা থেকে আহরিত হয়েছিল। কিন্তু সে ধারাকে তা নবজীবন দান করেছিল, তার প্রসার ঘটিয়েছিল। ইসলামী পণ্ডিতরা কেবল যে নতুন করে বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড শুরু করে দিলেন তা নয়, প্রাচীনতর ও শ্রেষ্ঠতর প্রামাণ্য উৎসের সন্ধানে ব্রতী হলেন।

তাঁদের এই দ্বিমুখী প্রয়াসে রোম সাম্রাজ্যের শেষ দিককার গ্রীক বিজ্ঞানও পচনশীল দশা থেকে উদ্ধার পেল। একথা ঠিক যে ইসলামী বিজ্ঞান কখনোই আয়োনীয় প্রকৃতি-দার্শনিকদের তত্ত্বভাবনার মহোচ্চ স্তরে উঠতে পারেনি, অ্যালেকজান্দ্রিয় ঘরানার জ্যামিতিক কল্পনাপ্রতিভাও তার অনায়ত্ত ছিল। তবু একথা অনস্বীকার্য যে তাঁরা এক সজীব ও বর্ধিষ্ণু বিজ্ঞান সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। পারস্য, ভারতবর্ষ এবং চীনের মতো অ-গ্রীক দেশের অভিজ্ঞতা থেকে রসদ সংগ্রহ করে তাঁরা গ্রীক গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রের সংকীর্ণ ভিত্তিটিকে অনেক প্রসারিত করে নিতে পেরেছিলেন। বীজগণিত আর ত্রিকোণমিতির কৌশলগুলোর প্রবর্তন করেন তাঁরা, আলোকবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেন। ইসলামী বিজ্ঞানের যে প্রসারণ ঘটে, তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রটি ছিল রসায়ন – বা আলকেমি। এক্ষেত্রে তাঁরা প্রাচীন তত্ত্বগুলির রূপান্তর ঘটিয়ে নব নব পরীক্ষানিরীক্ষার প্রবর্তন করে বিজ্ঞানচর্চার এক নতুন শাখা ও ঐতিহ্য গড়ে তোলেন। এই নতুন ঐতিহ্যের চরিত্রটি ছিল অনেকাংশেই গুণাত্মক, এমনকি রহস্যবাদী। তবু সেই কারণেই তা বহু শতাব্দী ধরে গ্রীকদের অতিরিক্ত যুক্তিশাসিত এবং গণিতনির্ভর জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাশাস্ত্রগত ঐতিহ্যের পালটা এক প্রবণতা হিসেবে কাজ করে। এই বিপরীত প্রবণতা বিজ্ঞানের পক্ষে বিশেষ লাভজনক হয়েছিল।' ...'ইসলামী বিজ্ঞানচর্চা অবশ্য বিফলে যায়নি। তবে যেসব দেশে সে-চর্চা হয়েছিল, তারা তার ফসল ভোগ করতে পারেনি। ইসলামী বিজ্ঞানের সমগ্র সৌধটি সরাসরি চলে আসে বর্ধিষ্ণু নব্য খ্রিস্টীয় সামন্ততান্ত্রিক বিজ্ঞানের অধিকারে। ইসলামী বিজ্ঞানের সংগৃহীত তথ্য, পরীক্ষানিরীক্ষা, তত্ত্ব এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি – সবকিছুরই উত্তরাধিকারী হয় খ্রিস্টীয় বিজ্ঞান।'

মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর 'ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান' বইটিতে এই বিষয়টি নিয়ে আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন – 'প্রাচীন গ্রীসের ঋষিকল্প পুরুষদের সাধনালব্ধ ফল আরবেরা শুধু উদ্ধারই করেনি, সংগ্রহ এবং রক্ষা করেছে। বহুল সমালোচনা দ্বারা এগুলোর যথারীতি উন্নতিবিধানও তারা করেছে। প্লেটো, এরিস্টটল, ইউক্লিড, এপেলোনিয়াস, টলেমি, হিপোক্রেটিস এবং গ্যালেনের সম্পূর্ণ গ্রন্থরাজি আধুনিক য়ুরোপের জনকেরা আরবী অনুবাদের মধ্যেই সর্বপ্রথম পেয়েছে – শুধু অনুবাদ রূপেই নয়, পেয়েছে পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা সমৃদ্ধ অবস্থায়। আধুনিক য়ুরোপ আরবদের কাছ থেকে শুধু যে ভেষজ আর গণিত বিদ্যাই শিখেছে তা নয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান মানুষের দৃষ্টিকে করে প্রসারিত আর প্রকৃতির মধ্যেও যে একটা সুসংবদ্ধ নিয়মের রাজ্য আছে তার কাছে সেই রহস্য করে উন্মোচিত; আরবেরা এহেন জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা করেছে ঐকান্তিক অনুরাগে। নতুন নিরীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আরব দার্শনিকেরা পৃথিবীর পরিধি ও গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থান ও সংখ্যা সংক্রান্ত সঠিক জ্ঞান লাভ করেছে। (জ্যোতির্বিজ্ঞান আদিতে যা ছিল তা জ্যোতিষবিদ্যারই নামান্তর মাত্র।) প্রাচ্য দেশগুলোর অধিকাংশ পুরোহিতই মোটামুটি তার এই রূপের চর্চা করেছে। কিন্তু আরবদের হাতেই তার আদিম রূপের হল মুক্তি আর তা গড়ে উঠল বিজ্ঞানের যথার্থ রূপ নিয়ে। যদিও আলেকজান্দ্রিয়ার ডায়োফ্যান্টাসই করেছিল বীজগণিতের আবিষ্কার তবুও আরব সংস্কৃতির প্রারম্ভ পর্যন্ত সাধারণের মধ্যে তা প্রতিষ্ঠা হয়নি। বস্তুত উক্ত বিজ্ঞানের নামের মধ্যেই প্রচলিত বিশ্বাস লুকিয়ে আছে যে তার মূল আরবীয়; কিন্তু তা যে নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় গ্রীক পণ্ডিতদের কাছে আরবদের

বিনম্র স্বীকৃতিতে। আয়ুর্বেদের উদ্দেশ্যে গাছগাছড়ার পরীক্ষা হল, কিন্তু ডায়োসকারাইডেস-এর দুই হাজার রকম গাছের আবিষ্কারের মধ্যেই জন্ম নেয় এক নূতন বিজ্ঞান। কিমিয়া ছিল একটা গুপ্তবিদ্যা, প্রাচীন মিশরের পুরোহিতরা তাকে যক্ষের ধনের মতো আগলিয়ে রেখেছিলো। ব্যাবিলনেও যে এর চর্চা হয়নি তা নয়। বহু পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের চিকিৎসকরাও রসায়ন শাস্ত্রের কিছু কিছু জেনেছিল। কিন্তু তার জন্ম আর তার প্রাথমিক উৎকর্ষ আরব সাধনারই ফল। তারাই পরিস্রুত-করণের জন্য কালো বকযন্ত্রের প্রথম আবিষ্কার করে আর এ নামও তাদেরই দেওয়া; প্রকৃতির ত্রিরাজ্যের মালমশলাগুলোকেও বিশ্লেষণ করল এবং অম্লপদার্থগুলোর মধ্যে করল পার্থক্য ও সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টা আর মূল্যবান খনিজগুলোকে নমনীয় ও হিতকর ঔষধে করল পরিণত।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে আরবেরা উন্নতি করেছিল সব চাইতে বেশি। গ্যালেনের উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন মাসুয়া আর জেবার। এই খ্যাতনামা পণ্ডিতদের কাছ থেকে তাঁরা যা শিখলেন, তারও যথেষ্ট পরিবর্ধন করে যান তাঁরা। সুদূর বোখারায় দশম শতাব্দীতে ইবনে সিনা জন্মগ্রহণ করলেন, কিন্তু তাতেই বা কি? য়ুরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানে পাঁচ শতাব্দীব্যাপী একচ্ছত্র আধিপত্য করে গেলেন তিনিই। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত স্যালারানোর বিদ্যালয়ই য়ুরোপে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল হয়ে রইল। কিন্তু আরবদের অনুগ্রহেই এর জন্ম এবং ইবনে সিনার জ্ঞান এখানে শিক্ষা দেওয়া হত।

প্রত্যক্ষ প্রমাণাদির সাহায্যে জ্ঞান আহরণ করার ঐকান্তিক বাসনাতেই ছিল আরব পণ্ডিতদের প্রজ্ঞার বৈশিষ্ট্য। বায়বীয় কল্পনার আত্মপ্রসাদ মুক্ত হয়ে তাঁরা দাঁড়াল সুস্পষ্ট ভিত্তির উপর সুদৃঢ় হয়ে।'

ইসলামের উত্থানের পিছনে বস্তুগত সামাজিক কারণ ছিল, যা 'মধ্যযুগ ও ভক্তি আন্দোলন' অধ্যায়ে আলোচনা করেছি, তা আরেকবার স্মরণ করা দরকার। এম এন রায়ের উপরো বইটিতে তিনি দেখিয়েছেন, হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের আগে আরবেরা পারস্পরিক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিল, যদিও যুদ্ধের ক্ষেত্রে তারা কিছু রীতিনীতি মেনে চলত। প্রকৃতপক্ষে সে-সময় তাদের কাজ ছিল দস্যুবৃত্তি। ইসলাম ধর্মের উত্থানের আগে তাদের ধর্মীয় রীতিনীতিও ছিল অদ্ভুত, উৎকট, বিচিত্র সব কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা, নানান কুপ্রথা এবং বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানে পরিপূর্ণ। এদিকে আশেপাশের দেশগুলোতেও তখন খ্রিস্টান কিংবা ইহুদি ধর্ম প্রবল মতান্ধতা ও রক্ষণশীলতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, যা বিরোধ, বিবাদ, সংঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্বকে ক্রমশ তীব্র করে তুলেছিল। এমন একটা নৈতিকভাবে অবক্ষয়ী, বিশৃঙ্খল ও বিপর্যস্ত সামাজিক অবস্থায় ইসলাম নিয়ে এসেছিল শান্তির বাণী। তারা মানুষকে দস্যুতাবৃত্তি ও যাযাবরপূর্ণ জীবন ছেড়ে কৃষিকাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য করতে শেখাল। এম এন রায় লিখেছেন, 'প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে নতুন সমাজের ভিত্তি পত্তন করল আরবদের এই একেশ্বরবাদ। যারাই এ নূতন ধর্মের আওতায় আশ্রয় নিল, তাদেরই এ দিল বিবেক-বুদ্ধির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। ধর্মের নির্যাতনের বিরুদ্ধে আর নিপীড়িতদের আশ্রয়রূপেই ইসলাম এমনিভাবে মাথা তুলে দাঁড়াল।' 'নিপীড়িতদের আশ্রয়দাতা' কথাটার মধ্যেই ইসলামের আবির্ভাবের সময়কালের বাস্তব অবস্থা এবং ইসলামের উদারতা ও পরধর্মমতের প্রতি সহিষ্ণুতার পরিচয় প্রকাশ পাচ্ছে। এম এন রায় আরো লিখছেন,

'মিশর, পারস্য এমনকি খ্রীষ্টজগৎ থেকেও নির্যাতিত সম্প্রদায়গুলো স্বাধীন অতিথিপরায়ণ মরুদেশে আরবভূমির দিকে পালিয়ে এসেছিল – কারণ সে দেশে তারা যা ভাবত তা প্রকাশ্যে বলতে পারত আর যা প্রকাশ্য বলত তা কাজে পরিণত করত। পারসীরা যখন আসীরীয়দের রাজত্ব দখল করে নিল আর সেই সঙ্গে যখন ব্যাবিলনের ধর্মবেদী প্রাচীন পারসিক পুরোহিতদের দ্বারা হল বিপর্যস্ত তখন নিসর্গপূজারী পুরোহিতরা তাদের প্রাচীন বিশ্বাস আর জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত মূল্যবান জ্ঞান নিয়ে পার্শ্ববর্তী মরুভূমির দিকেই দিল পাড়ি। এর কিছুকাল আগে আসীরীয় আক্রমণ বহু একনিষ্ঠ ইসরাইল বংশীয়দেরও সেই অতিথি সেবাখ্যাত মরুপ্রান্তরে চলে যেতে বাধ্য করেছিল। জন ব্যাপটিস্ট পর্যন্ত হিব্রু পয়গম্বরই তাই দেখি আরব মরুভূমির মধ্যেই বসবাস করছেন, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করছেন আর করছেন তাঁদের ধর্মমত প্রচার।' এম এন রায় তাঁর বইটির ভূমিকায় আক্ষেপ করে বলেছেন যে, 'পৃথিবীর কোন সভ্যজাতিই ভারতীয় হিন্দুদের মতো ইসলামের ইতিহাস সম্বন্ধে এমন অজ্ঞ নয় এবং ইসলাম সম্বন্ধে এমন ঘৃণার ভাবও পোষণ করে না।'

শুধু জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রেই নয়, মুসলিম শাসন ব্যবস্থা নিয়েও ব্রিটিশ এবং তার দোসর হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের দাবি যথার্থ নয়।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসবিদ ও তাঁদের হিন্দু পুনরুত্থানবাদী দোসরদের বর্ণিত 'অত্যাচারী' মুসলমান শাসন প্রসঙ্গে দেউস্কর বলছেন – "মুসলমান শাসনপ্রণালী কষ্টকর ছিল, এ কথা আমরা স্বীকার করি না। যখন অল্প আয়ে এত অভাব হইত না, দেশের লোক জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে রাজ-সরকারে সর্বোচ্চ পদ পর্যন্ত প্রাপ্ত হইত, দেশের টাকা দেশেই থাকিত একখানা বড় ছোরা রাখিতে 'পাশ' লইতে হইত না, এত লোক অনাহারে কষ্ট পাইত না, তখনকার অবস্থা যে বর্তমান অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় ছিল, এ কথা কেমন করিয়া বলিব? হিন্দুরাজ্যে মুসলমান গুণীর আদর ছিল, মুসলমান রাজ্যে হিন্দু গুণবানের উন্নতি হইত। এ সকল কথা আমরা ইংরেজের কল্পিত কথায় ভুলিতে পারি না।"

এই চিত্রগুলি থেকে কতগুলো ব্যাপার পরিষ্কার – এক, মুসলমান শাসনে হিন্দুদের উপর অত্যাচার নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বেতনভুক ইতিহাসবিদরা অনেক অতিকথা ছড়িয়ে দিয়েছিল। দুই, ইংরাজ শাসনই প্রথম শাসন যা এসেছিল বসবাস করতে নয়, লুণ্ঠন করতে। এখানে আরো একটা কথা জানিয়ে দেওয়া দরকার, মুসলমান শাসকদের আমলে কিন্তু দেশের কোথাও মন্বন্তরের বা অনাহারে মৃত্যুর নজির নেই। দেশে প্রথম মন্বন্তর ঘটেছে ইংরেজ আমলেই। আর আজ তো দেশের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে স্থায়ী মন্বন্তর চলছে। বস্তুত এই মন্বন্তর, অনাহার এই সবই বিশ্বপুঁজিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদের অবদান।

বস্তুত মুসলমান শাসকদের মধ্যে মহম্মদ গজনবি বা তৈমুরলঙদের মতো কিছু শাসক বাদ দিলে পরবর্তীতে যাঁরা এদেশে এসেছিলেন, তাঁরা এই দেশেই থেকে গেছেন এবং রাজত্ব করে গেছেন। ফলত দেশের সম্পদ বহির্নিগমনের কোনো প্রশ্নই ছিল না, বিপরীতে ইংরেজ শাসকরাই এদেশে এসে এখানকার সম্পদ লুঠ করে নিজের দেশের সভ্যতাকে গড়ে তুলেছে এবং আমাদের দেশের শিল্পায়নের পথকে দীর্ঘকালের জন্য পঙ্গু করে দেওয়ার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। আজও

সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির বিনিয়োগ এবং লুণ্ঠন এদেশের স্বনির্ভর শিল্পকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক মস্ত বাধার পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যদিও এদেশের শাসকশ্রেণী এই প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগকেই 'উন্নয়নের মুখ্য চালিকাশক্তি' হিসেবে দেখিয়ে জনসাধারণকে আজও বিভ্রান্ত করে চলেছে। সেদিনও ব্রিটিশ রাজশক্তির পাশে ছিল এদেশের মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিরা, মূলত পার্সি এবং মাড়োয়ারি বানিয়া গোষ্ঠী। তারাই সস্তায় এদেশের কাঁচামাল ব্রিটিশের হাতে তুলে দিয়ে দালালির পয়সায় রাতারাতি সম্পত্তির পাহাড় জমিয়েছিল। কলকাতার বড়বাজার ছিল সেই কাঁচামাল সরবরাহের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। এছাড়া সামন্তপ্রভুদের একটা বড়ো অংশও সেদিন ব্রিটিশ রাজশক্তিকে মদত দিয়েছিল। হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের থেকে শুরু করে আজকের হিন্দুত্ববাদীদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক সেদিনও ছিল এই শ্রেণীদুটিই। সেদিনও ছিলেন কিছু ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী, কলমজীবী প্রচারক। আজও বিজেপির নরেন্দ্র মোদিকে 'উন্নয়নের মসিহা' হিসেবে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করতে এঁদেরই তৎপরতা চোখে পড়ার মতো! তাই মনে রাখা দরকার, সাম্প্রদায়িক হিন্দু মৌলবাদের বিরোধিতা হচ্ছে অন্তর্বস্তুতে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ এবং দেশীয় বৃহৎ পুঁজির একচেটিয়া আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই, তথা দেশের স্বাধীনতা এবং স্বনির্ভরতার সপক্ষে লড়াইয়েরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

পঞ্চম অধ্যায়

সংঘ পরিবার ও তাদের চিন্তাধারা

আগেই আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি, আজ যে হিন্দুত্ববাদের বিষবৃক্ষটি ফুলে-ফলে পল্লবিত হয়েছে, ব্রিটিশ সরকারই প্রথম এদেশের মাটিতে তার বীজ বপন করেছিল এবং হিন্দু পুনরুত্থানবাদীরা তা সযত্নে লালনপালন করেছিল। ইতিহাস দেখাচ্ছে, আজ আমরা যাকে হিন্দুধর্ম বলছি, তা হচ্ছে এমন এক ধর্ম, যা প্রাচীনকাল থেকেই বহুস্বর, বহুমতকে ধারণ করে এসেছে। যদিও এক-এক সময় এক-এক মতবাদ সেখানে প্রাধান্যকারী অবস্থায় থেকেছে। যেমন, ঋগ্বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞ, আচারবিচার বেশি প্রাধান্য পেয়েছে, প্রাধান্য পেয়েছে প্রকৃতির উপাসনা, আবার উপনিষদের সময় তা অনেক বেশি জ্ঞানতত্ত্বের দিকে ঝুঁকেছে, যাগযজ্ঞের গুরুত্ব কমেছে। এসেছে কর্মফল, জন্মান্তর, বর্ণপ্রথা। গুপ্তযুগে শৈব ধর্ম, শাক্ত ধর্ম, নারায়ণী ধর্মের মতো লোকায়তিক মতবাদগুলির পাশাপাশি পুরাণের আবির্ভাব ঘটেছে। আবার মধ্যযুগে হিন্দু দর্শনে দাপিয়েছে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত মায়াবাদ। এইভাবে বারবার নতুন নতুন ধর্মীয় চিন্তার আবির্ভাব ঘটেছে, এমনকি অন্তর্বস্তুতে যাদের অনেকেই পরস্পর বিরোধীও। এদের মধ্যে যেমন সংঘর্ষ, সংঘাতও ছিল, তেমনই কিন্তু শেষ অবধি তা হিন্দুধর্মের অপর ধারা হিসেবে স্বীকৃতিও পেয়েছে। সেগুলিকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে হিন্দুধর্মের মধ্যেই একাধিক সম্প্রদায়, একাধিক মতবাদ। আমরা আগেই তার সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করেছি। অথচ হিন্দুধর্মকে সমাজের একটি ঐক্যবদ্ধ এবং সুসংহত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম হিসেবে তুলে ধরে সচেতনভাবে হিন্দু-মুসলমানদের বিভেদ ঘটানোর কাজটি করেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। একাজটি অবশ্যই তারা করেছিল তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে। পুঁজিবাদ তার মুনাফার স্বার্থের বাইরে গিয়ে কিছুই করে না। মার্কস যেমন তাঁর পুঁজি গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে বলেছেন, 'মানুষের প্রয়োজন মেটানো পুঁজির উদ্দেশ্য নয়, বরং মুনাফা কামানোই তার একমাত্র লক্ষ্য।'

অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেতনভুক দুই ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জেমস মিল ও এলিয়ট এই আধুনিক সাম্প্রদায়িক ভাবনার বীজ বপনের কাজটি শুরু করেন। আমরা দেখলাম যে কীভাবে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ-জার্মান প্রাচ্য-বিষয়ক তাত্ত্বিকরা তা আরো সুংসহত করেছিলেন। বস্তুত হিন্দু পুনরুত্থানবাদীরা তাঁদের একনিষ্ঠভাবেই অনুসরণ করেছিলেন।

আজ যে বিজেপি নামক দলটির হাত ধরে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা একটা ফ্যাসিবাদী চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে, তা হচ্ছে হিন্দুত্ববাদের সাম্প্রতিকতম রূপ। এই হিন্দুত্ববাদীদের, বিশেষত বিজেপির রাজনীতি, মতাদর্শকে জানতে হলে আগে জানতে হবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, তথা আর এস এস-কে। আবার আর এস এস-কে জানতে গেলে তারও আগে আমাদের জানা দরকার আর এস এস-এর মতাদর্শগত মেন্টর বিনায়ক দামোদর সাভারকরের কথা।

প্রথম জীবনে সাভারকর দেশের মুক্তির জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন। তিনি 'ইন্ডিয়া হাউস' নামক একটি বিপ্লবী সংস্থায় যোগদান করেন। বিপ্লবী জীবনে তিনি ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ নিয়ে 'ইন্ডিয়ান ওয়ার অফ্ ইন্ডিপেন্ডেন্স' নামে একটি বইও প্রকাশ করেন, যে বইয়ে

'বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা'র কথা বলা হয়েছিল। বইটি ব্রিটিশরা নিষিদ্ধ করেছিল। ১৯১০ সালে 'ইন্ডিয়া হাউস' নামক বিপ্লবী দলটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কারণে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। সে-সময় তিনি গ্রেফতার হওয়া অবস্থায় যাতায়াতের পথে মার্সেলিস্ বন্দরে পৌঁছানোর সময় 'এস এস মোরিয়া' জাহাজ থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পালাতে চেষ্টা করেন, এটা ছিল তাঁর পরিকল্পিত পলায়ন প্রচেষ্টা, কিন্তু সাহায্যকারী বন্ধুরা সময়মতো না পৌঁছোতে পারার কারণে তিনি আবার ধরা পড়েন, পরে পালানোর চেষ্টার অভিযোগে বিচারে দোষী সাব্যস্ত হন এবং তাঁকে দু'বারের জন্য যাবজ্জীবন সাজার দণ্ড, অর্থাৎ ৫০ বছরের জন্য কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়। আন্দামান সেলুলার জেলে তাঁকে সে-সময় বন্দি করে রাখা হয়েছিল। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল, ১৯২১ সালে, অর্থাৎ ১০ বছরের মধ্যেই তাঁর মুক্তি হয়ে গেল! ওই বছরই তিনি তাঁর বিখ্যাত অথবা কুখ্যাত 'হিন্দুত্ভ : হু ইজ্ হিন্দু' বইটি প্রকাশ করেন। কেন হঠাৎ তাঁর সাজার মেয়াদ ফুরোনোর আগেই তাঁকে মুক্তি দিয়ে দেওয়া হল? এই মুক্তির পেছনের একটি ইতিহাসও পরে জনসমক্ষে আসে। ২০০২ সালের ৪ মে 'টাইমস্ অফ্ ইন্ডিয়া'র কলকাতা সংস্করণে একটি চাঞ্চল্যকর খবর ফাঁস হয়ে যায়। শিরোনাম ছিল, 'হিন্দুতভ্ হিরো সাভারকর হ্যাড বেগড্ ব্রিটিশ ফর মার্সি'। খবরটিতে ব্রিটিশের কাছে করুণা ভিক্ষা করে সাভারকরের একটি চিঠি প্রকাশ করে দেওয়া হয়। মহাফেজখানা থেকে উদ্ধার হওয়া এই চিঠিটি প্রথম প্রকাশিত হয় কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রকের গেজেটিয়ার ইউনিটের 'পেনাল সেটেল্‌মেন্ট ইন্ আন্দামান' নামক একটি বইয়ে। চিঠিটিতে তারিখ হিসেবে ১৯১৩ সালের ১৪ নভেম্বরের উল্লেখ আছে। অর্থাৎ সাজা পাওয়ার প্রায় তিন বছরের মধ্যে সাভারকর ব্রিটিশকে চিঠিটি দিচ্ছেন। কী লেখা আছে সেই চিঠিতে?

সাভারকর লিখছেন — 'যদি সরকার তার বহুবিধ বদান্যতা আর করুণার বশবর্তী হয়ে আমাকে মুক্তি দেন, আমি সংবিধানসম্মত প্রগতি এবং ইংরেজ সরকারের প্রতি আনুগত্যের সবচেয়ে একনিষ্ঠ না হয়ে পারি না। ...তাছাড়া সাংবিধানিক পথে আমার এই পরিবর্তন ভারত ও তার বাইরে থাকা বিপথগামী তরুণদের ফিরিয়ে নিয়ে আসবে যারা এক সময় আমাকে তাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে ভেবেছিল। সরকার যেমন চাইবে আমি তেমন সেবা করতে প্রস্তুত, কারণ বিবেকের তাড়নায় আমার পরিবর্তন বলে আমি আশা রাখি আমার ভবিষ্যতের ব্যবহারও অনুরূপ হবে। ...মহান রাজন্ ছাড়া কেই বা করুণাময় হতে পারেন; আর সরকারের পৈতৃক আবাসে ফিরে যাওয়া ছাড়া উড়নচণ্ডে সন্তান আর কী বা করতে পারে।'

মুক্তির বছরই সাভারকর লিখলেন তাঁর 'হিন্দুত্ভ : হু ইজ্ হিন্দু' নামক সেই কুখ্যাত বইটি। হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ফেরিওয়ালাদের কাছে যে বইটি শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতার মতন। কী ছিল এই বইটিতে?

সাভারকর প্রথম ব্যক্তি যিনি 'হিন্দু জাতি' সম্পর্কিত এক উদ্ভট ধারণাকে সামনে আনলেন, যা আদতে প্রথম দ্বিজাতি তত্ত্বের জন্ম দিল। সাভারকরের মতে, হিন্দু জাতির প্রতিনিধি হল তাঁরাই, যাঁরা এদেশকে শুধু 'পিতৃভূমি' বা 'মাতৃভূমি' বা জন্মভূমি বলে স্বীকার করেই ক্ষান্ত থাকেন না, পাশাপাশি এদেশকে 'পবিত্রভূমি' তথা 'পুণ্যভূমি' হিসেবেও স্বীকার করে থাকেন। তাঁর মতে এই জাতি হল একমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভারতবাসীরাই, কারণ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে এদেশটা 'পিতৃভূমি' বা 'মাতৃভূমি' বা জন্মভূমি হলেও তাঁরা এদেশটাকে 'পুণ্যভূমি' বলে

মনে করেন না। উদাহরণ হিসাবে তিনি যেমন বললেন, যেসব খ্রিস্টান বা মুসলমান এদেশে জন্মেছেন, তাঁদের কাছে এদেশটা জন্মভূমি হলেও তাঁরা এদেশকে 'পবিত্রভূমি' মনে করেন না। খ্রিস্টানদের কাছে 'পবিত্রভূমি' হল প্যালেস্টাইন তথা জেরুজালেম। আর মুসলমানদের 'পবিত্রভূমি' হল আরব। একমাত্র হিন্দুরাই এদেশটাকে 'পবিত্রভূমি' তথা 'পুণ্যভূমি' মনে করেন, অতএব এদেশটা তাদেরই। এইভাবে সাভারকর সাম্প্রদায়িক রাজনীতির একটা তাত্ত্বিক ভিত রচনা করার মধ্যে দিয়ে ইংরেজ সরকারের প্রতি তাঁর 'আনুগত্যের একনিষ্ঠতা' দেখালেন। বইটি এদেশে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মধ্যে প্রবল আলোড়ন ফেলল। প্রসঙ্গত বলা দরকার, সাভারকরের হিন্দুত্বের ধারণাতেও কিন্তু বৈদিক যুগের কালপর্বকেই 'হিন্দুযুগ' হিসেবে স্বীকার করা হয়। আমরা আগেই 'আযমই' প্রসঙ্গে আলোচনায় এই ধারণার ভ্রান্ততা নিয়ে আলোচনা করেছি। সাভারকর 'হিন্দুযুগ' হিসেবে তাঁর উক্ত বইয়ে উল্লেখ করেছেন, 'প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে ১৮১৮ শেষ হিন্দু রাজার আমল' অবধি সময়টাকে। অথচ আমরা আগেই দেখলাম, ইতিহাস বলছে, বৈদিক যুগের অনেক আগে থেকেই হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর সভ্যতা তথা সিন্ধু সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল এবং আজকের হিন্দুধর্মের অধিকাংশ উপাদানই এসেছে এই সিন্ধু সভ্যতা থেকেই।

১৯২১ সালে 'হিন্দুত্ভ : হু ইজ্ হিন্দু' বইটি প্রকাশের পর হেডগেওয়ার রত্নাগিরিতে গিয়ে সাভারকরের সঙ্গে দেখা করেন। লক্ষণীয় যে, আর এস এস-এর জন্মের আগেই এই সাক্ষাৎকারটি ঘটে। ধনঞ্জয় কী'র লেখা সাভারকরের জীবনী থেকে জানা যায় যে, সেখানে তাঁদের মধ্যে সাংগঠনিক বিষয়েও কিছু আলোচনা হয়েছিল। পরবর্তীতে আমরা দেখব, সংঘ পরিবারের পিতা হিসাবে আর এস এস-এর জন্ম হচ্ছে।

কংগ্রেস পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন এবং এদেশের মুসলমান জনসাধারণের ব্রিটিশবিরোধী খিলাফত আন্দোলন একযোগে এক তীব্র ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের রূপ নিয়েছিল, যদিও গান্ধিজি কখনোই চাইতেন না যে এদেশে ব্রিটিশবিরোধী গণআন্দোলন তীব্রতর হোক, আইনের চৌহদ্দি অতিক্রম করুক। তাই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের তীব্রতায় ভীত হয়ে তিনি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। এর ফলে ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান ঐক্য পুরোপুরি বিপরীতে বদলে যায়। দুই ধর্মের পারস্পরিক বিশ্বাসের সম্পর্কটা এর ফলে প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। উল্টে তৈরি হয়েছিল অনাস্থা, অবিশ্বাস। এটা ছিল এমন এক সময়, যখন আমরা দেখব একদিকে তার আগের বছরই সাভারকরের কুখ্যাত হিন্দুত্বের তত্ত্ব তাঁর বইয়ের মধ্যে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি পাচ্ছে। অন্যদিকে তার তিন বছর পরই অর্থাৎ ১৯২৫ সালে আর এস এস-এর জন্ম হচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ঘোষিতভাবেই সাংগঠনিক নীতি হল একচালক অনুবর্তিতা, অর্থাৎ একজন নেতার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন। সংগঠনের সেই একক ক্ষমতাবান ব্যক্তিকে তাঁরা বলেন 'সরসংঘচালক'। ১৯২২ সালে গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলন থেকে সরে আসার নেতিবাচক প্রভাবের কথা আগেই বলেছি। এই সময়, অর্থাৎ ১৯২৩ সাল থেকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নেতৃত্বে 'শুদ্ধি ও সংগঠন' আন্দোলন শুরু করেন, যার লক্ষ্য ছিল ধর্মান্তরিত

মুসলমানদের পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনা। এই সময় বিভিন্ন স্থানে, বিশেষত পঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও শুরু হয়। ১৯২৩ সালে দাঙ্গা লাগে নাগপুরে।

আর এস এস-এর ঘোষিত লক্ষ্যই হল 'হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্তান'। সাভারকর স্লোগান তুলেছিলেন, 'রাজনীতির হিন্দুত্বকরণ এবং হিন্দুত্বের সামরিকীকরণ'-এর। সংঘ পরিবারের মতে 'হিন্দু জাতির' সংস্কৃতিই হল এদেশের 'জাতীয় সংস্কৃতি'। আর এস এস-এর হিন্দু জাতীয়তাবাদ খোলাখুলিভাবেই যেমন 'হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান'-এর কথা বলে, তেমনই পাশাপাশি তা উচ্চবর্ণের আধিপত্যবাদেরও সমর্থক।

আর এস এস-এর গুরুত্বপূর্ণ এ্যাজেন্ডা হল ভিন্নধর্মের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন মানসিকতা গড়ে তোলা, বিশেষত মুসলমান বিরোধিতা। আর এস এস-এর ঘনিষ্ঠ সংগঠন হিন্দু মহাসভা। প্রসঙ্গত বলা ভালো, ১৯৫০ সালেই হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক মহান্ত দিগ্বিজয় নাথ ঘোষণা করেছিলেন – 'হিন্দু মহাসভা যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে পাঁচ থেকে সাত বছরের জন্য মুসলমানদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হবে। তারা যে ভারতীয় স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করতে চায় এটা বুঝতে সরকারের ওই সময় লাগবে'।

তাঁদের মতে 'হিন্দুজাতির' সংস্কৃতিই এদেশের জাতীয় সংস্কৃতি। সংঘের হিন্দুত্বের ধারণা, হিন্দুধর্মের যে বহু ধারা, তাকে মানে না। সংঘের হিন্দু জাতীয়তাবাদ, খোলাখুলিভাবেই ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতিকে রক্ষা করা ও সমস্ত বাধার বিরুদ্ধে উচ্চবর্ণবাদী 'হিন্দি-হিন্দু' আধিপত্যবাদকে ভারতীয় জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার কথা বলে। তাঁরা দেবনাগরী হরফে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে এদেশের জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার পক্ষে সবসময় জোরালো সওয়াল করেন। মনুস্মৃতি ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের আদলে এক 'হিন্দুরাষ্ট্র' গড়ে তোলা তাঁদের ঘোষিত লক্ষ্য, যেখানে উচ্চবর্ণের প্রভুত্ব ও পুলিশি-রাষ্ট্রের ঘেরাটোপে থাকবে হিন্দুধর্মাবলম্বী অন্যান্য পশ্চাৎপদ জাতি ও দলিত, আদিবাসীসহ ব্যাপক মেহনতি জনতা। সংখ্যালঘু জনগণকে যেখানে সর্বদা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে চরম অনিশ্চয়তায় দিন কাটাতে হবে। শূদ্র এবং নারীদের উপর যেখানে চলবে মনুর অনুশাসন। তাইতো আমরা দেখি, সংবিধান প্রণেতারা মনুস্মৃতিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না বলে, আর এস এস তাদের আপশোসকে তাদের মুখপত্র 'অর্গানাইজার'-এ প্রকাশ্যেই জানাতে ভুলছে না। ভুলে গেলে চলবে না যে, এই মনুস্মৃতিই ভারতবর্ষের জাতি-বর্ণব্যবস্থার তাত্ত্বিক কাঠামো হিসাবে চতুর্বর্ণ-ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, যেখানে জন্মের ভিত্তিতে কর্ম, এই নীতির দ্বারা সমাজে শ্রম বিভাজন হচ্ছে। আগেই আমরা দেখিয়েছি মনুস্মৃতি কীভাবে সমাজে শূদ্র এবং নারীদের অবস্থানকে পশুর স্তরেরও অধম স্থানে পাঠাতে চেয়েছে। সেই মনুর বিধানকেই নবগঠিত সংবিধানের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনতে সর্বদা সওয়াল করছে সংঘ পরিবার!

বলা বাহুল্য, বর্তমান বিজেপি এবং সমগ্র সংঘ পরিবার তাই আজও শুধু এই ব্রাহ্মণ্যবাদের বড়ো পৃষ্ঠপোষকই নয়, পাশাপাশি তারা দলিত এবং অন্যান্য পিছড়ে বর্গের জনগণের উপর অত্যাচারী সমস্ত শক্তির মদতদাতা। বিহারের সানলাইট সেনা, রণবীর সেনার কথা আমরা সবাই

জানি, দলিত এবং অন্যান্য পশ্চাৎপদ বর্গের মানুষকে গণহত্যা করে ধ্বংস করায় যারা সিদ্ধহস্ত। বিহারের রাজনীতিতে এই তারাই আবার বিজেপির প্রধান বাহুবলী শক্তি।

এদের দলিতদের প্রতি ঘৃণার কদর্য পরিচয় মেলে এমন একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে ২০০২ সালের ১৫ অক্টোবর। ওই দিন দয়াচাঁদ, বীরেন্দর, তোতারাম, রাজু ও কৈলাস নামে পাঁচজন দলিত মানুষকে হরিয়ানায় DSP, BDO-সহ পুলিশের বড়ো কর্তাদের সামনে নৃশংসভাবে পিটিয়ে মারা হয়। এই দলিতদের অপরাধ ছিল, তাঁরা চামড়া ব্যবসায়ী এবং তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তাঁরা গো-হত্যাকারী। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার যে, গো-হত্যার দায়ে তাঁদের গ্রেফতার করা হয় এবং তারপর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল, শিবসেনা, গোরক্ষা সমিতি ইত্যাদি হিন্দু সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর নেতৃত্বে থানা থেকে ওই পাঁচজন দলিত মানুষকে টেনে হিঁচড়ে বের করে এনে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করা হয়। প্রতিক্রিয়ায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এই হত্যাকাণ্ডকে 'বীরোচিত কাজ' হিসাবে ঘোষণা করে। এই হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাপতি গিরিরাজ কিশোর বলেন, 'গরুর জীবন মানুষের জীবনের চেয়ে মূল্যবান'। পরে জানা যায় যে এমনকি ওই দলিতরা আদৌ গরু হত্যাও করেন নি, তাঁরা চামড়ার জন্য গো-শবগুলিকে বহন করছিলেন মাত্র। ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকদের রাজত্বে কে না জানে যে গরুর চেয়ে দলিতদের জীবন অনেক কম মূল্যবান!

এই হিন্দুত্বের ঠিকাদার সংঘ পরিবার যে কতখানি জাতি-বর্ণব্যবস্থার সমর্থক, তার প্রমাণ মেলে হিন্দুত্ববাদী নেতাদের নানা বক্তব্যে। যেমন, হিন্দুত্ববাদী এক সংঘনেতা দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একটি বক্তব্য শুনুন, উপাধ্যায় বলছেন – 'চারটি জাত (বর্ণ) সম্পর্কে আমাদের ধারণায় সেগুলো বিরাট পুরুষের (আদি মানব) চারটি অঙ্গ বলে মনে করা হয়। ... এই অঙ্গগুলো শুধু একে অপরের পরিপূরকই নয়, সেগুলোর মধ্যে স্বাতন্ত্র্য, ঐক্যও রয়েছে। রয়েছে স্বার্থ, নিজস্বতা, অস্তিত্বের অভিন্নতা। ...এই ধারণাকে যদি বাঁচিয়ে রাখা না যায়, তবে জাতগুলো পরস্পরের পরিপূরক হয়ে ওঠার চেয়ে সংঘাতের জন্ম দিতে পারে। সেটাই তাহলে বিচ্যুতিই হবে।' (উপাধ্যায়, অখণ্ড মানবতাবাদ, প্রকাশক : ভারতীয় জনসংঘ, পৃষ্ঠা: ৪৩)

সংঘ পরিবারের আরেক প্রধান থিঙ্ক ট্যাঙ্ক গোলওয়ালকর বলেছিলেন – 'কোন উন্নত সমাজ যদি উপলব্ধি করে যে বিদ্যমান তারতম্যগুলোকে বৈজ্ঞানিক সামাজিক কাঠামোর জন্য রয়েছে এবং সেগুলো যদি সমাজরূপ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রূপে দেখা দেয়, তবে এই বৈচিত্র্যকে বিচ্যুতি বলে বিবেচনা করা ঠিক নয়।' (অর্গানাইজার, ১ ডিসেম্বর ১৯৫২, পৃষ্ঠা: ৭)

একই প্রতিধ্বনি শুনব বর্তমান হিন্দুত্ববাদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্যে। ২০০৭ সালে নরেন্দ্র মোদি 'কর্মযোগ' নামে একটি বই লেখেন। সেই বইয়ে 'বাল্মিকী' নামে একটি অস্পৃশ্য জাতির উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা মূলত সমাজের অন্য মানুষের মল-মূত্র পরিষ্কারের কাজের সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে মোদি লিখছেন, 'আমি বিশ্বাস করি না যে তারা কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্য এই কাজ করেন। সেটাই যদি হতো তাহলে তারা কয়েক প্রজন্ম ধরে এই কাজ করে চলত না। তিনি আরো লিখছেন, 'কোন একটি সময়ে কেউ একজন আলোকপ্রাপ্তির মাধ্যমে জেনেছে যে সমগ্র সমাজ ও ভগবানের সুখের জন্য এই কাজ করে যাওয়াটাই তাদের (বাল্মিকীদের)

কর্তব্য; ভগবানের দ্বারা নির্দিষ্ট করা এই কাজ তাদের করে যেতে হবে; তাদের এই আবর্জনা পরিষ্কার করবার কাজ তাদের আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপের অঙ্গ হিসাবেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলা উচিত। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তাদের এই কাজ করে যাওয়াটাই উচিত ছিল। এটা বিশ্বাস করা অসম্ভব যে তাদের পূর্বপুরুষদের অন্য পেশা বা ব্যবসা-বাণিজ্যে যুক্ত হওয়ার সুযোগ ছিল না।'

সংঘ পরিবারের ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, সাভারকরের ক্ষমাভিক্ষা করে ব্রিটিশ সরকারকে লেখা চিঠি, জেল থেকে মুক্তি পাওয়া, 'হিন্দুত্ভ : হু ইজ্ হিন্দু' বইটির প্রকাশ, হেডগেওয়ারের সাথে সাক্ষাৎকার, এদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির তীব্র হওয়া, আর এস এস-এর জন্মলাভ, একটু ভালো করে দেখলে এই সবকিছুর মধ্যেই একটা যোগসূত্র রয়েছে। মুখ্যত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাতকে শক্তিশালী করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। হিন্দু-মুসলিম জনতার ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, আর এস এস-এর চোখে ছিল 'বিকৃত জাতীয়তা'।

হিন্দু জাতীয়তার কাঁঠালের আমসত্ত্ব তৈরি করতে গিয়ে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রকৃত দেশপ্রেমিক আন্দোলনগুলিকে কীভাবে খাটো করেছে বোঝা যায়, গোলওয়ালকর যখন বলেন, 'আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ এবং সাধারণ শত্রুর তত্ত্ব, যা জাতি সম্পর্কে আমাদের ধারণার ভিত্তি, আমাদের বঞ্চিত করেছে প্রকৃত হিন্দু জাতীয়তার ইতিবাচক এবং প্রেরণাদায়ী সারবস্তু থেকে এবং বেশিরভাগ স্বাধীনতা আন্দোলনকে পরিণত করেছে ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে। ইংরেজবিরোধী হওয়াকেই মনে করা হচ্ছে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদ। এই প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা মুক্তিসংগ্রামের সমগ্র গতিপথ, তার নেতা নির্ধারণ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিপর্যয় ডেকে এনেছে'।

এমন একটা মন্তব্য করা মানে ব্রিটিশের হাতকে শক্তিশালী করা নয় তো কী? বস্তুতপক্ষে আর এস এস-এর এবং হিন্দু মহাসভার লক্ষ্যই ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে ফাটল ধরান। গোলওয়ালকরের এই বক্তব্য তা-ই প্রতিষ্ঠা করে। কেননা, গোলওয়ালকর স্পষ্টতই এখানে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের জাতীয়তাবাদের বোধকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' ধারণা বলেছেন এবং পাশাপাশি সাধারণ শত্রুর তত্ত্ব, অর্থাৎ 'হিন্দু-মুসলিমের সাধারণ শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ', এই তত্ত্বকে ক্ষতিকর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আমরা জানি, প্রতিক্রিয়াশীলতা মানেই হল, ইতিহাসের চাকাকে পিছন দিকে টানার অপপ্রয়াস। বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে যারা মনুস্মৃতি এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের আদলে দেশ গড়ার কথা ভাবতে পেরেছিল, তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল না হলে 'প্রতিক্রিয়াশীলতা'র সংজ্ঞাই নতুন করে লিখতে হয়! অথচ ভাবুন, এই হিন্দুত্ববাদীদের কত বড়ো স্পর্ধা! এঁরাই প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের জাতীয়তাবাদী চিন্তাকে কিনা বলছে 'প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা'!!

ঘটনা হল এটাই যে, যখন সমস্ত ভারত ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে উত্তাল, তখন সংঘ পরিবার সচেতনভাবে এই সংগ্রামগুলো থেকে দূরে দূরে থেকেছে। তারা তখন প্রচার করেছে ব্রিটিশ নয়, মুসলমানরা এদেশের প্রধান শত্রু। তারাই হল 'প্রকৃত বিদেশি'। এদেশে জন্মালেও তারা এদেশকে 'পবিত্রভূমি' মনে না করে আরবকে 'পবিত্রভূমি' বলে মনে করে। মুসলমান

শাসন একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন শাসন ইত্যাদি ইত্যাদি। যখন দেশের একটা বড়ো অংশের যুব-বাহিনী ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে আত্মত্যাগ করছে, হিন্দুত্ববাদীরা তখন ব্যস্ত থেকেছে 'গো-রক্ষা আন্দোলনে'! স্বভাবতই তাদের এই কার্যকলাপ ব্রিটিশের 'ডিভাইড্ অ্যান্ড রুল' নীতিকেই সফল করতে সাহায্য করেছিল।

ডি আর গয়াল নামক একজন আর এস এস-এর ঘোরতর সমালোচক, যিনি ১৯৪২ সাল অবধি ছিলেন আর এস এস-এর স্বেচ্ছাসেবক, তাঁর 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ : পয়জনাস্ ট্রি' বইটিতে আর এস এস-এর এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন থেকে নিজেদের কর্মীকে বিরত রাখার বিষয়টিকে ফাঁস করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, স্বেচ্ছাসেবীদের ব্রিটিশ বিরোধিতা থেকে নিবৃত্ত করতে বলা হত — 'আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। সুযোগ আসবে। আমাদের উচিত, সেই সময়ের জন্য আমাদের শক্তি সঞ্চয় করে রাখা।'

ব্রিটিশ সরকারের চোখে আর এস এস-এর কার্যকলাপ কী রকম ছিল? ৭ অগাস্ট ১৯৪২ সালের একটি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এ.এস. স্বাক্ষরিত একটি রিপোর্ট বলছে, 'যতক্ষণ তারা আইন অমান্যের মত হুমকিকে সমর্থন না করছে, ততক্ষণ অবধি তাদের কার্যকলাপকে গুরুত্ব দিতে হবে না'। আর এস এস সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আরেকটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'কংগ্রেসী গোলমালের সময় সংঘের সভাগুলিতে বক্তারা সদস্যদের বলেন কংগ্রেসের আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকতে এবং সাধারণভাবে কর্মীরা তা পালন করেন।'

সেন্ট্রাল প্রভিনেন্স সরকারকে লেখা ৭ জানুয়ারি ১৯৪৪-এর আই বি-র রিপোর্টে আর টটেন্হ্যাম জানাচ্ছেন যে প্রস্তাব করা হয়েছে — গোলওয়ালকরকে সতর্ক করে দেওয়া হোক 'এই সংগঠনের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের মধ্য রাখতে, কিন্তু দেখা গেছে তিনি নিজেই না চটাতে ব্যতিব্যস্ত, তাই আমরা এই প্রস্তাব না ধরে এগোনোর সিদ্ধান্ত নিলাম'।

১৯৪০ সালে যখন কংগ্রেস সত্যাগ্রহ করে, তখন আর এস এস-এর নেতা অভয়ংকরের সাথে তৎকালীন বম্বের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বৈঠক হয়। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, সংঘ স্বেচ্ছাসেবীদের বৃহত্তর সংখ্যায় সিভিক গার্ডে নিযুক্ত হতে উৎসাহিত করবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সাভারকর ব্রিটিশের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য এবং ব্রিটিশদের প্রতি সার্বিক সাহায্যের জন্য হিন্দুদের কাছে আবেদন করেছিলেন। এদিকে আবার হিটলারের প্রশস্তিও তাঁরা করেছেন! কী দ্বিচারিতা!

ঘটনা হল এটাই যে, ভারতবর্ষে যতবারই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছে, ততবারই সংঘ পরিবারের কাজকর্মে ভাঁটা পড়েছে, কিন্তু কংগ্রেস এবং গান্ধিজির মতো নেতৃত্বের বারবার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে আন্দোলন ধাক্কা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার এই সব অশুভ শক্তি দেশের নানা প্রান্তে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র তাঁর 'আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ' বইটিতে খুব চমৎকারভাবে তা তুলে ধরেছেন। বিপান চন্দ্র লিখছেন — 'এটা লক্ষণীয় যে যখন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের জোয়ার আসত, যখন আশার দিন দেখা যেত, তখন সাম্প্রদায়িকতা পিছু হঠত, আর যখন এই সংগ্রামে ভাঁটা দেখা দিত এবং আশা ব্যর্থ হত তখন তা জোয়ারের মত এগিয়ে যেত। এইভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তিনটি প্রধান

ঢেউয়ের সময়ে সাম্প্রদায়িকতা ছিল সুপ্ত। ১৯১৮ থেকে ১৯২২ বছরগুলি ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও হিন্দু মুসলিম ঐক্য, উভয়েরই সুখকর সময়। ১৯২৬-এর পর বামপন্থার উত্থান, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এবং যুব আন্দোলনের বৃদ্ধি, এবং সাইমন কমিশন বিরোধী প্রতিবাদ আন্দোলন আবার জনগণকে উদ্দীপিত করে এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা কমিয়ে দেয়। ১৯৩০–৩৪–এ আইন অমান্য আন্দোলন গোটা দেশে ঝড় বইয়ে দেয়। হিন্দু ও মুসলিম সকলেই ব্যাপক সংখ্যায় এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। সাম্প্রদায়িক দলগুলি ও নেতারা হয় কার্যত অবসর গ্রহণ করেন অথবা ইতস্ততভাবে জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন করেন।' বিপান চন্দ্র আরো দেখিয়েছেন – "সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সক্রিয় হত কেবল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন তার নিষ্ক্রিয় পর্যায়গুলিতে অবতীর্ণ হলে। ১৯২২-এর পর এবং ১৯৩৪-এর পর, আইনসভার কাজ এবং গঠনমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে কাজ সত্ত্বেও, জাতীয় নেতৃত্ব জনগণের রাজনৈতিক শক্তির জন্য খুব কমই বহির্গমন পথ সরবরাহ করতে পেরেছিলেন। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে এমনকি সেরকম পথও ছিল না। এক বছরে স্বরাজ আসার স্বপ্ন হঠাৎ ভেঙে যাওয়ায় আশাহত, বিক্ষুব্ধ ও মোহমুক্ত হওয়ায় জনগণ দেখলেন যে তাঁরা এক ইতিহাসবিদের ভাষায় 'সেজেগুজে তৈরী হয়েছেন কিন্তু যাওয়ার কোন জায়গা নেই।' তার ফলেই সাম্প্রদায়িক তিক্ততা মাথা তোলার জন্য উপযোগী শর্তাবলী সৃষ্টি হয়েছিল।"

আর এস এস নীতিগতভাবেও ফ্যাসিবাদের প্রকাশ্য সমর্থক, সাংগঠনিকভাবেও তা-ই! ১৯৩১ সালে সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বি এস মুঞ্জে ফ্যাসিবাদের প্রতিষ্ঠাতা মুসোলিনির সঙ্গে দেখা করেন এবং তাকে বলেন – 'হে মহামহিম, আপনাদের বালিল্লা বা ফ্যাসিবাদী সংগঠনগুলির প্রশংসায় আমি ভারত বা ইংলন্ডের যে কোনো মঞ্চ থেকে সোচ্চার হতে দ্বিধা করব না। তাদের প্রতি থাকল আমাদের শুভেচ্ছা ও সফলতার কামনা'। ১৯৩৮ সালে গোলওয়ালকর হিটলারের শাসনের সপক্ষে লিখছেন, 'জার্মানদের জাতীয় গৌরব তখনকার আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। তার নিজের জাতি এবং সংস্কৃতির রক্ষায় ইহুদিদের মতো সেমিয় জাতিগুলোকে তার দেশ থেকে নির্মূল করে জার্মানরা বিশ্বকে একেবারে চমকে দিয়েছে। জাতীয় গৌরবের সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ এখানে দেখা গেছে। জার্মানী আরো দেখিয়ে দিয়েছে যে মূলেই যারা পৃথক সেই সব জাত (race) ও সংস্কৃতিগুলোকে একটি ঐক্যবদ্ধ সম্পূর্ণতায় নিয়ে আসা কতটা অসম্ভব। এ শিক্ষা হিন্দুস্তানে আমাদের নিয়ে আসতে হবে এবং সাফল্য লাভ করতে হবে'।

ভাবুন, যখন ফ্যাসিস্ট শাসনে ও নাৎসি শাসনে দুনিয়া জুড়ে মানবতা ভূলুণ্ঠিত, যখন হিটলারের ইহুদিদের উপর সীমাহীন অত্যাচার এবং গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে ইহুদি জনগণসহ ব্যাপক জনতাকে হত্যা করার বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে মানুষ নিন্দামুখর, তখন গোলওয়ালকর এবং মুঞ্জের মতো নেতারা, এই শাসনের নামে বর্বরতায়, চমৎকৃত হচ্ছেন!

শুধু তাই নয়, হিটলারের নাৎসি নীতিতে আকৃষ্ট হয়ে গোলওয়ালকর লিখছেন, 'ভারতে যে সব বিদেশি জাতিবংশ আছে তারা হয় হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাষা আয়ত্ত করবে, হিন্দু ধর্মকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে দেখতে শিখবে, হিন্দু জাতির ও সংস্কৃতির গৌরব বাড়ানো ছাড়া অন্য কিছু ভাববে না, অন্যথায়, তাদের হিন্দু জাতির অধীনস্থ হয়ে থাকতে হবে, কিছু দাবি করা চলবে না, কোনও

সুবিধা চাওয়া চলবে না, বিশেষ সুবিধা তো নয়ই – এমনকি তাদের নাগরিক অধিকারও থাকবে না।'

সাভারকরও কথায় কথায় হিটলারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেন। ১৯৩৮ সালে আমরা দেখব সাভারকর বলছেন, একটা দেশে জাতি গঠন হয় সে-দেশের সংখ্যাগুরু জনগণকে নিয়েই। মুসলমানদের ক্ষেত্রে তিনি বলছেন, জার্মানিতে হিটলারের পলিসির অনুসরণ করতে। তাঁর ভাষাতে – 'ইহুদিদের ক্ষেত্রে জার্মানীতে কী করা হয়েছিল? সংখ্যালঘু হিসাবে তাদের জার্মানী থেকে স্রেফ তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।' ভাবুন সাভারকরের চিন্তাধারা কতটা বিপজ্জনক!!

এমনকি তথাকথিত হিন্দুত্ববাদীরা দাবি করেন হিটলার একজন হিন্দু। তাঁরা হিটলারকে 'বিষ্ণুর দশম অবতার'ও কখনো কখনো বলে থাকেন! হিন্দু মহাসভার নেতা শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দই এমনটা দাবি করে এসেছেন বহুদিন। আজও যদি দেখি, মোদির মুখ্যমন্ত্রিত্বে গুজরাতের ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে আমরা হিটলার বন্দনার অপচেষ্টা দেখতে পাব। যদিও প্রবল জনমতের চাপে মোদি সরকারকে পরে এই অপচেষ্টা থেকে বিরত থাকতে হয়েছে।

সংঘ পরিবারের 'হিন্দুত্বের' মতাদর্শ শুধুমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই সেবা করেনি, মনে রাখতে হবে দেশীয় মুৎসুদ্দি পুঁজিপতি এবং সামন্ত জমিদারেরাও ছিল তাদের বড়ো পৃষ্ঠপোষক। মদনমোহন মালব্যের মতন সংঘ নেতাদের সঙ্গে ঘনশ্যাম দাস বিড়লার ঘনিষ্ঠ সখ্যতা ছিল। মালব্যের 'দ্য লিডার' পত্রিকাটির আর্থিক পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জি ডি বিড়লা। পদ্মরাজ জৈন নামক একজন মাড়োয়ারি মুৎসুদ্দি ছিলেন তিরিশের দশকে বাংলা প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সম্পাদক। ১৯৩৯ সালের শেষের দিকে কলকাতায় সারা ভারত হিন্দু মহাসভার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাকে সফল করতে বিড়লা, স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা, শেঠ বংশীধর জালান, ডি পি খৈতান, রাধাকিষান কানোরিয়া প্রমুখ বড়ো বড়ো মাড়োয়ারি বানিয়ারা প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন।

ধর্মের ভিত্তিতে বাংলাভাগের জন্য প্রথম সোচ্চার হয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসের তৎকালীন নেতা শরৎচন্দ্র বোস (নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের দাদা) এবং তৎকালীন মুসলিম লিগের বাংলা কমিটির নেতারা প্রাথমিকভাবে যে কোনো মূল্যে বাংলাভাগ আটকানোর পক্ষে ছিলেন। প্রয়োজনে হিন্দু-মুসলিম আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদ গঠনের বিকল্প প্রস্তাবও তাঁরা দিয়েছিলেন, এছাড়াও তাঁদের আরেকটা বিকল্প প্রস্তাব ছিল, ভাগ না করে বাংলাকে একটা পৃথক রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়া হোক, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও এদেশের বৃহৎ মুৎসুদ্দি পুঁজি তাদের শ্রেণীস্বার্থে বাংলা বিভাজনে অনড় ছিল। তাদের পক্ষে সেদিন ছিলেন এই হিন্দুত্ববাদী নেতারা। ১৯৪৭ সালের ১৯ মার্চ হিন্দু মহাসভার সভাপতি একটি প্রেস-বিবৃতি দিয়ে বলেন যে, 'প্রদেশ যে ধরণের গভীর সাম্প্রদায়িক সমস্যায় জর্জরিত, তার একমাত্র শান্তিপূর্ণ সমাধান বাংলা বিভাজন'। একই বছর ৩০ এপ্রিলের একটি সভায় হিন্দু বৃহৎ পুঁজির মালিকরা বঙ্গভঙ্গের দাবি তোলেন। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন বিড়লা, বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা, জালান, এম এল শ, ডি সি ড্রাইভার প্রমুখ মুৎসুদ্দি বড়ো পুঁজির মালিকরা। ১৯৪৭ সালের ৫ জুন প্যাটেলকে লেখা একটি চিঠিতে বিড়লা জানান যে, 'আমি খুশি এই দেখে যে বাংলা বিভাজনের সমস্যা আপনারা সমাধান করেছেন'।

মধ্যভারতের সামন্ত-জমিদারদের একটা বড়ো অংশ সংঘ পরিবারকে মদত করত। এক্ষেত্রে পরস্পরের স্বার্থ ছিল বিজড়িত। 'সারাভারত জমি মালিক ও জায়গিরদার সমিতি'র নেতাদের মদতে হিন্দু মহাসভার নেতা দেশপান্ডে ১৯৫২ সালে দুটি লোকসভা থেকে নির্বাচিত হন। কংগ্রেসও ছিল সামন্তদের স্বার্থেরই প্রতিনিধি। কিন্তু কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলন তীব্র হওয়ায় তাদেরও কিছু লোক-দেখানো ভূমিসংস্কার কর্মসূচি, অন্ততপক্ষে কাগজে কলমে হলেও নিতে হচ্ছিল। ১৯৫৯ সালে তারা তাদের নাগপুর অধিবেশনে ভূমিসংস্কারের কথা ঘোষণা করে এবং কৃষকদের মধ্যে জমি বিলির কথা বলে। ওই বছরই মধ্যপ্রদেশ সরকার জমির ঊর্ধ্বসীমা ২৫ একর বেঁধে দিয়ে আইন পাশ করে। কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনের প্রস্তাব এবং মধ্যপ্রদেশ সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনসংঘ সর্বভারতীয় স্তরে প্রচারাভিযান চালায়। প্রায় ৫৫ হাজার গ্রামে তারা সভাসমিতি করে। এই ঘটনাগুলোই প্রমাণ করে এদেশের সামন্ত জমিদারদের স্বার্থের প্রতি সংঘ পরিবার কতখানি দায়বদ্ধ ছিল! শ্রেণীসমাজে প্রত্যেকটি মতাদর্শেরই কোনো না কোনো শ্রেণীভিত্তি থাকে। সংঘ পরিবারেরও নির্দিষ্ট শ্রেণীভিত্তি আছে। মতাদর্শগতভাবে একটু গভীর বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে, তাদের শ্রেণীভিত্তি হল সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ এবং এদেশের মুৎসুদ্দি বৃহৎ পুঁজিপতি শ্রেণী।

আর এস এস যে সময় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, প্রায় একই সময় আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি। শুরু থেকেই কট্টর কমিউনিস্ট-বিরোধী অবস্থান নিয়েছে আর এস এস। কমিউনিস্টদের সব সময়ই তারা 'জাতীয়তাবিরোধী' বলেই প্রচার চালাত এবং প্রচার করত যে কমিউনিস্টরা শ্রেণীসংগ্রামের নামে হিন্দু ঐক্যে ফাটল ধরাচ্ছে। সংঘ নেতারা প্রকাশ্যেই বলতেন, কমিউনিস্টরা আমাদের দীর্ঘস্থায়ী শত্রু। প্রথমবার নিষিদ্ধ হবার পর গোলওয়ালকর নেহেরুকে এই মর্মে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, কমিউনিস্ট বিপদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য তরুণদের উদ্বুদ্ধ করতে সংঘ কংগ্রেস সরকারের প্রধান সহায়ক হতে পারে।

সংঘের অন্যতম থিঙ্ক ট্যাঙ্ক গোলওয়ালকরের লেখা পড়লে তাঁর উগ্র সাম্প্রদায়িক মানসিকতার প্রতিফলন পাওয়া যায়। যেমন 'আ বাঞ্চ অফ্ থটস্' বইটিতে তিনি বলছেন, 'হজরত মহম্মদ কোনদিনই ঈশ্বরকে মুখোমুখি দেখেননি। এই ভূখণ্ডের সন্তানদেরই একমাত্র সৌভাগ্য যে তারা ভগবানকে তাঁর পূর্ণ উজ্জ্বল মহিমায় প্রত্যক্ষ করবে'। একইভাবে উক্ত গ্রন্থে তিনি মাও সে-তুঙের নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক চীনকেও আক্রমণের নিশানায় এনেছেন। বলেছেন, 'চীন-পাকিস্তান একযোগে ভারত আক্রমণ করুক, এমন একটা দিনের জন্য আমরা সর্বান্তকরণে প্রার্থনা করব। ...স্বাধীনতা ও সম্মানের সঙ্গে শান্তির জন্য এই মূল্য আমাদের দিতে হবে আর সে মূল্য যত তাড়াতাড়ি দেওয়া যায় ততই মঙ্গল'।

আর এস এস তার প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই মিথ্যাচার করে আসছে। তাদের হিন্দুত্ববাদী এ্যাজেন্ডাকে বাস্তবায়িত করতে তারা 'আপন মনের মাধুরী মেশানো' তত্ত্ব নির্মাণে একেবারে ওস্তাদ। 'আর্যরা ভূমিসন্তান' — এই প্রচারের সপক্ষে যেমন আর এস এস-এর প্রধান তাত্ত্বিক নেতা গোলওয়ালকরের একটা কাল্পনিক 'তত্ত্ব' আছে। তিনি তাঁর 'উই' বইটিতে বলছেন, 'বেদের সুমেরু অঞ্চলের অবস্থান ছিল বাস্তবত হিন্দুস্তানেই এবং হিন্দুরা সে দেশে অভিপ্রয়াণ করেনি, বরং সুমেরু অঞ্চলই অভিপ্রয়াণ করে হিন্দুদের হিন্দুস্তানে রেখে চলে যায়। ...আমরা হিন্দুরা

কোথা থেকেও এদেশে আসিনি। স্মরণাতীত কাল থেকে আমরা এমাটির সন্তান ও এদেশের স্বাভাবিক প্রভু।' গোলওয়ালকরের এই কাল্পনিক 'তত্ত্ব'কে প্রতিষ্ঠা করতে পরবর্তীতে হিন্দুত্ববাদী ইতিহাসবিদরা কী ঐকান্তিক প্রয়াস আজও জারি রেখেছেন এবং ইতিহাস বিকৃতি ঘটিয়ে চলেছেন, তা আগেই বলেছি।

হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো : হিন্দু মহাসভা, আর এস এস, জনসংঘ, বিজেপি

উগ্র হিন্দুত্ববাদী চিন্তার প্রসার দেখা যায় আঠারোশো শতকের শেষ দিক থেকেই। বঙ্কিম-সাহিত্যে তার প্রতিফলন নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। ১৮৮২ সালে উত্তরপ্রদেশের 'ব্রাহ্মণ' নামক একটি মাসিকপত্রের সম্পাদক প্রতাপ নারায়ণ মিশ্র প্রথম তাঁর একটি কবিতায় 'হিন্দি-হিন্দু -হিন্দুস্তানে'র আওয়াজ ওঠান। হিন্দি সাহিত্যিক ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র এবং রাধাচরণ গোস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত হিন্দি মাসিকপত্রেও উগ্র মুসলমান বিরোধিতা শুরু হয়। তিলক প্রবর্তিত শিবাজী উৎসবেও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার প্রভূত ইন্ধন লক্ষ করা যায়। ওই সময় থেকেই প্রথম ছোটো ছোটো হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি মাথাচাড়া দিতে থাকে। ১৮৭৫ সালে 'আর্যসমাজ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাঁরা 'শুদ্ধি আন্দোলন' চালিয়ে ধর্মান্তরিত মুসলিমদের পুনরায় হিন্দুকরণ করতে থাকেন। সমসাময়িক কালেই ১৮৮০ সালে 'গোরক্ষিনী সভা'র প্রতিষ্ঠা হয় পঞ্জাবে, যাঁরা গোহত্যার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে থাকেন। এই সময় থেকে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি এবং দাঙ্গা প্রকোপ বাড়তে থাকে। ১৮৮২ সালে লাহোরে নবীনচন্দ্র রায় এবং চন্দ্রনাথ মিত্রের উদ্যোগে 'হিন্দু মহাসভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৯ সালে পঞ্জাবে লাল বাহাদুর লালচাঁদের উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'হিন্দু সভা'। ১৯১৫ সালে বি এস মুঞ্জে, মদনমোহন মালব্য প্রমুখের নেতৃত্বে 'টি সংগঠন এলাহাবাদে মিলিত হয়ে গড়ে ওঠে সর্বভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সংগঠন 'হিন্দু মহাসভা'। ১৯২৩ সালে বেনারসের অধিবেশনে হিন্দু মহাসভা হিন্দুদের 'আত্মরক্ষা বাহিনী' গড়ে তোলার চিন্তাভাবনা শুরু করে। কিন্তু সে-সময় হিন্দুত্ববাদী সংগঠন দুর্বল ছিল। ১৯৩৭ সালে সাভারকর হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু তার আগেই সাভারকরের সাথে সদাশিব বলিরাম হেডগেওয়ারের সাক্ষাৎ ঘটে গেছে। হেডগেওয়ার সাভারকরের হিন্দুত্বের তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ফলত ১৯২৫ সালেই তিনি আর এস এস-এর প্রতিষ্ঠা করেছেন। পরবর্তীতে ১৯২৭ সালে বি এস মুঞ্জে একে পুনঃসংগঠিত করেন। তার আগেই অবশ্য হেডগেওয়ার অফিসার প্রশিক্ষণ শিবির চালু করেন এবং সংঘের 'প্রচারক দল' (হোল্ টাইমার) গড়ে তোলেন। হিন্দু মহাসভা এবং আর এস এসের সম্পর্ক বোঝার জন্যই জেনে রাখা দরকার, এই মুঞ্জে ছিলেন আবার হিন্দু মহাসভার এক নেতা। ১৯৪০ সালে আর এস এস-এর সরসংঘচালক হন সদাশিব গোলওয়ালকর। শুরু থেকেই আর এস এস সংগঠনটি শুধু মাত্র উগ্র হিন্দুত্বের জিগির তুলেই ক্ষান্ত ছিল না, উপরন্তু তারা বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোতেও মুখ্য ভূমিকা রাখছিল। ১৯৪৭ সালে দেশজুড়ে যে দাঙ্গা ঘটে তাতেও, বিশেষত পঞ্জাব ও দিল্লির দাঙ্গায় সংঘের ভূমিকার কথা মৌলানা আবুল কালাম আজাদের লেখা বইয়ে (ডিভাইডেড্ ইন্ডিয়া) বিস্তারিতভাবেই উল্লেখ আছে। এছাড়াও এইচ আর কুরেশির 'পার্টিশন্ অফ্ ইন্ডিয়া' বা ডি আর গোয়েলের 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ : পয়জনাস্ ট্রি' বইদুটিতেও এব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

১৯৪৮ সালের ১২ জানুয়ারি দাঙ্গা প্রতিরোধে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-সহ বারো দফা দাবিতে গান্ধিজি অনশন শুরু করলে, সংঘ পরিবার গান্ধিজির বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি, দিল্লিতে বিড়লা হাউসে একটি প্রার্থনা সভায় সংঘের সদস্য নাথুরাম গ সে গান্ধিকে হত্যা করে। এর আগেও অবশ্য তারা গান্ধিজিকে হত্যার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, কিন্তু প্রথমবার তা ব্যর্থ হয়। যদিও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ কখনোই প্রকাশ্যে নাথুরাম গড্‌সেকে তাদের সদস্য হিসাবে প্রকাশ্যে স্বীকার করেনি, তথাপি গান্ধি-হত্যার পর খুশি হয়ে, বহুজায়গায় তারা উল্লাসে মন মন লাড্ডু বিতরণ করেছিল। পাল্টা প্রতিক্রিয়ায়, বহু জায়গায়, গান্ধি-হত্যার কারণে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের উপর সে-সময় জনতাও স্বতঃস্ফূর্ত আক্রমণ চালিয়েছিল। বহুস্থানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শাখা কার্যালয়গুলি তারা কার্যত ভেঙেও দিয়েছিল। অবশেষে ১৯৪৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আর এস এস নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। প্রচুর কঠোর নিয়মানুবর্তিতা থাকা সত্ত্বেও নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার পর আর এস এস-এর সাংগঠনিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কেননা, সরসংঘচালক গোলওয়ালকরসহ সারা দেশে তাঁদের প্রায় ২০ হাজার কর্মী সেই সময় গ্রেফতার হয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে ১৯৪৮ সালে ডিসেম্বরে গোলওয়ালকরের ডাকে দেশজুড়ে আর এস এস কর্মীরা সত্যাগ্রহ শুরু করেন। কংগ্রেসের বিশেষ ঘনিষ্ঠ ঘনশ্যাম দাস বিড়লার মধ্যস্থতায় কংগ্রেস ও গোলওয়ালকরের মধ্যে আলোচনা সংঘটিত হয়। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারিতে সেই সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করা হয়। অবশেষে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নির্দেশমতো আর এস এস'কে একটি লিখিত সংবিধান গ্রহণ করতে, সমস্ত সদস্যদের নাম, ঠিকানা লিপিবদ্ধ করার জন্য রেজিস্ট্রেশন চালু করতে এবং নাবালকদের সংগঠনের শাখায় ভর্তি না করতে এবং শুধুমাত্র একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসাবে কাজ করতে হবে বলে শর্ত আরোপ করা হয়। এই মর্মে তারা চুক্তিবদ্ধ হলে, ১৯৪৯ সালের ১২ জুলাই কেন্দ্রীয় সরকার তাদের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়। সরকারি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর থেকে আর এস এস-এর অভ্যন্তরে প্রকাশ্য রাজনীতিতে যুক্ত হবার দাবি তীব্র হতে থাকে।

এদিকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যু এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে আর এস এস সদস্যদের সদস্যপদ বাতিলের প্রস্তাবের পর কংগ্রেসের মধ্যে সংঘ সদস্যদের অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়। অন্যদিকে হিন্দু মহাসভা থেকে এবং একইসাথে নেহেরু মন্ত্রীসভা থেকে ১৯৫০ সালে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পদত্যাগ করেন। তাঁর উগ্র হিন্দুত্ববাদী বক্তব্যের সাথে আর এস এস-এর বক্তব্যের অন্তর্বস্তুগত সাদৃশ্যের কারণে এই সময় তাঁরা পরস্পরের কাছাকাছি আসেন। ১৯৫১ সালের মে মাসে পঞ্জাবের জলন্ধরে গোলওয়ালকর এবং শ্যামাপ্রসাদের মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে একটি বৈঠকে ঐকমত্য তৈরি হয়, তারপর উভয়ের উদ্যোগে 'ভারতীয় জনসংঘ'-এর পঞ্জাব প্রাদেশিক কমিটি তৈরি হয়। পরে আর এস এস-এর সহায়তায় আরো কয়েকটি রাজ্যে জনসংঘের রাজ্যকমিটি গঠিত হয়। প্রতিটি কমিটিরই বেশ কিছু নেতৃত্বকারী পদ আর এস এসকে ছাড়তে হত। অবশেষে সর্বভারতীয় কমিটি তৈরি হলে সর্বসম্মতভাবে শ্যামাপ্রসাদকে সভাপতি এবং আর এস এস-এর প্রচারক ভাই মহাবীর, সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। কার্যকরী সমিতির মধ্যে বলরাজ মাধব, দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রমুখ আর এস এস

সদস্যরা গৃহীত হন। ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, 'ভারতীয় সংস্কৃতি'-কে প্রতিফলিত করে এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা, যোগাযোগ রক্ষাকারী ভাষা (দেবনাগরী হরফে লেখা হিন্দি) প্রবর্তন, জম্মু ও কাশ্মীরের পুরোপুরি ভারতভুক্তি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যেকোনো রকম বিশেষ অধিকার বাতিল করে 'জাতীয় সংহতি' গড়ে তোলা হবে।

১৯৫৩ সালের ১১ মে শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরে প্রবেশ করলে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। বন্দি অবস্থায় ২৯ জুন তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর এই মৃত্যু নিয়ে সংঘের পক্ষ থেকে কংগ্রেসকে দায়ী করা হলেও, এব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ এখনো অবধি পাওয়া যায়নি। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পর জনসংঘের অন্তর্বর্তী সভাপতি হিসাবে মৌলিচরণ শর্মা এক বছরেরও কিছু বেশিদিন কাজ করার পর ১৯৫৪ সালের নভেম্বর মাসে এস এ সোনিকে সভাপতির এবং দীনদয়াল উপাধ্যায়কে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই সময় থেকেই জনসংঘের উপর আর এস এস-এর সর্বময় নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়। উক্ত কার্যনির্বাহী কমিটিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন তৎকালীন আর এস এস-এর প্রচারক অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবানি, ভৈরো সিং শেখায়ত, বলরাজ মাধো, নানা দেশমুখ, সুন্দর সিং ভান্ডারির মতো নেতারা।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, গোলওয়ালকরের উদ্যোগে আর এস এস-এর প্রশিক্ষিত নেতারাই ১৯৬৪ সালে বিভিন্ন হিন্দু ধর্মীয় সংগঠন এবং ধর্মীয় নেতাদের ঐক্যবদ্ধ করে 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ' গড়ে তোলেন, যাঁরা আবার পরে 'বজরং দল', 'দুর্গা বাহিনী'র মতো সংগঠনগুলি গড়ে তোলেন। ষাটের দশকের শেষদিকে, একদিকে যেমন তারা উগ্র হিন্দুত্বের জিগির তুলতে গোহত্যা বিরোধী আন্দোলন শুরু করছে, পাশাপাশি কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রতিরোধে তারা চীনবিরোধী জিগির তুলেছিল। শ্রমিক, ছাত্র-যুবদের মধ্যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রভাব ঠেকাতে তারা গড়ে তুলেছে ছাত্রফ্রন্ট (অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ), শ্রমিক ফ্রন্ট (ভারতীয় মজদুর সংঘ)।

১৯৭৩-৭৪ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে সারা দেশব্যাপী ইন্দিরা সরকার-বিরোধী আন্দোলন যখন তুঙ্গে উঠেছে, সংঘ পরিবার তখন সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে যুক্ত হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন আবার আর এস এস-কে নিষিদ্ধ করা হয়। ওই সময় আর এস এস একদিকে যেমন জয়প্রকাশকে 'জনতা পার্টি' গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে, পাশাপাশি আবার ইন্দিরার সাথে গোপন সমঝোতারও চেষ্টা চালিয়েছে। ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা সরকারের পতন হলে, নতুন জনতা সরকার এসে আর এস এস-এর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। এই সময় জয়প্রকাশের পরামর্শে প্রাক্তন জনসংঘীরা সবাই জনতা দলে যুক্ত হয়ে যান। এটা ছিল এমন একটা সময় যখন বিপুল ভোটে কংগ্রেসকে হারিয়ে জনতা পার্টি কেন্দ্রে ক্ষমতায় বসেছে, ফলত বেশ কিছু জনসংঘী নেতা, যেমন অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবানি, ব্রিজলাল ভার্মা প্রমুখ সংঘ নেতারা জনতা সরকারের মন্ত্রী নির্বাচিত হন। এঁরা সবাই জনতা পার্টিতে যোগ দিলেও আর এস এস এস-এর সঙ্গে এঁদের সাংগঠনিক সম্পর্ক সবসময়ই বজায় ছিল। যেহেতু আর এস এস একটা স্বাধীন সংগঠন, তাছাড়া তাদের উগ্র হিন্দুত্ববাদী এ্যাজেন্ডার জন্য এবং ১৯৭৮ সালে আলিগড় দাঙ্গা এবং ১৯৭৯ সালে জামশেদপুর দাঙ্গায় অংশগ্রহণের অভিযোগও আর এস এস-এর বিরুদ্ধে ছিল, ফলত স্বাভাবিকভাবেই জনতা পার্টির অভ্যন্তরে প্রাক্তন জনসংঘীদের উপস্থিতি নিয়ে অন্যান্য অংশের মধ্যে, বিশেষত গণতান্ত্রিক সমাজবাদীদের চাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তাই

পরবর্তীতে জনতা দল থেকে প্রাক্তন জনসংঘীদের বেরিয়ে আসা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। বস্তুত এই সব টানাপোড়েনে ১৯৭৯ সালে জনতা পার্টি ভেঙে যায় এবং প্রাক্তন জনসংঘীরা মিলিত হয়ে গড়ে তোলেন নতুন রাজনৈতিক দল 'ভারতীয় জনতা পার্টি' তথা বিজেপি।

সংঘ পরিবার নিয়ে বলতে গেলে তাদের সাম্প্রতিক কালের বিদেশ যোগাযোগের ব্যাপারে কিছু বলতেই হয়। বিগত তিনদশক ধরে আমেরিকা-সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী এদেশীয়দের একাংশের মধ্যে ভারতকে হিন্দুকরণের জন্য একটা আন্দোলন সক্রিয় হয়ে উঠেছে, গোটা দক্ষিণ এশিয়া জুড়েই যা ক্রমশ জমি পাচ্ছে। হিন্দু স্বয়ংসেবক সংঘ (এইচ এস এস), বিশ্ব হিন্দু পরিষদ অফ্ আমেরিকা, সেবা ইন্টারন্যাশনাল অফ্ ইউ এস এ, একল বিদ্যালয় ফাউন্ডেশন ইউ এস এ, ওভারসিজ্ ফ্রেন্ড অফ ভারতীয় জনতা পার্টি ইউ এস এ ইত্যাদি বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে দিয়ে এই প্রক্রিয়াটি সক্রিয়। এদের মধ্যে হিন্দু স্বয়ংসেবক সংঘ (এইচ এস এস), বিশ্ব হিন্দু পরিষদ অফ আমেরিকা সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। তারা নিয়মিত শিবির পরিচালনা করে, হিন্দু স্বয়ংসেবক সংঘ (এইচ এস এস)-এর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী ২০১৪ সালে দাঁড়িয়ে প্রায় ১৪০টি শাখা তারা পরিচালনা করে থাকে, যদিও শুরুতে ২০০২ সালে এই শাখার সংখ্যা ছিল মোটে ৩০টি। যুব সাংস্কৃতিক কর্মসূচি এবং পরিবার শিবির পরিচালন কর্মসূচিতে তারা ২০০২ সাল থেকে ২০১৪ সালের মধ্য প্রায় ২.৫ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে, যার মধ্যে দিয়ে তারা ইতিহাসকে বিকৃত করা এবং উচ্চবর্ণীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতিকে গৌরবান্বিত করার কাজটি ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে গেছে। চালিয়ে যাচ্ছে উগ্র হিন্দুত্বের জিগির তোলার কাজটিও। এছাড়াও আমেরিকায় সংঘের ছাত্রশাখাও রয়েছে, যার নাম হিন্দু স্টুডেন্টস্ কাউন্সিল। কানাডা এবং আমেরিকার প্রায় ৭৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁদের কর্মীরা পড়াশুনা করেন। ইন্ডিয়ান ডেভল মেন্ট অ্যান্ড রিলিফ্ ফান্ড, একল বিদ্যালয় ফাউন্ডেশন অফ্ আমেরিকা, পরম শক্তি পীঠ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ অফ্ আমেরিকা, সেবা ইন্টারন্যাশনালের মতো পাঁচটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তারা প্রায় ৫৫ মিলিয়ন ডলার খরচ করেছে তাদের বহুবিধ কর্মসূচির জন্য। হিন্দুত্ববাদীরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং গবেষণার কাজে অনুপ্রবেশ করছে। বিশেষত, ইতিহাস এবং ধর্ম গবেষণার নামে তারা তাদের বিষাক্ত মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক চিন্তাকে ছড়িয়ে দিতে চাইছে। হিন্দু ইউনিভার্সিটি অফ্ আমেরিকার নামে ধর্মীয় কলেজ পরিচালনা করছে। অন্তত একবার বিশ্বসম্মেলনের মধ্যে দিয়ে (ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন্ অফ্ বেদিক স্টাডিজ) বিবেক ওয়েল ফেয়ার অ্যান্ড এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন বা ইনফিনিটি ফাউন্ডেশনের মতো অর্থদাতা সংস্থার নামে তারা প্রায় ১.৯ মিলিয়ন ডলার গবেষকদের পিছনে এখনো অবধি ব্যয় করেছে। ওভারসিজ্ ফ্রেন্ড অফ ভারতীয় জনতা পার্টি এবং এশিয়ান আমেরিকান হোটেল ওনার অ্যাসোসিয়েশন্ হচ্ছে সেই দুটি সংস্থা, যারা তাদের অনুষ্ঠানে তৎকালীন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে প্রধান অতিথি করে আমেরিকায় নিয়ে আসতে চেয়েছিল। এই ওভারসিজ্ ফ্রেন্ড অফ্ ভারতীয় জনতা পার্টি এবং ওয়ার্ল্ড হিন্দু কাউন্সিল সংগঠন দুটি যোগাসন ক্লাসকে আর্থিকভাবে মদত করার লক্ষ্যে ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৩ সালে এরা নিউ জার্সিতে প্রথম 'গ্লোবাল রিলিজিয়াস্ কনফারেন্স' করে।

ইন্ডিয়ান ডেভলপ্‌মেন্ট অ্যা রিলিফ্ ফান্ড তাদের অনুদানের শতকরা পঞ্চাশ ভাগই পাঠায় ভারতের সংঘ পরিবারের হাতে। বলা বাহুল্য, এই ফান্ড কী কারণে ব্যবহৃত হতে পারে, তা আর বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, তবে বলে রাখা ভালো, এর অধিকাংশটাই যায় সেই তিনটি রাজ্যে যেগুলোয় সংঘ পরিবারের সদস্যরা মুসলিম এবং খ্রিস্টানদের উপর হিংসার জন্য কুখ্যাত। এছাড়াও এই সংস্থার টাকার একটা বড়ো অংশ তারা আদিবাসীদের জন্য খরচ করে। বিশেষত, একল বিদ্যালয়ের কর্মসূচি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। বস্তুত তারা আদিবাসীদের প্রাপ্য মর্যাদা দেয় না। তাদের হিন্দুকরণ করার অপচেষ্টা চালানোর মধ্য দিয়ে আদিবাসীদের তারা অমর্যাদা করে থাকে এবং আদিবাসীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুত্বের বিষ ঢোকানোর প্রচেষ্টা করে এবং টাকা ছড়িয়ে তারা আদিবাসী এবং দলিতদের দাঙ্গায় দাবার বোড়ে হিসেবে ব্যবহার করে। এই 'একল বিদ্যালয়' নামটিই আত্মমর্যাদা ও স্বাধিকারবোধ-সম্পন্ন আদিবাসীদের কাছে অপমানকর, কারণ নামটি এসেছে মহাভারতের একলব্যের নাম থেকে। একলব্য হচ্ছেন এমন একজন মহাকাব্যিক চরিত্র, যিনি ব্রাহ্মণ্যবাদী গুরু দ্রোণাচার্যের কাছে তাঁর বুড়ো আঙুল কেটে দক্ষিণা দিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিলেন! অর্জুনের বীরত্বের সামনে প্রতিস্পর্ধী হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত উচ্চবর্ণের পদতলে তিনি নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। সংঘ পরিবার বস্তুত তাকেই গৌরবান্বিত করার মধ্যে দিয়ে আদিবাসীদের আত্মসমর্পণ করার বিষয়টাকেই গৌরবান্বিত করতে চায়, নয়তো তাঁরা আদিবাসী বীর সিদো-কানহু, বিরসা মুন্ডাদের মতো বীরদের নাম বাদ দিয়ে একলব্যের নামই বা বাছবে কেন?!

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে, ভি এইচ পি নেতা প্রবীণ তোগারিয়া ভারত সরকারকে অনেক আগেই 'উপদেশ' দিয়েছিলেন যে, মাওবাদীদের বিরুদ্ধে তারা যেন আদিবাসীদের ব্যবহার করে। তিনি এটাও দাবি করেছিলেন যে, ভি এইচ পি ২৩,০০০ একল বিদ্যালয় চালু করেছে এবং যে যে গ্রামে এই বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব আছে সেখানে মাওবাদীদের অস্তিত্ব নেই। শুধু মাওবাদীদের বিরুদ্ধেই নয়, কাশ্মীরেও একল বিদ্যালয় সেনাবাহিনীকে মদত দিতে তৈরি হওয়া 'ভিলেজ ডিফেন্স কমিটি'র বড়ো পৃষ্ঠপোষক। পাঁচটি সংঘ সমর্থক ফান্ডিং সংস্থা প্রতি বছর প্রায় ৫৫ বিলিয়ন ডলার ভারতের এইসব কাজকর্মের জন্য খরচ করে থাকে।

জন্মলগ্ন থেকে রামমন্দির ইস্যুর আগে অবধি কালপর্বে দেখা যাবে সংসদীয় গণতন্ত্রে বিজেপি খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। আমরা জানি, নব্বইয়ের দশকের একেবারে শেষের দিকে রাজীব গান্ধির বোফর্স কেলেঙ্কারিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস ভেঙে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের উত্থান ঘটেছিল। ওই সময় বামফ্রন্ট ও বিজেপির সমর্থনে ভি পি সিং দেশের অষ্টম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করেন। ১৯৮৯-৯০-এ বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের সরকারকে তখন তারা বাইরে থেকে সমর্থন করে এবং এর মাধ্যমে আবার তারা সংসদীয় গণতন্ত্রের রাজনীতির পাদপ্রদীপের আলোয় আসার সুযোগ পায়। কেন্দ্রে স্বভাবতই বাইরের শক্তির সমর্থনে ছিল দুর্বল কোয়ালিশন সরকার। এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়েই বিজেপি লালকৃষ্ণ আদবানির নেতৃত্বে রামজন্মভূমি ইস্যুটিকে সামনে আনা শুরু করে। ১৯৯০ সালের ৩০ অক্টোবর অযোধ্যায় করসেবার মধ্যে দিয়ে রামজন্মভূমির কাজ শুরু হবে বলে আদবানি ঘোষণা করেন। রামরথ যাত্রাকে ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা চরমে ওঠে। কার্যত এই

আন্দোলনের ফলে কেন্দ্রের ভি পি সিং সরকার বিপন্ন হয়ে পড়ে। ফলত ৩০ অক্টোবরের আগেই আদবানিকে সমস্তিপুরে ভি পি সিংয়ের নির্দেশ লালুপ্রসাদ যাদব-পরিচালিত বিহার সরকার গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে আমরা দেখব এই রামমন্দির ইস্যুকেই 'তুরুপের তাস' করে সংসদীয় রাজনীতিতে বিজেপির উত্থান ঘটে এবং অবশেষে তারা কেন্দ্রে ক্ষমতার আসনে আসীন হয়। এরই হাত ধরে প্রথমে ১৯৯৬ সালে ১৩ দিনের জন্য, পরে ১৯৯৮ সালে ১৩ মাসের জন্য এবং ১৯৯৯ থেকে ২০০৪, প্রায় পাঁচ বছরের জন্য অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। যে রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিতর্ককে ঘিরে বিজেপির এই উত্থান, আসুন তা নিয়ে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা যাক।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিতর্ক

১৯৯২ সালের ২৬ ডিসেম্বর দিনটি ভারতের ইতিহাসে একটি কলঙ্কের দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গেছে। এই দিন সংঘ পরিবারের উন্মত্ত করসেবকদের তাণ্ডবে ধূলিসাৎ হয়ে যায় বহু প্রাচীন বাবরি মসজিদটি। এর সাথে ধ্বংস হয়ে যায় বস্তুত ইতিহাসের একটি মূল্যবান নিদর্শনও। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিতর্কের স্রষ্টাও কিন্তু সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। তারাই প্রথম অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে এই বিতর্কের সূত্রপাত ঘটায়।

প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক, বাবরি মসজিদ তথা রামমন্দিরকে ঘিরে আজকের বিতর্কটা ঠিক কী? সংঘ পরিবারের অন্যতম উগ্রবাদী শাখা সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মতো হিন্দুত্ববাদীদের দাবি অনুযায়ী, আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে নাকি বাবরি মসজিদের বিতর্কিত জমিটিতে বিক্রমাদিত্য এক রামমন্দির স্থাপন করেছিলেন। কারণ, তাঁদের বিশ্বাস অনুযায়ী এই বিতর্কিত জমিটিতেই নাকি রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন! এবং আজ থেকে ৫০০ বছর আগে মুঘল সম্রাট বাবর নাকি সেই মন্দিরটি ভেঙে মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। তাদের দাবির সপক্ষে দাঁড়িয়ে আজ তাঁদের বক্তব্য হল পুরোনো সেই রামমন্দিরটি ফেরত চাই! অবশ্য শুধু অযোধ্যার মসজিদ ভেঙে মন্দির নির্মাণেই যে তারা থেমে থাকবে না তা বোঝা যায় যখন অযোধ্যার বাবরি মসজিদটি ভাঙার পর তারা কাশী, মথুরার মসজিদ ভাঙারও হুমকি দেয়।

প্রথমত, আমরা জানি রামায়ণের রামচন্দ্র একটি মহাকাব্যের কাল্পনিক চরিত্র। বাস্তবে কারো যদি জন্মই না হয়ে থাকে, তবে তাঁর জন্মস্থান নিয়ে বিতর্কের প্রশ্নই আসার কথা নয়। তবু তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া হল রামচন্দ্র জন্মেছিলেন। কিন্তু তা ধরে নিলেও, রামায়ণ অনুযায়ী রামের জন্মস্থান কোথায়?? এখন অবধি নানাধরনের রামায়ণে এব্যাপারে নানান ধরনের কাহিনি সূত্র মিলেছে। 'নানা মুনির নানা মত'। নানান পণ্ডিতের মতামতগুলির উপর সমীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন রামায়ণে ও অন্যান্য পুঁথিতে অন্তত রামের জন্মস্থান (ধরে নিলেও যে রামচন্দ্র সত্যিই জন্মেছিলেন) সংক্রান্ত ৭টি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে, যার মধ্যে ৬টি স্থানের সাথে বর্তমান অযোধ্যার বিতর্কিত জমিটির কোনো যোগসূত্রই নেই। একটি মাত্র স্থানের খোঁজ পাওয়া গেছে, যা বিতর্কিত স্থানটি থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে। অধিকাংশ পুরাণবিদ ও ঐতিহাসিকের দাবি রামচন্দ্রের 'জন্মভূমি' বলে যে অযোধ্যার উল্লেখ আছে, তা অধুনা আফগানিস্তানে অবস্থিত। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তার নব রামায়ণে দাবি করেছিলেন বৌদ্ধ রামায়ণ গল্প 'দশরথ জাতক'-ই হচ্ছে প্রকৃত রামায়ণ, এই রামায়ণে রামচন্দ্রের জন্মস্থান অযোধ্যা নয়, বারাণসী। অন্তত দেড় ডজন মোহন্ত এবং সাধকের দেখা পাওয়া যাবে, যাঁরা নিজেদের সাধনক্ষেত্রটিকে 'রামজন্মভূমি' বলে দাবি করে থাকেন।

দ্বিতীয়ত, উত্তর ভারতে রামচন্দ্রের পূজা চালুই হয় ৬০০ থেকে ৭০০ বছর আগে। বিক্রমাদিত্যের সময় রামচন্দ্রের পূজা চালুই ছিল না, তাই রামমন্দির নির্মাণের প্রশ্নই আসে না। ভারতবর্ষে রামচন্দ্রের পূজা প্রথম চালু হয় দক্ষিণ ভারতে। প্রথমে রাম ছিলেন শুধুই মহাকাব্যের

এক নায়ক। আজ থেকে এক হাজার বছর আগে প্রথম তামিল কবি কম্বন রামভক্তি চালু করেন। এমনকি খোদ অযোধ্যায় রামচন্দ্রের পূজা চালু হয় আজ থেকে বড়োজোর ২০০ বছর আগে!

তৃতীয়ত, আজ যেটাকে অযোধ্যা বলা হচ্ছে, তার সাথে রামায়ণে বর্ণিত অযোধ্যার কোনো সম্পর্ক নেই, কারণ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বলছেন, এই অযোধ্যায় মানুষ প্রথম বসবাস করতে শুরু করে ২৭০০ বছর আগে। তখন তার জনবসতি ছিল একেবারে আদিম ধরনের যার সাথে রামায়ণের জাঁকজমকপূর্ণ নগরের কোনো মিলই নেই। তাছাড়া রামায়ণে বর্ণিত রাম জন্মেছেন ত্রেতাযুগে। যা পুরাণবর্ণিত দ্বাপর যুগেরও আগের যুগ। হিন্দুধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী দ্বাপরেরও পর এসেছে কলিযুগ। এই কলিযুগই নাকি ৫০০০ বছরের প্রাচীন। তাহলে যেটা দাঁড়ায় যে, রামায়ণ বর্ণিত রামের জন্মকাল অনুযায়ী বর্তমানের অযোধ্যায় কোনো জনবসতি ছিলই না। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন অবশ্য এটাও বলছে যে, বিতর্কিত রামলালার শিলাটি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ যেটিকে দাবি করে আসছে প্রাচীন রামলালার শিলা বলে, তা-ও যথেষ্ট প্রাচীন শিলা নয়। তার জন্ম শতাধিক বছরও নয়, দেড় হাজার বছর তো দূরের কথা।

চতুর্থত, ১৯৪৯ সালের আগে অবধি, এমনকি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তথা সংঘ পরিবারও জোরের সাথে রামমন্দির নির্মাণের দাবি তোলেনি।

পঞ্চমত, রামচরিতমানসের লেখক এবং গোঁড়া রামভক্ত তুলসিদাসজি নিজে জন্মে ছিলেন অযোধ্যায়, বাবর এদেশে আসার দুই বছর পর। আশ্চর্যজনক হল তার কোনও লেখায় কোথাও বাবরের হাতে রামমন্দির ধ্বংসের কোনো উল্লেখ নেই!

ষষ্ঠত, বাবর বা সমসাময়িক আমলের কোনো গ্রন্থে বাবর কর্তৃক মসজিদ ধ্বংস করে মন্দির নির্মাণের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না।

এবারে আসা যাক দ্বিতীয় বিতর্কে। সত্যি কি বাবর এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন? ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলছে। প্রাক্তন আমলা এবং ইতিহাসবিদ সর্দার শের সিংয়ের লেখা বই 'আর্কিওলজি অফ বাবরি মসজিদ'-এর তথ্য অনুযায়ী বাবর কোনো কালেই মসজিদটি নির্মাণ করেননি। বাবরের জন্মের ষোলো বছর আগে মসজিদটি নির্মাণ হয়েছিল। শের সিং মসজিদের গায়ের প্রথম ফলকটি আবিষ্কার করেন। তিনি জানান, মসজিদ তৈরি হবার পর তিনবার ফলক বদল হওয়ার কারণে প্রতিষ্ঠাতা নিয়ে এই বিতর্কের সূত্রপাত। আরো একটি তথ্য হল ব্রিটিশ লাইব্রেরি, লন্ডনের তথ্য যাতে বলা হয়েছে, ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল মারকুইস্ ওয়েলেস্লি একজন ব্যক্তিকে ভারতের কিছু প্রদেশে সমীক্ষার জন্য পাঠান। তার নাম হ্যামিলটন্ বুকানন্। তাঁর সমীক্ষা অনুযায়ী জানা যাচ্ছে, ৮৭২ হিজরিতে জৌনপুরের শাসক হুসেন শাহ সারকি মসজিদটি নির্মাণ করেন। বাবরের জন্ম আরো পরে ৮৮৮ হিজরি মাসে। আর একথাও মনে রাখা দরকার, মূল 'বাবরনামা'য় কিন্তু বাবর কর্তৃক এই মসজিদ নির্মাণের কোনো উল্লেখ নেই।

তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, এই মসজিদ বাবর নির্মিত এবং রামমন্দির ধ্বংস করেই তা নির্মাণ হয়েছিল – এই তত্ত্ব এল কোথা থেকে? আসলে এর স্রষ্টা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের পেটোয়া ইতিহাসবিদরা। আগেই বলেছি মহাবিদ্রোহের পর ব্রিটিশরা ক্রমশই উপলব্ধি করেছিল যে

এদেশের হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ফাটল ধরানো সাম্রাজ্যের স্বার্থে একান্তভাবেই জরুরি। তার সাথে অযোধ্যা বিতর্কের পিছনে ছিল তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের অন্য সমস্যাও। আজ যেটা অযোধ্যা, সেটা ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় ছিল আয়ুধের নবাব ওয়াজেদ আলি শাহের অন্তর্গত। ইংরেজরা চেষ্টা করে যাচ্ছিল ছলে-বলে-কৌশলে আয়ুধকে দখল করতে। কিন্তু দখলের জন্য কোনো অজুহাতই তারা খুঁজে পাচ্ছিল না। আগেই বলেছি, আয়ুধের নবাবেরা ছিল অসাম্প্রদায়িক। তাঁরা হনুমানঘেড়ির জন্য জমি এবং অর্থ দুই-ই দিয়েছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজরা বেশি বেশি করে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ভাঙতে তৎপর হয়ে উঠল। মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) ঠিক চার বছর পর, অর্থাৎ ১৮৬১ সালে ব্রিটিশ লেখক কার্নেগির লেখায় খুঁজে পাওয়া গেল, মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়ার কাহিনি। তার আগেই ১৮১৩ সালে ইংরেজ পণ্ডিত লিডেন বাবরের আত্মজীবনী অনুবাদ করার সময় লেখেন, 'সম্ভবত বাবর অযোধ্যায় গিয়ে থাকবেন।' ১৮৬১ সালে কার্নেগি, লিডেনের নিছক অনুমান (যার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তির কথা অন্তত লিডেন উল্লেখ করেননি) সামনে রেখে আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণের কথা বললেন। ১৮৬১ সালে লেডি বিভারিজ্ 'বাবরনামা'র ইংরাজি অনুবাদের সময় মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ নির্মাণের তত্ত্বটি জুড়ে দিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, সম্ভবত বাবর মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন। তার সূত্র ছিল মসজিদের একটি ফাটক, যেখানে নাকি মীর বাকিকে বাবরের মসজিদ নির্মাণের আদেশের উল্লেখ আছে। কিন্তু তাতেও মন্দির ধ্বংসের কোনো উল্লেখ নেই। যদিও আজকের অধিকাংশ ঐতিহাসিকরা বলছেন, ওই আদেশটিও কোন ফার্সি না জানা লোকের এবং তা লেখা হয়েছে গত শতাব্দীতে। বিভারিজ্ ঘটনাটির আগে তাও একটা সম্ভাব্যতার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ১৯০৫ সালে ইংরেজ ঐতিহাসিক এই সম্ভাব্যতার আর কোনো বালাই না রেখে বলে দিলেন বাবর মন্দির ধ্বংস করে মসজিদটি নির্মাণ করেছিল। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকরা একটি এমন বিতর্কের সূত্রপাত করে দিয়ে গেলেন, আজো যা সাম্প্রদায়িকতার প্ররোচকদের হাতকে শক্তিশালী করে চলেছে। যার দগদগে ক্ষত বুকে বয়ে ভারতবর্ষ ঘৃণা-বিদ্বেষের আগুনে পুড়ে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার রক্তে ভিজে একবিংশ শতকে পা রাখে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আবার আরেক কাঠি ওপরে যায়। কোনো জুতসই ঐতিহাসিক সূত্র না পেয়ে তারা অদ্ভুত দাবি তুলে বসলেন। তারা বললেন, 'বাবরনামা' থেকে অনেকগুলি পাতা নিখোঁজ এবং সেই নিখোঁজ পাতাতেই নাকি মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ নির্মাণের উল্লেখ আছে। কী অকাট্য যুক্তি! পাতাগুলিই নিখোঁজ অথচ ওগুলোই নাকি প্রমাণ! তাঁদের আরেকটা যুক্তি হল মসজিদের ১৪টি তোরণকে ঘিরে। তোরণগুলিতে ঐসলামিক স্থাপত্যের নিদর্শন নেই। এর বি যুক্তি হিসাবে আমরা ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপারের বক্তব্যের উল্লেখ করতে চাই। শ্রীমতী থাপার বলছেন, পুরোনো কোনো মন্দিরের মালমশলা মসজিদে ব্যবহারের অনেক উল্লেখ আছে। এটা নতুন কোনো ঘটনা নয়। এটা দিয়ে মন্দির ধ্বংসের কথা প্রমাণিত হয় না। তাছাড়া এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুশীল শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা অনুযায়ী তোরণগুলো বিক্রমাদিত্যের চারশো বছর পরে তৈরি হয়েছিল।

মূলত কিছু অপযুক্তির উপর ভিত্তি করেই ১৯৪৯ সালের ২২ ডিসেম্বর মাঝরাতে একদল লোক ঢুকে মসজিদের ভিতর একটা রামলালার মূর্তি গোপনে ঢুকিয়ে দিয়ে মূর্তি আবির্ভাবের গল্প

ছড়ায় এবং তারপর থেকেই এই বিতর্ক একটা মাত্রা পায়। প্রশ্ন হল হঠাৎ ১৯৪৯ সালেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে এই বিতর্ককে কেন কবর খুঁড়ে তুলতে হল?

পাঠক বন্ধুরা সময়টার দিকে একবার তাকান। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি দিল্লির বিড়লা হাউসের একটি প্রার্থনা সভায় নাথুরাম গডসে গান্ধিকে গুলি করে হত্যা করল। আগেই বলেছি, এই ঘটনায় আর এস এস-এর বিরুদ্ধে ব্যাপক গণবিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছিল। বহু জায়গায় সংঘের শাখা কার্যালয়গুলি আক্রান্ত হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি আর এস এসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। পরে ১৯৪৯ সালের ১২ জুলাই তদানীন্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে গোলওয়ালকরের বৈঠকের ভিত্তিতে কিছু চুক্তি সম্পাদিত হয়, যার পরিপ্রেক্ষিতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। যদিও তখন এমন একটা সময়, যখন গান্ধি হত্যাকারী হিসাবে আর এস এস-এর ব্যাপক দুর্নাম হয়ে গেছে এবং তার গণভিত্তি তলানিতে এসে ঠেকেছে। এরকম একটা সময় দাঁড়িয়ে হিন্দুত্বের আবেগের সুড়সুড়ি দিয়ে হিন্দু-গণভিত্তিকে আবার সংহত করার জন্য আর এস এস তথা সংঘ পরিবারের দরকার ছিল এমন একটা নতুন সংবেদনশীল ইস্যু যা জনমানসে সাম্প্রদায়িকতার বিষকে ছড়িয়ে দিতে পারবে। পাশাপাশি হিন্দুভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের গুছিয়ে নিতেও যা কাজে লাগবে। তাই তারা হাতে তুলে নিল ইংরেজদের ফেলে দেওয়া পুরোনো সাম্প্রদায়িক বিভেদের এই অস্ত্র। ওই বছরই ২২ ডিসেম্বর মাঝরাতে তারা মসজিদের ভিতরে রামলালার মূর্তিটা প্রবেশ করিয়ে রামমন্দিরের জিগির তোলা শুরু করল।

বারবারই ক্ষমতার কারবারিরা এইভাবে রামমন্দির-বাবরি মসজিদ ইস্যুটিকে সামনে এনে সাম্প্রদায়িক জিগির তুলেছে।

প্রসঙ্গত বলা ভালো, বিজেপি এবং সংঘ পরিবার শুধুমাত্র বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মধ্যে দিয়েই নিজেদের কর্মসূচিকে ক্ষান্ত হতে দিতে নারাজ। তাদের পরবর্তী কর্মসূচি তারা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে বসে আছে। মথুরা এবং কাশীর মসজিদও তারা ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। তাই বাবরি ধ্বংসের পরেই তারা আওয়াজ তুলেছিল – 'ইয়ে তো পহেলা ঝাঁকি হ্যায়/ কাশী মথুরা বাকি হ্যায়...'।

হিন্দুত্ববাদী ঐতিহাসিকরা যতই দেখান যে, মুসলমান শাসকরা সাম্প্রদায়িক স্বার্থে হিন্দুমন্দির ধ্বংস করত, বস্তুত শুধু মুসলমান রাজারা নয়, হিন্দু, মুসলমান উভয় ধর্মের রাজারাই ধর্মীয় উপাসনালয়ের উপর আক্রমণ করতেন, সেখানকার ধনদৌলতের লোভে। কল্‌হনের 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থে কাশ্মীরের রাজা হর্ষের সময়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেখানে দেখা যাচ্ছে উক্ত হিন্দু রাজা 'দেবোৎপাটন নায়ক' নামক রাজকর্মচারী নিয়োগ করতেন, যাদের কাজ ছিল রাজকোষে টান পড়লে হিন্দুমন্দির লুঠ করা। নিজের রাজ্যের সীমানার মধ্যে মাত্র চারটি মন্দির বাদে তিনি সমস্ত মন্দিরই ধ্বংস করেছিলেন। অজাতশত্রুর শাসনকালে বৌদ্ধদের উপর অত্যাচারের কাহিনি তো আমরা রবীন্দ্রনাথের 'পূজারিণী' কবিতাতেও পেয়েছি। মৌর্য রাজারাও সম্পদের লোভে দামি ধাতব বিগ্রহ গলিয়ে ফেলতেন। হিন্দু রাজা কর্তৃক বৌদ্ধমঠ ধ্বংসের কাহিনি তো বিভিন্ন বৌদ্ধগ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রচুর আসে। সিন্ধু অঞ্চলের রাজা দাহিরও বৌদ্ধদের উপর

নিদারুণ অত্যাচার চালিয়েছিলেন। কাশী মন্দিরে ঔরঙ্গজেব কর্তৃক আক্রমণের পিছনেও আছে অন্য এক গল্প। ঔরঙ্গজেব বস্তুত হিন্দু রাজাদের চাপেই কাশীর মন্দির আক্রমণ করেছিলেন। কারণ, সপার্ষদ রাজ্য পরিদর্শনে গিয়ে ঔরঙ্গজেবকে তাঁর অধীনস্থ হিন্দু রাজাদের অনুরোধে কাশীবিশ্বনাথ মন্দিরের সামনে শিবির ফেলতে হয়েছিল। হিন্দু রাজা ও তাঁদের রানিরা পুজো দেওয়ার পর ফিরে এলে, দেখা গেল কচ্ছের রানি নিখোঁজ। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাঁকে পাওয়া গেল মন্দিরের একটি গুপ্তকক্ষে মূর্ছিতা অবস্থায়। মন্দিরের পান্ডারা তাঁকে ধর্ষণ করে ফেলে রেখেছিল। এমতাবস্থায় হিন্দুরাজাদের চাপে ঔরঙ্গজেবকে মন্দিরে সেনা অভিযান চালাতে হয়। মন্দিরে মুসলমান অনুপ্রবেশের ফলে মন্দির অপবিত্র হয়েছে এই কারণে বিগ্রহটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলে মন্দিরটি পরিত্যক্ত হয়ে যায়, তখন সেখানে বর্তমান মসজিদটি গড়ে তোলা হয়। যদিও পাশেই মন্দির নির্মাণের জন্য জায়গা দিয়ে দেওয়া হয়, বর্তমানে যে জায়গায় মন্দিরটি আছে। আবার গোলকুন্ডায় লুকিয়ে রাখা বিপুল খাজনা আদায়ের জন্য ঔরঙ্গজেব যে জুমা মসজিদও ধ্বংস করেছিলেন, এ কথা কিন্তু হিন্দুত্ববাদীরা সযত্নে চেপে যান।

সুলতান মামুদের সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠনের কথা আমরা সবাই জানি। তিনি সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করেছিলেন এটা সত্য, কিন্তু ঘটনা হল এটাই যে তা তিনি করেছিলেন লুঠপাটের উদ্দেশ্যেই, অর্থনৈতিক লাভের লক্ষ্য নিয়েই, এর পেছনে কোনো ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক ভাবনা ছিল না। কারণ, এটাও সত্যি যে মামুদের নিজের রাজধানী গজনিতে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষরা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্মাচরণ করতে পারতেন নির্দ্বিধায়। মহম্মদ বিন তুঘলকের আমলের কথা কে না জানে। 'তুঘলকি আমল' বলতে আজকাল খামখেয়ালির রাজত্ব বোঝায়। কিন্তু কতজন জানেন যে এই বিন তুঘলক ছিলেন একজন যথেষ্ট উদার ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। স্বধর্মের অসৎ খলজিকে ক্ষমতাচ্যুত করে 'বিধর্মী কাফেরকে' তিনিই তো সম্পত্তি পাইয়ে দিয়েছিলেন। এটা তো ইতিহাসস্বীকৃত কাহিনি! অযোধ্যাকে হিন্দু তীর্থস্থান হিসেবে গড়ে তোলার পিছনেও যে ছিল আয়ুধের নবাবদের অবদান তা তো আমরা আগেই বলেছি। পাশাপাশি হিন্দু রাজা শিবাজীকেও আমরা দেখব, মুঘলদের সাথে যতই তাঁর যুদ্ধ থাক, তিনি নিজ শাসনাধীন অঞ্চলে মসজিদ ও কোরানের পবিত্রতা রক্ষায় সবসময় বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। আবার মারোয়ার রাজা কুম্ভও একাধিক মসজিদ ধ্বংস করেছিলেন, এটাও ইতিহাস। সুতরাং আজ এতদিন পরে এসব প্রশ্ন তোলার অর্থ হল সচেতনভাবে জনমানসকে সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন করার মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলা, যা বিজেপি ও সংঘ পরিবার করে আসছে। তবে এ ব্যাপারে কংগ্রেসও একই দোষে দুষ্ট। সিপিএমের ভূমিকাও সৎ ও স্বচ্ছ নয়। কংগ্রেসই প্রথম এই ইস্যুটিকে আবার কবর থেকে তুলে আনে। তারা কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকাকালীন জঙ্গি হিন্দুত্ববাদের কাছে মাথা নত করে তারাই প্রথম ১৯৮৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ৩৭ বছর পর রামমন্দিরের তালাটি খুলে দেয়। পরে আবার ১৯৮৯ সালে তৎকালীন উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী এন ডি তেওয়ারি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুটা সিং এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতে বিতর্কিত অংশটিতে শিলান্যাস করার অনুমতি দেওয়া হয়। এইভাবে তারা সংঘ পরিবারের রামমন্দির গড়ে তোলার কর্মসূচিকে বা বলা ভালো বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার কাজে মদত দেয়। সিপিএম নিজেদের 'ধর্মনিরপেক্ষ' শক্তি বলে দাবি করে থাকে, অথচ

আশ্চর্য ব্যাপার হল, রামমন্দির গড়ার লক্ষ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে যখন পশ্চিমবঙ্গে রামশিলা পূজা হচ্ছিল চতুর্দিকে, তখন তারাই রাজ্যে সরকারে, অথচ তাদের প্রশাসন এব্যাপারে কোনো বাধা তো দেয়ই নি, উল্টে পুলিশি নিরাপত্তায় রামশিলাকে পাহারা দিয়ে রাজ্য পার করে দিয়েছে।

আদবানির রামরথকে থামাতেও তারা কোনো প্রশাসনিক উদ্যোগ নেয়নি। পরিশেষে একটা ছোট্ট ঘটনা শুনিয়ে এই অধ্যায় শেষ করব। হিন্দুত্ববাদীদের নিষ্ঠুরতার ঘটনার কথা। ঘটনাটি হল, অযোধ্যার বিতর্কিত রামমন্দিরের পুরোহিত লালদাসের নির্মম হত্যার ঘটনা। তাঁর অপরাধ তিনি আনন্দ পট্টবর্ধনের 'রামকে নাম পর' তথ্যচিত্রে হিন্দুত্ববাদীদের গণহত্যাকারী স্বরূপটিকে উন্মোচিত করে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। তাই তাঁকে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের হাতে খুন হতে হয়। কারা তাঁর ঘাতক তা নিশ্চয়ই আর বলার অপেক্ষা রাখে না!

সপ্তম অধ্যায়

বিজেপির নেতৃত্বাধীন প্রথম এনডিএ সরকার

১৯৯৮ সালে বিজেপির নেতৃত্বে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স গঠিত হয়। প্রথমবার এই মোর্চার চেয়ারম্যান ছিলেন বিজেপি নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ী। মোট ১৩টি সংগঠন নিয়ে এই মোর্চা গঠিত হয়েছিল। ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সালের কালপর্ব অবধি এই মোর্চা ক্ষমতায় ছিল। এআইডিএমকে, বিজেডি-র মতো বহু পুরোনো শরিক বর্তমানে আর তাঁদের সাথে নেই। নীতিশ কুমারের জেডিইউ-এর মতো দলও পরে এসে আবার তাঁদের সঙ্গ ছেড়েছে। এরকম পুরোনো কিছু শরিক যেমন বিদায় নিয়েছে, আবার নানা রাজ্যে নতুন নতুন বন্ধুও তাঁদের হয়েছে। বর্তমানে এই মোর্চার সদস্য সংগঠনের সংখ্যা প্রায় ৩০টি। কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়াও প্রায় এগারোটি রাজ্যে বর্তমানে এরা সরকারে আছে।

আগে প্রথমবার জয়প্রকাশের সময় গঠিত প্রথম জনতা সরকারের সময় সংঘ পরিবারের রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে থাকা জনসংঘ দলটি জনতা দলে মিশে যায়। তখন তাঁদের নেতাদের অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে সরকারে ছিলেন। বাজপেয়ীরা সেসময় কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে ছিলেন। পরে জয়প্রকাশের মৃত্যুর পর তাঁরা জনতা পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে 'ভারতীয় জনতা পার্টি' তৈরি করেন। তারপর দীর্ঘদিন বিজেপি সংসদীয় রাজনীতিতে তেমন কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফল করতে পারেনি। নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিক থেকে তারা আবার ভারতীয় রাজনীতির আঙিনায় তৎপর হতে শুরু করে। বোফর্স কেলেঙ্কারি জনিত দুর্নীতির ইস্যুতে কংগ্রেস সরকারের পতন হলে ১৯৮৯ সালের ২ ডিসেম্বর ভি পি সিংয়ের নেতৃত্বে ন্যাশনাল ফ্রন্ট কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। এই সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন করেছিল বামফ্রন্ট এবং বিজেপি। ওই সময়ই বিজেপি তার বহুকথিত 'রামমন্দির' ইস্যুটিকে সামনে নিয়ে আসে। রামমন্দিরের প্রচারের লক্ষ্যে লালকৃষ্ণ আদবানি রামরথ যাত্রা শুরু করলে ভি পি সিংয়ের নির্দেশে বিহারের সমস্তিপুরে লালুপ্রসাদ যাদবের সরকার তাকে গ্রেপ্তার করে। মন্দির-মসজিদ ইস্যুতে বিতর্কের কারণে বিজেপি নেতারা ভি পি সিং সরকারের থেকে সমর্থন তুলে নেয়। এর ফলে ভি পি সিং সরকারের পতন হয়। একদিকে কংগ্রেসের মাত্রাছাড়া দুর্নীতি, অন্যদিকে বিজেপির রাম-রোটি-ইন্সাফ শ্লোগান নিয়ে এগিয়ে আসা, একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের মুক্তবাজার অর্থনীতির, তথা মনমোহনীয় অর্থনীতির কুফলে জনমানসে তিক্ত প্রভাব, অন্যদিকে জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য বিজেপির 'স্বদেশী জাগরণে'র মিথ্যা প্রচার, এই সমস্ত ঘটনার ঘনঘটার মধ্যে দিয়ে ১৯৯৫ সালে প্রথমবারের জন্য বিজেপি দেশের মধ্যে একক বৃহত্তম সংসদীয় দল হিসাবে নির্বাচনি রাজনীতিতে উঠে আসে। সেই সময় তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ড: শংকর দয়াল শর্মা দেশের শাসনভার তুলে নিতে তাদের আহ্বান করলে অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে তারা প্রাথমিকভাবে সরকার গঠনও করে। কিন্তু অন্যান্য দলগুলির সাহায্য না পাওয়ায়, এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হলেও, যেহেতু তারা সরকার গঠনের মতো আসন পায়নি, তাই মাত্র ১৩ দিনের মাথায় সেই সরকার ভেঙে যায়। ১৯৯৬ সাল থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে অন্তত দু'টো যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হলে আবার বিজেপির সামনে সরকার গড়ার সুযোগ আসে। ইতিমধ্যে যুক্তফ্রন্ট গঠনের উদ্যোগ

তারাও নিতে শুরু করায় এনডিএ জোট গঠিত হয়েছে। ১৯৯৮-এর নির্বাচনে এনডিএ'র জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় সরকার গঠনের সুযোগ পায়। সেবারও প্রধানমন্ত্রী হন অটলবিহারী বাজপেয়ী। ১৩ মাসের মাথায় অর্থাৎ ১৯৯৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে এনডিএ জোটের গুরুত্বপূর্ণ শরিক কুমারী জয়ললিতার নেতৃত্বাধীন এ আই ডি এম-কে দল বাজপেয়ী সরকার থেকে সমর্থন তুলে নেওয়ায় এই সরকারেরও সাময়িক পতন হয়। পরিণতিতে আবার ভোট। এবার বাজপেয়ীর নেতৃত্বে, বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের সরকার আরো বেশি সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসে।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের প্রথম পর্যায়টি এককথায় ঘটনাবহুল। হিন্দুত্ব এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী কর্মকাণ্ডের এই সময় যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলি হল পোখরানের পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ, লাহোর সামিট, সংসদ আক্রমণের ঘটনা, কার্গিল যুদ্ধ, বিমান হাইজ্যাক করে বন্দি বিনিময় এবং অবশ্যই গুজরাত গণহত্যা। বস্তুত এই সব ঘটনাগুলির মধ্যে দিয়ে বাজপেয়ী সরকার যতই হিন্দুত্ববাদী এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী চিন্তাকে সামনে আনার চেষ্টা করুক না কেন, এই ঘটনাগুলি ছিল বাজপেয়ী জমানার এক একটা গভীর ক্ষত, যা সরকারের মুখ পুড়িয়েছিল। আমরা এই বইয়ে এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে কিছু আলোচনায় যাচ্ছি না। গুজরাত গণহত্যা পর্ব, যা নাকি বাজপেয়ী জমানার সবচেয়ে কলঙ্কজনক অধ্যায়, তা নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করব। কারণ, মোদির উত্থানকে বুঝতে গেলেও গুজরাত নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা জরুরি। বাকি ঘটনাগুলি প্রসঙ্গে শুধু একটা কথাই এখানে মাথায় রাখতে বলব, ১৯৯৮ সালের মে মাসে পোখরানে ৩৪ বছর পর দ্বিতীয়বারের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের পর বাজপেয়ী যতই 'বিজ্ঞানের জয়' বলে কৃতিত্ব নেওয়ার চেষ্টা করুন, জনগণের জীবনযাত্রায় তার প্রভাব ছিল শেষপর্যন্ত নেতিবাচক। পাশাপাশি বলা ভালো, সচেতন বিজ্ঞানমনস্ক জনগণ এর মধ্যে দিয়ে 'বিজ্ঞানের জয়' খুঁজে তো পায়ই নি, উল্টে তারা এর মধ্যে দিয়ে জনবিরোধী অপবিজ্ঞানকেই উৎসাহিত করার উপাদান খুঁজে পেয়েছিল। বস্তুত পরমাণু শক্তি বিরোধী গণআন্দোলনের কর্মসূচি এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। কার্গিল যুদ্ধের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এক্ষেত্রেও প্রথমদিকে জনমানসে একটা উগ্র জাতীয়তাবাদের জিগির তোলার চেষ্টা করলেও, শেষাবধি যুদ্ধ পরবর্তী বিধ্বস্ত অর্থনীতির কারণে, বিশেষত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি এবং আরো পরে কার্গিল যুদ্ধে মৃত সেনাদের কফিন কেনাবেচা সংক্রান্ত ব্যাপারে এনডিএ সরকারের দুর্নীতি; বাজপেয়ী সরকারের 'দেশপ্রেমে'র ফাঁকা বুলিকে উন্মোচিত করেছিল। তাই শুরু শুরুতে এগুলো নিয়ে বিস্তর হইচই হওয়ার পরও শেষরক্ষা হয়নি। আর সংসদ আক্রান্ত হওয়া, বিমান ছিনতাইয়ের পর মাসুদ আজাহারকে জঙ্গিদের হাতে তুলে দেওয়ার মতো ঘটনাগুলো তো বস্তুত বাজপেয়ী সরকারের মুখ পুড়িয়েছিল।

প্রথমবারের বাজপেয়ী সরকার থেকে আজকের মোদি সরকার বিজেপি শাসনের ইতিহাস হল, এদেশের আর পাঁচটা সংসদীয় দলের মতোই দেশের জনগণকে ধোঁকা দেবার ধারাবাহিক ইতিহাস। তথ্য পরিসংখ্যান দিয়ে তা প্রমাণ করতে গেলে অবশ্য শুধু বাজপেয়ী জমানার এবং স্বল্প দিনের মোদি জমানার অপশাসন, দুর্নীতি ও কুকীর্তি নিয়েই একটা আস্ত বই লিখতে হয়, কিন্তু আমরা সেদিকে আপাতত আলোচনাকে নিয়ে যাচ্ছি না। আমরা তথ্য, পরিসংখ্যান,

ঘটনাগুলোকে ঠিক ততটুকুই দেখাব যার মধ্যে দিয়ে সংঘ পরিবারের শ্রেণীচরিত্রটি বুঝতে আমাদের সুবিধা হয়। এদিক থেকে দেখলে প্রথম বাজপেয়ী নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের শাসনকালটি গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে, যদিও রামমন্দির ইস্যুটিতে বিজেপি তার কর্মী বাহিনীকে চাঙ্গা করতে সমর্থ হয়েছিল, উগ্র হিন্দুত্বের জিগির তুলে একটা উচ্চবর্ণীয় অংশকে, গ্রামাঞ্চলে যাঁরা ছিলেন মূলত সামন্তশ্রেণীর প্রতিনিধি এবং শহরে যাঁরা ছিলেন মূলত বানিয়া শ্রেণীর লোকজন তাঁদের উৎসাহিত করতে তারা সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু সাধারণ 'দিন আনি দিন খাই' মানুষদের সমর্থনকে ভোট বাক্সে টেনে আনতে তারা শ্লোগান তুলেছিল 'রাম-রোটি-ইন্সাফের' অর্থাৎ রামের সঙ্গে তারা রোটি আর ইন্সাফকেও জুড়ে দিয়েছিল এবং ঘটনা হল মনমোহনীয় মুক্তবাজার অর্থনীতির কুফল ততদিনে ফলতে শুরু করেছে, পাশাপাশি কংগ্রেসের মাত্রাতিরিক্ত দুর্নীতিতে মানুষ তখন তিতিবিরক্ত। বিজেপি নেতারা জনগণের এই ভাবাবেগকেই কার্যত ব্ল্যাকমেল করে ক্ষমতায় এসেছিল এবং নিজেদের ভোট বাক্সকে কিছুটা মাত্রায় সংহত করতে পেরেছিল, অথচ ক্ষমতায় এসে তারাই কিন্তু 'স্বদেশী জাগরণে'র শ্লোগানকে বেমালুম ভুলে গিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের সংস্কারের বুলি দিয়ে মনমোহনীয় বিশ্বায়নী উন্নয়নেই সামিল হয়ে গেল। এই পর্যায়ে তারা জনগণকে নিঃস্ব করল আর পুঁজির মালিকরা হল পেটমোটা। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হবে, ১৯৯৮ সালে রিলায়েন্স গোষ্ঠীর মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩৬,৯৫৪ কোটি টাকা। ২০০২ সালের মধ্যে অর্থাৎ বাজপেয়ী জমানার প্রথমার্ধে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৬,৭৬৪ কোটি টাকা। ২০০২ সালে টাটার সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩৬,৬২০ কোটি টাকা। ২০০২ সালে তা বেড়ে হয় ৪০,৯৩৪ কোটি টাকা। ১৯৯৮ সালে বিড়লাদের সম্পত্তি ছিল ১৮,৮১৭ কোটি টাকা। ২০০২ সালে তা বেড়ে দাঁড়াল ২২,৯৩৩ কোটি টাকা। এত অল্প সময়ে এত দ্রুত সম্পদবৃদ্ধি অভূতপূর্ব। তবে এই বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও লক্ষণীয় হল আম্বানিদের এই বিপুল উত্থান। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের সম্পদ হস্তান্তর এবং করের ক্ষেত্রে বিপুল ছাড় পুঁজিপতিদের সম্পদ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করেছিল। বস্তুত বাজপেয়ীর আমলে এই 'স্বদেশী জাগরণে'র ফেরিওয়ালারা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে বিলগ্নিকরণের জন্য বিলগ্নিকরণের একটা আলাদা মন্ত্রকই খুলে ফেলেছিল। কৃষিতে সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক সংস্থার থাবা এই সময় আরো জোরদার হয়। পরিণতিতে অন্ধ্রে, কর্ণাটকে, মহারাষ্ট্রে ব্যাপক কৃষক আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে কার্যত বাধ্য হন। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। এতদ্‌সত্ত্বেও ২০০৪ এর নির্বাচনে বাজপেয়ী সরকার মানুষকে ধোঁকা দেবার জন্য রাজকোষের (অর্থাৎ জনগণের) ৭৫০ কোটি টাকা খরচ করে 'ভারত উদয়' এবং 'ফিল্ গুডের' শ্লোগান তোলে। কেমন ছিল সেই 'ভারত উদয়'? জনগণের 'ফিল গুড' তথা সুখানুভূতিই বা কেমন ছিল? আসুন, এ ব্যাপারে একটু আধটু পরিসংখ্যানকে কাটাছেঁড়া করা যাক।

ভারত উদয়ের প্রথম যুক্তি হিসাবে বাজপেয়ী সরকার যা সামনে এনেছিল তা হল সেই আমলে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির প্রসঙ্গটিকে। তারা বলেছিল, ২০০৩-০৪ আর্থিক বছরের তৃতীয় কোয়ার্টারে অর্থাৎ অক্টোবর-ডিসেম্বর নাগাদ জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল ১০.৪ শতাংশ হারে যা ভবিষ্যতে আরো বাড়বে। প্রথমত, তাদের এ যুক্তিতে কারচুপি ছিল। দ্বিতীয়ত, যদি তাদের পরিসংখ্যানকে সঠিকও ধরে নেওয়া হয়, তবুও তা আহামরি কিছু নয়, কারণ ভারত সরকারের

তথ্য-পরিসংখ্যানই বলছে অটল-জমানার আগের ছয় বছরে আর্থিক বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৮ শতাংশ। এমনকি অটল-জমানার প্রথম দিককার পাঁচ বছরে, অর্থাৎ ১৯৯৮ থেকে ২০০৩-র শুরুর সময় অবধি আর্থিক বিকাশ কমে দাঁড়িয়েছিল ৫.২ শতাংশে। পরবর্তী আর্থিক বছরের বিকাশ এমনকি তাদের দাবি অনুযায়ী ১০.৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি হলেও গড়ে তা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ৫.৮ শতাংশ। অর্থাৎ পূর্ববর্তী সরকারের জমানার চেয়ে এক্ষেত্রে আর্থিক বিকাশের হার কম! বস্তুত ২০০৩-০৪এ আর্থিক যতটুকু বিকাশ ঘটেছিল, তার পিছনে বিজেপির পলিসির কোনো অবদান নেই, অবদান ছিল প্রকৃতির। আগের বছরগুলিতে ছিল অনাবৃষ্টির সমস্যা তথা খরার সমস্যা, সে বছর বৃষ্টিপাতের পরিমাণটা ঠিকঠাক ছিল।

প্রসঙ্গত বলা ভালো, বাজপেয়ীর নেতৃত্বে বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে কৃষির বৃদ্ধি ছিল ৯.৬ শতাংশ। পরবর্তী ছয় বছরের মধ্যে প্রথম তিন বছরই কৃষিবৃদ্ধির হার ছিল ঋণাত্মক।

ভারতবর্ষ গ্রামপ্রধান দেশ। এখানকার সত্তর শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন। জাতীয় আয়ের প্রায় এক তৃতীয়াংশ আসে কৃষি থেকে। ফলত গ্রামীণ অর্থনীতি তথা কৃষি অর্থনীতির বিকাশের মাধ্যমে এদেশের ব্যাপক মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি করা সম্ভব। শুধুমাত্র তখনই ব্যাপক জনগণের মধ্যে বইতে পারে সুখানুভূতির হাওয়া। বাজপেয়ী জমানায় কৃষির বস্তুত অবনমন ঘটেছিল। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে ১৯৮৬-৯০ সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ও গ্রামীণ তথা কৃষির উন্নতিতে অর্থাৎ জলসেচ, বিদ্যুৎ ইত্যাদি বাবদ খরচ করা হত মোট জাতীয় আয়ের ১৪.৫ শতাংশ। বাজপেয়ী সরকারের আমলে সেই খরচ নেমে আসে ৬ শতাংশেরও কমে! টাকার আয়ের হিসাবে দেখলে, ওই সময় গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে খরচ কমেছে ৩০ হাজার কোটি টাকা। এর ফলে কমেছে গ্রামীণ ক্ষেত্রে জনসাধারণের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা। এমনকি কমেছে চাহিদাও। বেড়েছে ক্ষুধা, বে-রোজগারি, দারিদ্র। বর্তমানে মোদি সরকার প্ল্যানিং কমিশনেরই মৃত্যুঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছে, পাশাপাশি গ্রামীণ উন্নয়নে বরাদ্দও আরো কমিয়ে দিয়েছে।

কৃষি-ঋণ কৃষকের উন্নতি তথা কৃষির উন্নতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সত্তরের দশকে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ করার সময় ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানতের অন্তত ১৮ শতাংশ কৃষিতে সরাসরি বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল (যদিও তার বৃহদাংশই যেত ধনী কৃষক এবং সামন্তপ্রভুদের গ্রাসে)। তথাকথিত নয়া অর্থনীতির সময় থেকে এবং ব্যাপক আর্থিক সংকটের কারণে পরিমাণটা ক্রমশ কমছিল, বাজপেয়ীর জমানায় তা নামতে নামতে ১১.৮ শতাংশে নেমে আসে। যখন বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে সারা বিশ্বে কৃষিপণ্যের ক্রমহ্রাসমান দামের কারণে ইউরোপ ও উন্নত পশ্চিমী দেশগুলি কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে নানারকম পদক্ষেপ নিয়েছে, তখন 'ভারত উদয়ে'র ফেরিওয়ালারা বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার কাছে মাথা নত করে কৃষিতে অনুদান কমিয়ে, কৃষকদেরকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিয়েছে। বাজপেয়ী আমলের ছয় বছরে ডিজেলের দাম বেড়েছে ১২০ শতাংশ। ইউরিয়া ৩৩ শতাংশ। সারের দাম বেড়েছে ১০ থেকে ২০ শতাংশ। ফলে একদিকে কৃষির খরচ বেড়েছে, অথচ যেহেতু নয়া আর্থিক নীতির কারণে ভারতের কৃষির বাজার বিশ্ববাজারের অংশ হয়ে উঠেছে, ফলত বিশ্বজুড়ে কৃষিজাত পণ্যের দাম কমার অবশ্যম্ভাবী নেতিবাচক পরিণতি ঘটেছে এ দেশের কৃষিজ পণ্যের বাজারেও। কৃষির পেছনে খরচ বাড়লেও,

কৃষিজ পণ্যের দাম ক্রমহ্রাসমান হওয়ায় কৃষক ক্রমশ নিঃস্ব হয়েছে। সর্বস্বান্ত কৃষকরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। তাই অন্ধ্রে, মহারাষ্ট্রে কৃষকের মৃত্যু-মিছিল আমরা দেখেছিলাম বাজপেয়ীর আমলে।

বাজপেয়ীর আমলে শুধু কৃষক সাধারণই নিঃস্ব হয়নি, পাশাপাশি খাদ্যশস্যের উপর প্রবল চাপ বেড়েছিল। রাষ্ট্রায়ত্ত খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ২০০৩ সালেই তথ্য-পরিসংখ্যান পেশ করে জানিয়েছিল অপুষ্টিতে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ১৯৯৫-৯৭ সালে ছিল ১৯.৪৭ কোটি। সংখ্যাটা তখনই উদ্বেগজনক ছিল। ২০০১ সালে, অর্থাৎ বাজপেয়ী জমানার প্রথম তিন বছরে তা বেড়ে হয়েছিল ২১.৪৫ কোটি। অর্থাৎ তিন বছরে সংখ্যাটা প্রায় দু'কোটির মতো বেড়ে ছিল। তবুও বাজপেয়ী সরকার 'ফিল গুড' তথা সুখানুভূতির প্রচারে সরকারি কোষাগার থেকে (পড়ুন, আমার আপনার করের পয়সা থেকে) কয়েক কোটি টাকা খরচ করেছিল। বস্তুত বাজপেয়ী আমলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কৃষি উন্নয়নের বিষয়টি। সাতচল্লিশ পরবর্তী সময়ে এতটা করুণ অবস্থা খুব কম বারই হয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে ১৯৫০-৫১ সালে বার্ষিক মাথাপিছু খাদ্যশস্যের জোগান ছিল ১৫০ কেজি। ১৯৯৭-৯৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল মাথাপিছু ১৭৪ কেজিতে। বাজপেয়ী সরকার ক্ষমতায় আসার পর অবস্থাটা সেই পঞ্চাশের দশকের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। ২০০০-০১ সালে মাথাপিছু খাদ্যশস্য যোগানের পরিমাণ নেমে দাঁড়াল ১৫১ কেজিতে। গ্রামীণ কর্মসংস্থান ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৪ সালে যেখানে ২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, বাজপেয়ীর জমানায় তা নেমে এসেছিল ০.০৬ শতাংশে। বাজপেয়ীর আমলেই খাদ্যের গণবন্টন ব্যবস্থা তথা রেশনিং ব্যবস্থার কার্যত অপমৃত্যু ঘটে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং তাদের এদেশীয় তাঁবেদাররা অত্যন্ত সুনিপুণ উপায়ে এই অপকর্মটি করে। সৌজন্য বাজপেয়ী সরকার। বিশ্বব্যাঙ্কের অঙ্গুলিহেলনে এই প্রথম দারিদ্রসীমার নীচে (বিপিএল) এবং দারিদ্রসীমার উপরে (এপিএল) এইভাবে জনগণকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। নাগরিকদের খাদ্যের অধিকার এভাবে আক্রান্ত হয়। এই বিপিএল তালিকা প্রস্তুতিতেই ভারতের রঙ-বেরঙের সরকারগুলি দীর্ঘদিন ধরে জল মিশিয়ে আসছিল। এখন এপিএল কার্ড ও বিপিএল কার্ড–রেশন কার্ডকে কার্যত এভাবে দু'ভাগে ভাগ করে এপিএলের আওতাভুক্তদের খাদ্যের অধিকারকে কেড়ে নেওয়া হল। ফল ফলল খুব দ্রুতই। গরিব মানুষদের একটা বড়ো অংশ (যাদের নাম হয়তো বিপিএলে স্থান পায়নি) বেশি দামে খাদ্যশস্য না কিনতে পারার কারণে সরকারি খাদ্যভাণ্ডারে প্রচুর খাদ্যশস্য জমা হল। ১৯৯৭ সাল নাগাদ, অর্থাৎ বাজপেয়ী সরকারে বসার ঠিক আগে, সরকারের কাছে খাদ্যশস্যের মজুত যেখানে ছিল ১.৮ কোটি টন। বাজপেয়ী ক্ষমতায় আসার তিন বছরের মধ্যে তা বেড়ে দাঁড়াল ৫.৮ কোটি টন। এসময় 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য'– ধরনের পলিসি সরকারের পক্ষ থেকে নিতে পারা যেত, তাতে গ্রামের গরিব জনতা দু'মুঠো খেয়ে বাঁচত, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী বাজপেয়ী সরকার তা না করে যা করল, তারা এই ব্যাপক খাদ্যশস্য অত্যন্ত কম দামে (খুচরো বাজারে যে শস্যের দাম ছিল ৯ টাকা তা ৪.৯০ টাকা কেজি দরে) বিদেশে মূলত গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য বিক্রি করে দিল। অর্থাৎ দেশের জনগণকে না দিয়ে ঘুরপথে সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমী দেশগুলোর জনগণকে অনুদান দেওয়া হল প্রতি কেজিতে প্রায় ৫টাকা !! এভাবে তারা প্রায় ২.৪৮ কোটি টন খাদ্যশস্য অপচয় করল। এছাড়াও তারা প্রায় ১.৩৭ কোটি টন খাদ্যশস্য বিক্রি

করল দেশীয় বানিয়াদের কাছে। এ বাবদও তারা প্রায় সাত-আট হাজার কোটি টাকা অনুদান দিল। আর মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্রায় দেড় কোটি টন খাদ্যশস্য (রেশনে বণ্টিত খাদ্যশস্যের তিনগুণ), যার মোট বাজারদর অন্তত ৯ থেকে ১০ হাজার কোটি টাকা তা উধাও হয়ে গেল সরকারি গুদাম থেকে! শেষাবধি ২০০৪-এর শেষের দিকে এই মজুত ভাণ্ডার কমে এসে দাঁড়াল ৭০ লক্ষ টনে, যা আবার আমাদের মতো একটা দেশের জন্য ন্যূনতম পরিমাণের তুলনায় কম।

শিল্পনীতির দিকে লক্ষ করলেও দেখা যাবে, সেই সাম্রাজ্যবাদ আর মুৎসুদ্দি বৃহৎ পুঁজির প্রতি তাদের যাবতীয় আনুগত্য থাকলেও জনগণের জন্য তা নাভিশ্বাসের উপক্রম করছিল। একদিকে জনগণকে ভিটেমাটি চাটি করে একের পর এক লগ্নির জন্য জনগণকে উৎখাতের কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছিল। অন্যদিকে আবার শিল্পে উৎপাদনের হারও যথেষ্ট নয়। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কর্পোরেটগুলোর ক্ষেত্রে প্রথম হাজারটির মধ্যে মাত্র একশোটির মুনাফা বেড়েছে এই সময়ে। একই সময় একশোর উপর সংস্থার মুনাফার হার কমে গেছে বিপুল পরিমাণে। আর সবার শেষ তালিকায় থাকা সংস্থাগুলোর মুনাফার হার শুধু কমেনি, বরং তা ঋণাত্মক পরিমাণে পৌঁছে গিয়েছিল! ফলত সামগ্রিক বিচারে কর্পোরেটগুলোর মোট মুনাফা কমেছে। শিল্পে উৎপাদনের পাশাপাশি উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধির হারও কমে গেছে ৩.৯ শতাংশ থেকে ২.১ শতাংশে। পরিণতিতে মজুরি বাড়ার বদলে কমে গেছে। এই সময় শ্রমিকরা বেশি বেশি করে মূল্য তৈরি করেছিল, কারণ মজুরির ক্ষেত্রে উৎপাদিকা শক্তি সামান্য হলেও বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু পুঁজির ক্ষেত্রে তা কমে গেছিল। অর্থাৎ মজুরেরা মূল্য বেশি করে তৈরি করলেও পুঁজি বেশি তৈরি হয়নি। পুঁজি তৈরি না হওয়ার পিছনে কারণ হল চাহিদা কমে যাওয়া। আর এই চাহিদা কমে গেছিল, কারণ মানুষের আয় কমে গেছিল। বেকার সমস্যার তীব্রতা বৃদ্ধিও এই আয় কমার একটা কারণ। বেকারির জ্বালা এতটাই তীব্র ছিল যে মাত্র ছ'হাজার টাকা মাইনের রেলের চাকরিতে কর্মসংস্থান যখন ছিল ৩০ হাজার, চাকরির আবেদনের দরখাস্ত জমা পড়েছিল ৬ লক্ষ! যখন দেশে চার-পাঁচ কোটি নথিভুক্ত বেকার, তখনও বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার বছরে এক কোটি বেকারের চাকরি দেবার মিথ্যা গল্প বাজারে ছড়াতে এতটুকুও লজ্জা বোধ করেনি।

এই পর্যায়ে মুষ্টিমেয় বিত্তবানদের ভোগব্যয় একদিকে যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনি গরিব মানুষ আরো নিঃস্বতর হচ্ছিল। সার্বিকভাবে চূড়ান্ত বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছিল। শতকরা ১০ শতাংশ পয়সাওয়ালার আয় ছিল দেশের মোট আয়ের ৪৬ শতাংশ, আর সবচেয়ে গরিব ২০ শতাংশের আয় ছিল দেশের মোট আয়ের মাত্র ৮ শতাংশ। এই সময়ে সমাজের বিত্তবান ২০ শতাংশের ভোগব্যয় নিশ্চয়ই বেড়েছিল, আর গ্রামের আশি শতাংশ, যারা মোট জনসংখ্যার অন্তত ৫০ শতাংশ, তাদের মাথাপিছু প্রকৃত ভোগব্যয় বস্তুত কমে গেছিল। এই সময় আমরা দেখেছি সবচেয়ে বড় ১০০টি পুঁজিপতি গোষ্ঠীর আয় আগের দশকের ৭.৪ শতাংশের তুলনায় বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ২২.৪ শতাংশ হারে, আর বিপরীত দিক দিয়ে দেখলে ছোটো ও মাঝারি শিল্প সংস্থাগুলো ধুঁকে মরেছে, অবলুপ্ত হয়ে গেছে। বিশ্বায়নের ধাক্কায় গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিতে ঋণ ক্রমশ দুর্লভ হয়ে ওঠার কারণে গ্রামাঞ্চলে নতুন করে সুদখোর, মহাজনদের আবির্ভাব ঘটেছে। বিজেপির বহুলপ্রচারিত 'সুখানুভূতি'র সমকালে ভারতের প্রকৃত চিত্রটা ছিল এরকম –

মানবোন্নয়নের নিরিখে বিশ্বের ১৭৩টি দেশের মধ্যে ভারত ছিল ১২৭ নম্বরে। আর দারিদ্রের মাপকাঠিতে ১৯১টি গরিব দেশের মধ্যে ভারত ছিল ১৬২ নম্বরে। বাজপেয়ী জমানায় বিজেপির শাসনকালে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৯০,৪৮০ কোটি টাকা। জনগণের মাথাপিছু বৈদেশিক ঋণ ছিল ৪,৯৭০ টাকা। আর সবচেয়ে করুণ চিত্রটি ছিল ক্ষুধার ক্ষেত্রে। বিশ্বের না-খেতে পাওয়া এক তৃতীয়াংশ মানুষ তখন ভারতে বাস করতেন। নিদারুণ ক্ষুধার এই করুণ চিত্রটার আজো খুব একটা হেরফের হয়নি অবশ্য। কিন্তু প্রশ্ন হল, গোয়েবেল্‌সের এই শিষ্যরা এত কিছুর পরও প্রচার চালিয়েছিল 'ফিল্ গুড'-এর, 'ভারত উদয়'-এর।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাও বাজপেয়ী সরকারের সময় ব্যাপক হারেই ঘটেছিল। ওই সময়ই প্রথম 'পোটা'র মতো নিবর্তনমূলক কালা কানুনগুলি চালু হয় এবং যথেচ্ছভাবে তার অপপ্রয়োগ ঘটে। এমসিসি এবং সিপিআই(এম এল)[পি ডব্লু]-র মতো সংগঠনগুলোকে দেশজুড়ে নিষিদ্ধ করা এবং নকশালপন্থী এই দু'টো সংগঠনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নাম করে, কার্যত দেশের হতদরিদ্র নাঙ্গা ভুখা জনতা, যারা অধিকাংশ মেহনতি শ্রেণীভুক্ত, দলিত, আদিবাসী, পিছড়ে বর্গের জনতা, তাঁদের বিরুদ্ধেই দেশজুড়ে যুদ্ধ জারি করে এই বাজপেয়ী সরকার। তার গালভরা নামকরণ করা হয় 'জয়েন্ট অপারেশনাল কম্যান্ড'। কাশ্মীর এবং উত্তর-পূর্ব ভারতেও প্রচুর নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে এই সময়। রাষ্ট্রীয় হিংসার আরেকটা দিক ছিল, আজকের উত্তর-আধুনিক পণ্ডিতরা যাকে বলে থাকেন 'স্ট্রাকচারাল ভায়োলেন্স'। প্রচুর কৃষক, বিশেষত অন্ধ্রের তুলাচাষিরা সে সময় আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হন। এটা ঘটেছিল শুধুমাত্র সরকারের বহুজাতিক সংস্থাকে তোষণ করার উদ্দেশ্যে জনবিরোধী আর্থিক নীতির কারণে। সংকট কতটা তীব্র ছিল বোঝা যায়, যখন আমরা দেখি বাজপেয়ী সরকারের আমলে লক্ষ্ণৌতে বিজেপি ঘনিষ্ঠ লালজি ট্যান্ডনের জন্মদিন উপলক্ষে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে একটুকরো পরনের কাপড় সংগ্রহ করতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে মারা যান ২৫ জন। কংগ্রেসের দুর্নীতির নিন্দা করে, স্বচ্ছ ভাবমূর্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল যে বাজপেয়ী সরকার, তাঁর আমলে একের পর এক দুর্নীতির ঘটনা বাজপেয়ীজির শ্বেতবস্ত্রকে কালিমালিপ্ত করেছিল সন্দেহ নেই। তহেলকা ডট কমের ঘটনা, কফিন কেলেঙ্কারি, স্ট্যাম্প পেপার কেলেঙ্কারি – সব ব্যাপারেই তারা যে কংগ্রেসের মতো 'যোগ্য শাসক' হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ রেখেছিল বাজপেয়ী সরকার।

বস্তুতপক্ষে আজ গুজরাতকে ঘিরে যে মোদি মডেলের 'আষাঢ়ে গপ্পো' শোনানো হচ্ছে, তার সূত্রপাত সেই বাজপেয়ীর আমলেই। তবে বাজপেয়ী জমানার সবচেয়ে কালো অধ্যায় হল গুজরাতের গণহত্যার দিনগুলি, যা আবার একাধারে আজকের শ্রীমান নরেন্দ্র মোদির উত্থানেরও এক সোপান।

অষ্টম অধ্যায়

গুজরাত গণহত্যা — ফিরে দেখা

বাজপেয়ীর আমলের সবচেয়ে কলঙ্কজনক অধ্যায় হল গুজরাত গণহত্যা। আজকের কর্পোরেট মিডিয়ার চোখে 'উন্নয়নের কান্ডারি' নরেন্দ্র মোদির উত্থানও আবার এই গুজরাত গণহত্যার সময় থেকেই লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। গুজরাত গণহত্যার কথা বলার আগে তাই নরেন্দ্র মোদির রাজনৈতিক উত্থান নিয়ে সামান্য কিছু বলা দরকার। মোদি আর এস এসের সাথে যুক্ত আছেন ১৯৭১ সাল থেকে। একসময় বিজেপিতে যখন বাজপেয়ী এবং আদবানি লবির মধ্যে চোরা দ্বন্দ্ব চলছিল, তখন নরেন্দ্র মোদি ছিলেন অপেক্ষাকৃত 'কট্টরপন্থী' আদবানিজির ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। ১৯৮৬ সালে গুজরাতের আমেদাবাদে বিজেপি প্রথম কর্পোরেশন ইলেকশনে জেতে, তখন থেকেই গুজরাতের রাজনীতিতে বিজেপি নেতা হিসাবে মোদির উত্থানের শুরু। ১৯৮৮ সালে তিনি গুজরাত রাজ্যের বিজেপি'র শাখা সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৯০ সালে গুজরাতের সোমনাথ মন্দির থেকে আদবানির রথযাত্রা শুরু হয়। ওই সময় থেকে আদবানির পাশে নবীন নেতা হিসাবে মোদির উপস্থিতি লক্ষ করা যাচ্ছিল। রামমন্দির ইস্যুতে যাঁরা বিজেপির কট্টরপন্থী নেতা হিসাবে পরিচিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন উমা ভারতী, সাধ্বী ঋতম্ভরা, বিনয় কাটিহার এবং অবশ্যই নরেন্দ্র মোদি। আদবানির রামরথ যাত্রা সারা দেশের মধ্যে যে কী বিপুল সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি করেছিল এবং সংখ্যালঘু মানুষদের জীবন, জীবিকাকে কী পরিমাণ অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছিল, তা তখনকার এদেশের সহনাগরিকরা প্রায় সবাই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আদবানির রাম রথযাত্রার পরও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকে জিইয়ে রাখতে বিজেপি নেতা মুরলীমনোহর যোশী শুরু করেন 'একতা যাত্রা'। একতার নামে যা ছিল আরেক ধরনের সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির অভিযান। ওই সময় মোদি ছিলেন ওই অভিযানের প্রধান সংগঠক। ওই সময় থেকেই কার্যত তিনি হয়ে ওঠেন হিন্দুত্বের 'পোস্টার বয়'। ২০০১ সালে ভুজের ভূমিকম্পের পর ত্রাণকার্যে ব্যর্থতার কারণে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি ইত্যাদির কারণে এমনিতেই সরকারের বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল, তাই তদানীন্তন গুজরাতের বিজেপি সরকারের পক্ষ থেকে তাদের মুখ্যমন্ত্রী কেশুভাই প্যাটেলকে সরিয়ে দিয়ে মোদিকে গুজরাতের নতুন মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। শোনা যায়, এর পিছনে নাকি ছিল লালকৃষ্ণ আদবানির 'আশীর্বাদ'। ট্র্যাজেডি এটাই যে, এই মোদিকেই প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী করার জন্য নাম ওঠার সময় তাঁর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সরব হন বিজেপির অভ্যন্তরে যে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, তিনি আর কেউ নন স্বয়ং লাল আদবানি। উল্টোদিকে ক্ষমতায় বসে মোদি প্রথমেই যেটা করেন, আদবানিকে পার্টির অভ্যন্তরে তাৎপর্যহীন করে দেন। তাৎপর্যহীন হয়ে ওঠেন মুরলীমনোহর যোশীজিও। পার্টির সভাপতি হিসাবে তিনি তুলে আনেন অমিত শাহকে। কে এই অমিত শাহ? অমিত শাহ আর মোদি হচ্ছেন দুই অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। গুজরাত গণহত্যাসহ অসংখ্য কুকীর্তিতে যাঁদের যৌথ উদ্যোগ আছে। একটি ভুয়া সংঘর্ষে হত্যার মামলায় অমিত শাহ ছিলেন অন্যতম অভিযুক্ত। গুজরাতের রাজনীতিতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পরেই মোদি অমিত শাহকে অনেকগুলি মন্ত্রকের দায়িত্বে নিয়ে আসেন। অমিত শাহের আগে গুজরাতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন হারীন পান্ডিয়া। শোনা যায়,

তিনি গুজরাত গণহত্যার সময় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে কিছু ইতিবাচক প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যা মোদি এবং অমিত শাহ খারিজ করে দেন। এর কিছুদিন পরেই পান্ডিয়া খুন হয়ে যান। পান্ডিয়ার স্ত্রী ও পরিবার এই খুনের জন্য মোদি আর অমিত শাহের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলেন। ২০১১ সালে মুম্বই থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'ডিএনএ' পত্রিকায় একটা প্রতিবেদনে দাবি করা হয় যে পান্ডিয়াকে হত্যার জন্য মোদি–অমিত শাহ জুটি সোহরাবুদ্দিন শেখ এবং তুলসীরাম প্রজাপতিকে নিয়োগ করেছিল। পরে সাক্ষ্য লোপাটের স্বার্থে, এই তুলসীরাম প্রজাপতি, সোহরাবুদ্দিন শেখ এবং তার স্ত্রী কৌসর বি-কে সাজানো সংঘর্ষের ঘটনায় হত্যা করা হয়। শুধু এঁদেরই নয়, মোদি জমানায় এবং অমিত শাহের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রিত্বে এরকম প্রায় ২২ টা ভুয়ো সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ইশরাত জাহানের মামলাটা বিশেষ চর্চিত হয়েছে। এই মামলায় ধৃত তৎকালীন পুলিশের ডি আই জি বানজারা, যিনি আজ প্রায় সাত বছর হয়ে গেল সবরমতি জেলে আছেন, ২০১৩ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর জেল থেকে একটি খোলা চিঠি দিয়ে এই ভুয়ো সংঘর্ষের নামে হত্যার প্রতিটি ঘটনার পিছনে যে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নির্দেশ ছিল তা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন।

মোদি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রিত্বে থাকাকালীন গুজরাতে যে গণহত্যা ঘটে, তা হিংস্রতা, ভয়াবহতা ও বর্বরতায় সাম্প্রতিক অতীতের যে কোনো গণহত্যাকে ম্লান করে দিয়েছিল। আমরা আগেই দেখেছি সংঘ পরিবারের সংখ্যালঘু নীতি হল হিটলারের ইহুদি নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাদের মতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের এদেশে থাকতে হলে, থাকতে হবে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের বদান্যতার উপর নির্ভর করেই। গুজরাত গণহত্যার মধ্যে দিয়ে মোদি সংখ্যালঘু জনগণকে এই বার্তাই পৌঁছে দিয়েছিল। আজ তাই গুজরাতের অনেক জায়গায় আতঙ্কগ্রস্ত মুসলিমরা ভয়ে মোদিকেই ভোট দেন!

কী ঘটেছিল গুজরাতে? গোধরা স্টেশন থেকে একটু দূরে সিঙ্গল ফালিয়া বলে একটি বস্তি অঞ্চলে 'গাঞ্ছি' মুসলিম সম্প্রদায়ের বসবাস। তাঁরা পেশাগতভাবে মূলত অটোচালক, হকার ইত্যাদি। ২০০২ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি সবরমতি এক্সপ্রেসটি প্রায় ১৭০০ করসেবক নিয়ে যাচ্ছিল। ট্রেনটি লেটে রান করায় প্রায় ৫ ঘন্টা দেরিতে তা গোধরা স্টেশনে পৌঁছেছিল। সেখানে স্থানীয় গাঞ্ছি সম্প্রদায়ের ওই সব হকারদের সাথে করসেবকদের শুরুর দিকে কিছু কথাকাটাকাটি হয়ে থাকতে পারে। বস্তুত প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানবন্দি বলছে, করসেবকরা অসভ্যতা করছিল। তারা চা খেয়ে বা অন্যান্য কিছু কিনে পয়সা না দেওয়া, মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের দাড়ি ধরে টানা, মেয়েদের বোরখা তুলে দেওয়া – এ ধরনের অন্যায় আচরণ করছিল। একজন বৃদ্ধ মুসলিম ভদ্রলোককে করসেবকরা 'জয় শ্রীরাম' বলতে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। তিনি বলতে অস্বীকার করলে দৈহিক নির্যাতন শুরু করে, ফলত স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজনার পারদ চড়ছিল। পরে জয়তিন বিবি নামক এক মহিলা তার দুই মেয়ে সোফিয়া ও সঈদাকে নিয়ে বরোদা যাবার জন্য প্ল্যাটফর্মে আসেন। গণ্ডগোলের মুখে পড়ে তিনি মেয়েদের নিয়ে পালাতে চাইলে, তাকে করসেবকরা জোর করে ট্রেনের এস-৬ বগিতে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে, যা আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করে। এমনিতে গোধরা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাপ্রবণ এলাকা। উভয় সম্প্রদায়েরই প্রায় সমসংখ্যক লোক এখানে বাস করেন। তার মধ্যে আবার ১৫ মার্চ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ রামশিলা

পূজার ডাক দিয়েছিল। ফলত উত্তেজনা ছিলই। জয়তিন বিবি আর তাঁর মেয়েদের উপর অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে স্থানীয় গাঞ্ছি সম্প্রদায়ের মানুষরা ওই এস-৬ কামরাতে ছুটে যান। উভয়পক্ষে সংঘর্ষ বাঁধে। সংঘর্ষ থামাতে পুলিশ কোনো ভূমিকা নেয়নি। যদিও আগে থেকেই ট্রেনের গার্ডের পক্ষ থেকে ওই এস-৬ কামরায় প্রচুর বিস্ফোরক মজুত আছে, এই খবর পুলিশকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি। পরে রেলের নিজস্ব ফরেন্সিক রিপোর্টেও এই কামরায় বিস্ফোরক মজুত থাকার তথ্যের প্রমাণ মিলেছিল, যা সযত্নে চেপে যাওয়া হয়। ঘটনায় ৫৭ জন অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। হল, ১৭০০ জন করসেবক ট্রেনে আসছে জানা সত্ত্বেও কেন কোনো পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি? প্রশ্নটা অবশ্য আমার নয়, স্বয়ং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রশ্নটা গুজরাত সরকারের কাছে তুলেছিল। আরো একটা তথ্য সকলের জানা দরকার, আগুন লাগার পর কিন্তু স্থানীয় গাঞ্ছি সম্প্রদায়ের মানুষদের ভূমিকা ভালো ছিল। বস্তুত তাঁরা বেশ কিছু মানুষকে উদ্ধারে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। বিপরীতে স্থানীয় এক বিজেপি নেতার নেতৃত্বে দমকল বাহিনীর কাজেও বাধা দেওয়া হয়! প্রশাসনও পৌঁছোয় অনেক দেরিতে। এই ঘটনার পরই গুজরাতে বনধ্ ডাকা হয় এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মোদির দরকার ছিল এমনই এক ইস্যু, যার সাহায্যে একদিকে হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ককে যেমন সংহত করা যাবে, তেমনি সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মজ্জায়, শিরদাঁড়ায় প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যাবে এক মৃত্যুশীতল আতঙ্ক। মোটামুটি ২০০০-এর উপর সংখ্যালঘু মানুষকে কার্যত নৃশংসভাবে জবাই করা হয়। ঘরছাড়া হয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তত ১ লক্ষ মানুষ। বহু নারী ধর্ষিতা হন। মায়ের পেট চিরে তলোয়ারের ডগায় তুলে আনা হয় গর্ভস্থ ভ্রূণ। সরাসরি সরকার এই হত্যালীলায় সামিল হয়। হিন্দুত্ববাদী শিবির থেকে আওয়াজ ওঠে, 'ইয়ে অন্দর কি বাত হ্যায় / পুলিশ হামারা সাথ হ্যায়' ইত্যাদি। অগ্নিদগ্ধ ট্রেনটিকে সামনে রেখে হিন্দুত্ববাদীরা প্রতিহিংসার জিগির তুলতে শুরু করে। সারা গুজরাত জুড়ে এক সাথে ৪৮টি জায়গায় হিন্দুত্ববাদীরা একযোগে আক্রমণ নামিয়ে এনেছিল। আর এস এস তথা সংঘ পরিবার ট্রাক বোঝাই করে দাঙ্গাবাজদের নিয়ে এসে স্থানীয় মুসলিম মহল্লায় আক্রমণ চালায়। বস্তুত এটা কোনো মতেই দাঙ্গা ছিল না, ছিল সংগঠিত এবং পরিকল্পিত গণহত্যা। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের চেয়ারম্যান প্রকাশ্যে দাবি করেন যে ২৮ ফেব্রুয়ারি তাঁরা আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুর তালিকা প্রস্তুত করে। ঘটনা হল, এই তালিকাটা ছিল বেশ দীর্ঘ। প্রায় ১০ হাজার সংখ্যালঘু মানুষকে নিশানা করা হয়েছিল। এত অল্প সময়ে যা প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। তাই সঙ্গতকারণেই প্রশ্ন উঠছে তালিকাটি কি তাহলে গোধরা কাণ্ডের আগেই তৈরি করা হয়েছিল?

গুজরাত গণহত্যায় হিন্দুত্ববাদী আক্রমণের কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল। প্রথমত, সরকার তথা রাষ্ট্র স্বয়ং এই গণহত্যায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল। মোদিজি তো নিউটনের তৃতীয় সূত্র ধার করে এই গণহত্যাকে গোধরা কাণ্ডের 'বিপরীত প্রতিক্রিয়া' হিসাবে নির্লজ্জ সাফাই গেয়েছিলেন। যদিও ফরেন্সিক রিপোর্টসহ নানা প্রমাণাদি গোধরা কাণ্ডের জন্য করসেবকদেরই দায়ী করেছে। বোঝা যাচ্ছে, বিজ্ঞানবিরোধী, সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী, শ্রীমান নরেন্দ্র মোদির নিউটনের তৃতীয় সূত্রটি বোঝার ক্ষেত্রে বদহজম হয়েছে। এই নরসংহারের অনেক আগে থেকেই সমগ্র গুজরাতকে হিন্দুত্ববাদীরা একটা মাত্রায় ফ্যাসিকরণ করতে সমর্থ হয়েছিল।

আমলাতন্ত্র, পুলিশ সর্বত্র তার প্রতিফলন দেখা গেছে। গণহত্যা চলাকালীন এই চিত্রটা আরো পরিষ্কার হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ফ্যাসিস্তরা যেমনটা করে থাকে, ঠিক তেমনভাবেই কিছু উগ্র জাতিদাম্ভিকতাপূর্ণ শ্লোগানের আড়ালে সংঘ পরিবার মেহনতি এবং নিপীড়িত জনতার একাংশকেও এই নরসংহারে সামিল করতে সমর্থ হয়েছিল। বস্তুত এরাই গুজরাতে 'ব্ল্যাক শার্ট বাহিনী'র কাজ করেছিল। একটা ভালোমাত্রায় আদিবাসী এবং দলিত জনগণ এই হত্যা, লুঠপাট এবং ধ্বংসলীলায় সামিল হয়েছিল। এমনকি এইসব তাণ্ডবে সংঘ পরিবার তাদের ফ্রন্টাল নারী সংগঠন দুর্গা বাহিনীর আড়ালে প্রচুর মহিলাকেও সমাবেশিত করেছিল। এই গণহত্যার আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সংখ্যালঘু পরিবারের নারী এবং শিশুরা এত বেশি, এত মারাত্মকভাবে আক্রান্ত আগে কোনো দাঙ্গায় হয়নি। তৃতীয়ত, অনেক আগে থেকেই এই গণহত্যার নীল নকশা তৈরি করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তাদের সাম্প্রদায়িক ইস্তাহার বিলি করে মুসলিম চলচ্চিত্র অভিনেতা, অভিনেত্রীদের তো বটেই এমনকি মুসলিম ফিল্ম ডিরেক্টরকেও পর্যন্ত বয়কট করার প্রচার চালিয়েছে। তারা সামগ্রিকভাবেই মুসলিমদের বয়কটের পক্ষে জোরদার প্রচার চালাচ্ছিল। আর নরেন্দ্র মোদি সরকার গোপন সার্কুলার দিয়ে নির্দেশ দিয়েছিল, এলাকায় যেসব মুসলিম বিগত পাঁচটি দাঙ্গার সাথে যুক্ত, তাদের নাম ও বিস্তারিত খবরাখবর নথিভুক্ত করে সরকারকে জানাতে। লক্ষণীয় যে, কোনো হিন্দু দাঙ্গাবাজদের ক্ষেত্রে কিন্তু এ ধরনের নজরদারির কথা বলা হয়নি। ডিজি (ইন্টেলিজেন্স) পি বি উপাধ্যায় সমস্ত পুলিশ আধিকারিকদের গোপন সার্কুলার দিয়ে নির্দেশ দিয়েছিল মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের নাম, ঠিকানা, কার্যাবলী লিপিবদ্ধ রাখতে। মাথায় রাখতে হবে, এসবই চলছিল অত্যন্ত গোপনে এবং অবশ্যই তা কার্যকর হচ্ছিল গোধরা ঘটনার অনেক আগে থেকেই! আরো লক্ষণীয় ব্যাপার হল, আমেদাবাদের মতো শহরগুলোতে দোকান লুঠের হাত থেকে বাঁচতে সেখানকার মুসলমান দোকানদাররা আগে থাকতেই দোকানের নাম বদলে গুজরাতি হিন্দু নাম রাখতে শুরু করেছিলেন, কেননা লুঠতরাজের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁদের আগেই ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও দোকান রক্ষা করা যায়নি। প্রশ্ন হল, যেখানে হামলাবাজরা সবাই বহিরাগত ছিল, সেখানে তারা হিন্দু এবং মুসলিম দোকানগুলোর মধ্যে ফারাক করল কী করে? ঘটনা তো এটাই, যে সারি সারি মুসলিমদের দোকান যখন অগ্নিদগ্ধ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, হিন্দু মালিকদের দোকানগুলো থেকেছে অক্ষত! আসলে গোধরার ঘটনার আট মাস আগেই একটি স্থানীয় পত্রিকা 'সন্দেশ'-এ একটি তালিকা-সমেত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে কোন কোন দোকানগুলোর নাম পরিবর্তন হয়েছে তা প্রকাশ করা হয়। তাছাড়া সার্ভে করার নামে মুসলিম দোকনগুলোকে চিহ্নিতকরণের কাজ করা হয়েছে সেলস্ ট্যাক্স এবং নানা সরকারি দপ্তর থেকে নামগুলো সংগৃহীত হয়েছে। গোধরার ঘটনার দু'সপ্তাহ আগে থেকেই রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের আকাল দেখা গিয়েছিল এবং ঘটনা হল গণহত্যায় ও অগ্নিসংযোগে দেখা গেল বিপুল পরিমাণ রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার ব্যবহৃত হয়েছে। আক্রমণের এ এক ধরনের নতুন পদ্ধতি, যা হিন্দুত্ববাদী জঙ্গিরা প্রয়োগ করেছিল গুজরাতে। এই গণহত্যা যে পূর্ব পরিকল্পিত ছিল এ-ঘটনাও তারই ইঙ্গিত দেয়।

গুজরাত গণহত্যার সময় ফ্যাসিবাদের আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা গেছে। সাধারণত দেখা গেছে, ফ্যাসিবাদ যখন কোথাও কার্যকর হয়, তখন শাসকশ্রেণীর যে অংশটির

মাধ্যমে তা পরিচালিত হয় সেই অংশটি, শাসকশ্রেণীর অন্য অংশের উপরও আক্রমণ নামিয়ে আনে। এ দেশে সত্তরের দশকের জরুরি অবস্থার সময়কার ইন্দিরা গান্ধি পরিচালিত ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপের দিনগুলির কথাই একবার ভাবুন। সিপিএম, সিপিআই বাদ দিয়ে প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দলের নেতাদেরই জেলে যেতে হয়েছিল। গুজরাতেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। একবার ভাবুন কংগ্রেসের সাংসদ ইকবাল আয়েয়ান জাফরির পরিবারের মর্মান্তিক পরিণতির কথা! সাধারণত দাঙ্গায় এখনো অবধি যা দেখা গেছে উচ্চকোটির লোকজনরা খুব একটা আক্রান্ত হন না। অথচ এখানে জাফরির পরিবার কী নৃশংস আক্রমণের শিকার হল। কয়েকশো উন্মত্ত মানুষ তাঁর বাসভবনটি ঘিরে ফেলা সত্ত্বেও, কোনও পুলিশ প্রশাসন তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এল না! তাঁর মেয়েকে প্রকাশ্যে ধর্ষণ করে হত্যা করার পর জাফরিকেও হত্যা করা হল। একইভাবে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আকবর এন ভিবেচার বাড়িটি জ্বালিয়ে দেওয়া হল। গুজরাত পুলিশের এক স্পেশাল আই জি সঈদকে পালিয়ে বাঁচতে হয়! এঁরা কিন্তু কেউই আম আদমি নন, প্রত্যেকেই রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী!

গুজরাত গণহত্যা কাণ্ডে যতগুলো হিন্দুত্ববাদী নারকীয় নরসংহার ঘটেছিল, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আরো দুটো হল বেস্ট বেকারির শ্রমিকদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনা এবং নারোয়া পাটিয়ার হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। দ্বিতীয় ঘটনাটির জন্য ২০১২ সালে বিশেষ আদালত বজরঙ্গ দলের নেতা বাবু বজরঙ্গি-কে এবং বিজেপি বিধায়ক এবং প্রাক্তন মন্ত্রী মায়া কোডানানিকে সারাজীবনের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। আদালতের রায়ে বলা হয়েছে, একদিনে ৯৭ জন মানুষকে হত্যা করা হয়েছে যাদের মধ্যে ছিল শিশু, নারী এবং বৃদ্ধ মানুষ। এমনকি মাত্র ২০ দিন বয়সী শিশুকে মারতেও হাত কাঁপেনি এই পশ্বাধম ঘাতকদের। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এই মায়া কোডানানিই ছিল মোদি মন্ত্রীসভার নারী এবং শিশু কল্যাণ মন্ত্রী! এই হচ্ছে নরেন্দ্র মোদির রাজনীতির অন্তর্বস্তু, যাকে নিয়ে কর্পোরেট মিডিয়ার আজ এত মাতামাতি।

নবম অধ্যায়

উন্নয়নের মোদি মডেল : নতুন বোতলে পুরোনো মদ

সাম্প্রতিক রাজনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে নরেন্দ্র মোদির উত্থান। মাত্র একদশক আগেও যে ব্যক্তি গুজরাত গণহত্যার কারণে ধিক্কৃত হয়েছিলেন, রাতারাতি তিনি হয়ে উঠলেন কর্পোরেট মিডিয়ার চোখে উন্নয়নের 'পোস্টার বয়'। একসময় যে আমেরিকা তাঁর ভিসা নামঞ্জুর করেছিল, বিগত লোকসভা নির্বাচনের আগে তাঁরাই মোদির প্রধানমন্ত্রীত্বর ব্যাপারে স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। শুধু আমেরিকাই নয়, পশ্চিমী অনেক দেশই মোদির ব্যাপারে হঠাৎ যেন অতি উৎসাহী হয়ে উঠল। মার্কিন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক সংস্থা কংগ্রেসানাল রিসার্চ সার্ভিসেস্ মোদির জয়ের ব্যাপারে আগে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করল এবং তাদের স্বস্তির কথাও গোপন রাখল না। তারা মোদিকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে থেকেই 'উন্নয়নের মসিহা' বলে উল্লেখ করে দিল। আরেক মার্কিন পদস্থ কর্তাও তখনই মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, পূর্বতন এনডিএ সরকারের সাথে তাঁদের 'সুসম্পর্কের' কথা। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্যামেরনও জানিয়েছিলেন যে, ইতিমধ্যেই গুজরাতের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সুসম্পর্কের কথা।

দেশীয় মুৎসুদ্দি বৃহৎ পুঁজি তো একেবারে আহ্লাদে ডগমগ। যেমন, মুকেশ আম্বানির চোখে তখনই মোদি একজন 'দূরদৃষ্টিসম্পন্ন' নেতা। তাঁর ভাই অনিল আম্বানি তো আরেক কাঠি ওপরে। উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি তো বলেই ফেললেন, 'নরেন্দ্র ভাইয়ের একাগ্রতা একেবারে অর্জুনের মতো।' 'লর্ড অ্যামং দ্য মেন।' 'লিডার অ্যামং দ্য লিডারস্।' টাটার চোখে তখন শিল্পের ঠিকানা একটাই–'গুজরাত'। আরেক শিল্পপতি সুনীল মিত্তল বলেছেন আরো আগেই, সেই ২০০৭ সালে, 'মোদি এমন একজন ব্যক্তি যিনি সফলভাবে জাতি পরিচালনা করতে সক্ষম'। লোকসভা নির্বাচনের কিছু আগে থেকেই মোদির পক্ষে কর্পোরেট মহলের একটা সমর্থনের ঢল নামতে শুরু করে দিয়েছিল। ভোটের কিছুদিন আগে করা 'ইকনমিক্স টাইমসে'র একটা সমীক্ষা হয়েছিল, দেশের বাঘা বাঘা ১০০ জন সিইও-কে নিয়ে। দেখা গিয়েছিল, তাঁদের চার ভাগের তিন ভাগই চান মোদিই দেশের প্রধানমন্ত্রী হোন।

প্রসঙ্গত বলা ভালো মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী গণতন্ত্র কোনো শ্রেণীনিরপেক্ষ ধারণা নয়। প্রথমত, 'গণতন্ত্র' ধারণাটা উঠে এসেছে ইউরোপে বুর্জোয়া বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে। গণতন্ত্র হচ্ছে বস্তুত সমাজে বিদ্যমান শাসকশ্রেণীর জন্য গণতন্ত্র এবং অন্য শাসিতশ্রেণীগুলির জন্য আদপে যা বিদ্যমান তা হল শাসকশ্রেণীটির শ্রেণীএকনায়কত্ব। লেনিন যেমন বলেছেন, 'বুর্জোয়া রাষ্ট্রের রূপ বহুবৈচিত্র্যময় হলেও মূলত কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে শেষপর্যন্ত এইসব রাষ্ট্রগুলো কোনো না কোনোভাবে অবশ্যম্ভাবী রূপে বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র।' (রাষ্ট্র ও বিপ্লব) অর্থাৎ এ এমন এক গণতন্ত্র যা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেনিনই বলছেন, 'নগণ্য সংখ্যাল্পের জন্য গণতন্ত্র, ধনীদের জন্য গণতন্ত্র, এই হল পুঁজিবাদী সমাজের গণতান্ত্রিকতা।' (রাষ্ট্র ও বিপ্লব) মার্কসবাদী লেনিনবাদীদের গণতন্ত্র সম্পর্কে এই বিশ্লেষণ যে কত সঠিক তা এবারের ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল যেন আরেকবার হাতেনাতে প্রমাণ করে দিল। দেখুন, একদিকে মোদি যেমন

কর্পোরেটদের মধ্যে বিপুল 'জনপ্রিয়', তেমনই আবার সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনের স্রেফ ভোটের হিসাব বলছে 'জনপ্রিয়' মোদি আসলে মেরে কেটে ৩৩ শতাংশ 'ভোটারের' প্রতিনিধি! এর মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ৩১ শতাংশ ভোট আর বাদবাকি শরিকরা মিলে, অর্থাৎ এনডিএ-র মিলিত ভোট সাকুল্যে ৩৩ শতাংশ। অর্থাৎ বাকি ৬৭ শতাংশ 'ভোটার' মোদিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন! তবুও আনন্দবাজারের মতো শাসকদলের কুলীন মুখপত্রের চোখে মোদি 'জনপ্রিয়' নেতা! তাহলে কি এটাই প্রমাণ হয় না যে, তাদের কাছে কর্পোরেট পুঁজির চোখে 'প্রিয়' হওয়াটাই 'জনপ্রিয়তা'-র মাপকাঠি!

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন মোদি হঠাৎ কর্পোরেটদের চোখে এত 'জনপ্রিয়' হয়ে উঠলেন? প্রথমত, এর পিছনে বেশ কিছু কারণ আছে। এমন একটা সময় মোদির উত্থান, যখন একদিকে কর্পোরেট পুঁজির বিরুদ্ধে আন্দোলন দেশ জুড়ে তীব্র হচ্ছে। পস্কো, কলিঙ্গনগর, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, জয়িতাপুর, হরিপুর, কুদানকুলাম – বহুজাতিক সংস্থা এবং দেশীয় বৃহৎ মুৎসুদ্দি পুঁজির স্বার্থবাহী উন্নয়নের বিরুদ্ধে একের পর এক গণআন্দোলনে শাসকশ্রেণী তখন দিশাহারা। অন্যদিকে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের দুই বৃহত্তম প্রতিনিধি সিপিআই (এমএল) [পিডব্লু] এবং এমসিসি সংযুক্তিতে কমিউনিস্ট বিপ্লবীরাও একক বৃহত্তম কমিউনিস্ট শক্তি হিসাবেই শুধু আত্মপ্রকাশ করেনি, উপরন্তু তাদের নেতৃত্বে চলমান জনযুদ্ধের বিকাশ ও বিস্তৃতি ঘটেছে ব্যাপক। নারায়ণপাটনা এবং লালগড়সহ পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা লাগোয়া সীমান্ত অঞ্চলে গড়ে উঠেছে এক বিরাট গণআন্দোলন। অন্যদিকে কেন্দ্রের মনমোহন সরকারের মধ্যেও অভ্যন্তরীণ সংকট বাড়ছে। একদিকে টুজি স্পেকট্রাম দুর্নীতি, আদর্শ আবাসন দুর্নীতি, কয়লার ব্লক বন্টন দুর্নীতি, একের পর এক দুর্নীতিতে সরকার একেবারে জেরবার। অন্যদিকে তৎকালীন শাসকদল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে তৈরি হয়েছে ক্ষমতার দুটি কেন্দ্র, এর ফলে অবশ্যম্ভাবীভাবে সরকারের মধ্যে শুরু হয়েছে সিদ্ধান্তহীনতা তথা পলিসি প্যারালিসিস্ সংক্রান্ত সমস্যা। এমন একটা সময় শাসকশ্রেণীর দরকার এমন একটা সরকার, যে হবে কর্পোরেট পুঁজির পরম বন্ধু। দরকার, গণআন্দোলন দমনে সিদ্ধহস্ত একটা ফ্যাসিস্ট শাসন। দরকার, এমন একটা শাসক দল, যার কোয়ালিশন সরকারের দায়বদ্ধতা মেনে চলতে হবে না। চাই এমন একটা নেতা, যিনি দলের অভ্যন্তরেও সবরকম গোষ্ঠী কোন্দলকে বরদাস্ত করবেন না। মোদির মধ্যে তারা খুঁজে পেল এই 'সর্বগুণে'র সমাহার। ফলে যা হবার তাই হল, মাত্র ৩৩ শতাংশ ভোট পেয়েও মোদি এমন একটা সরকার গড়ল, যা সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আসনের 'ম্যাজিক ফিগার' ছুঁয়ে ফেলল অনায়াসে। ভারতীয় গণতন্ত্রের এমনই মহিমা, ভোটপ্রাপকের নিরিখে যারা দ্বিতীয় বৃহত্তম, সেই বহুজন সমাজ পার্টির ঝুলিতে কিন্তু একটি আসনও রইল না! ভোটপ্রাপকের নিরিখে তৃতীয় বৃহত্তম হল বামফ্রন্টের মিলিত ভোট। তারাও জাতীয় রাজনীতিতে আরো বেশি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ল। যাই হোক, মোদির প্রচারে কোমর বেঁধে নামল কর্পোরেট মিডিয়া। কারণ, দেশবিদেশের কর্পোরেট পুঁজির মোদিকে দরকার। আর এনডিএ সরকার হল এমন এক সরকার, যেখানে শরিকদের চলতে হবে মোদির দয়ায়, কেননা শরিকদের সমর্থনের উপর প্রধান দল বিজেপির তেমনভাবে কোনো নির্ভরতা নেই। শুধু তাই নয়, এখন কর্পোরেট পুঁজি চেষ্টা চালাচ্ছে মোদিকে 'সর্বশক্তিমান' করে গড়ে তুলতে। ইতিমধ্যেই তারা মহারাষ্ট্র নির্বাচনে শিবসেনাকে 'সব্‌ক'

শিখিয়েছে। নীতিশ কুমার, লালুপ্রসাদ, মমতা ব্যানার্জিরাও কেন্দ্রের অতি সক্রিয়তায় বিব্রত বোধ করছেন এবং সরব হচ্ছেন। ১৯৯২ সালের বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পান্ডাদের সাজা হল না, অথচ ১৯৯৭ সালের মামলায় জয়ললিতার সাজা হয়ে যাওয়াটার পেছনেও অনেকেই কেন্দ্রে এবং কর্পোরেট পুঁজির 'অতি তৎপরতা'র ইঙ্গিত পাচ্ছেন। দলের অভ্যন্তরেও লালকৃষ্ণ আদবানি, মুরলীমনোহর যোশিদের অপাঙ্‌তেয় করে দেওয়া হয়েছে, অথচ কুখ্যাত অমিত শাহ্‌কে করে দেওয়া হয়েছে সর্বভারতীয় সভাপতি। বোঝাই যাচ্ছে, মোদি দলের মধ্যেও নিরঙ্কুশ ক্ষমতাকে ইতিমধ্যেই কুক্ষিগত করে ফেলছেন ক্রমশ।

লক্ষণীয় যে 'স্বদেশী জাগরণে'র ভাষণ আর বিজেপির কোনো নেতার মুখেই আগের মতো শোনা যাচ্ছে না। এমন একটা সরকারই তো এদেশের শাসক-শোষক শ্রেণী চাইছিল। আর তা গড়তে যে তারা তৎপর হবে, এতে আর আশ্চর্যের কী আছে! দেখা গেল, মোদিকে প্রধানমন্ত্রী বানাতে তারা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করল ।

অভিযোগ উঠল, স্রেফ মোদিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরতেই খরচ করা হয়েছে প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা! প্রচারের বহর দেখে এই অভিযোগের সত্যতা নিয়ে সন্দেহেরও অবকাশ থাকে না। বিজ্ঞাপন জনসংযোগে রাজনৈতিক দিক থেকে মোট খরচ হয়েছিল ১০ হাজার কোটি টাকা, যার মধ্যে বিজেপি একাই খরচ করেছে ৫ হাজার কোটি টাকা। দেশ জুড়ে অন্তত ১৫ হাজার তাক লাগিয়ে দেওয়া মোদির ছবিসহ হোর্ডিং ছিল টানা তিনমাস ধরে। সস্তার এলাকায় হোর্ডিং পিছু ২-৩ লাখ টাকা খরচ করেছে বিজেপি আর মুম্বাইয়ের নরিম্যান পয়েন্টের মতো জায়গায় এই খরচ ২০ লক্ষ টাকা। ফলে হিসেব বলছে, বিজেপির স্রেফ হোর্ডিং লাগাতেই খরচ হয়েছে ২,৫০০ কোটি টাকা। প্রাইম চ্যানেলে বিভিন্ন ভাষায় সংবাদ, বিনোদন, খেলাধুলোর ফাঁকে বিজ্ঞাপনের জন্য ২০০০ স্পট কিনেছিল বিজেপি। তিরিশ সেকেন্ডের জন্য যার খরচ ৮০ হাজার টাকা। এক্ষেত্রেও সব মিলিয়ে খরচ হয়েছে ৮০০ থেকে ১০০০ কোটি টাকা। 'টি টুয়েন্টি'-তে বিজ্ঞাপন বাবদ খরচ ১৫০ কোটি টাকা। অনলাইন রেডিওতে ৩৫ কোটি টাকা। পাশাপাশি বিজেপির প্রিন্ট মিডিয়া সেল সূত্রের খবর অনুযায়ী ৫০০ কোটি টাকা খরচ করে ৫০টি জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরের সেরা বাছাই করা সংবাদপত্রের সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গায় ৪০ দিন ধরে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। জাতীয় স্তরের একটি অন্যতম বৃহত্তম সংবাদপত্রের সাথে চুক্তি করে প্রায় ১০০ কোটি টাকা খরচ করে, বিজেপি ওই সংবাদপত্রের সমস্ত প্রকাশনায় সব সংস্করণে দিয়ে গেছে পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে বিজ্ঞাপিত, এমন ৪২টি ঢাউস বিজ্ঞাপন।

এখানেই শেষ নয়, ২০১৩ সালের মার্চ মাসে 'এপেকো' নামক একটি মার্কিন সংস্থার সাথে গুজরাত সরকারের চুক্তি হয়। প্রচুর টাকার বিনিময়ে তারা গুজরাতের মোদি সরকারের গুণগান গাইবে। তারা 'টাইমস্ অফ্ ইন্ডিয়া', 'হিন্দুস্থান টাইমস্', 'হিন্দু'র মতো জাতীয় স্তরের সংবাদ পত্রগুলিতে এবং 'ইন্ডিয়া টুডে', 'ফ্রন্টলাইন', 'আউটলুকে'র মতো জাতীয় স্তরের প্রথম সারির ম্যাগাজিনগুলোতে এমন সব সংবাদ এবং নিবন্ধ ছাপানোর ব্যবস্থা করবে, যার মধ্যে দিয়ে গুজরাতের ভাবমূর্তিকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিকস্তরে তুলে ধরা যায়। সরকারি পয়সায় মিউচ্যুয়াল পি আর নামের একটা দেশীয় সংস্থাকেও প্রায় একই কারণে নিযুক্ত করা হল। এছাড়াও সরকারি

পয়সার আরো নানাভাবে যথেচ্ছে ব্যবহার করে 'ভাইব্র্যান্ট গুজরাত'-এর ভাবমূর্তিকেও তুলে ধরা হল। এই যে এত প্রচারের ঢক্কানিনাদ, এর সিংহভাগটাই কিন্তু কর্পোরেট পুঁজির সৌজন্যে তারা পেল। কর্পোরেট পুঁজি টাকা ঢালল 'পছন্দের' নেতাকে 'জনপ্রিয়' করার জন্য। পাশাপাশি কর্পোরেটের বিজ্ঞাপনের টাকায় চলা মোদিবিরোধী সাংবাদিকদের কড়কানোর কাজটাও চলল পাল্লা দিয়ে। সিদ্ধার্থ ভরদ্বাজ, নিখিল ওয়াগলে, সাগরিকা ঘোষদের মতো সাংবাদিকরা মোদি বিরোধিতা করে রাজরোষে পড়লেন। কর্পোরেটদের বিরাগভাজন হলেন। কারো চাকরি গেল। কাউকে হুমকি শুনতে হল। এমনকি মনোজ শিন্ডে, ভরত দেশাইয়ের মতো যেসব স্থানীয় সাংবাদিক মোদির গুজরাত সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে সংবাদ পরিবেশন করেছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে 'রাজদ্রোহে'র অভিযোগে মামলাও করা হল। এইসব কিছুর পরও মূলগতভাবে কর্পোরেট মিডিয়ার সিংহভাগ, কর্পোরেট পুঁজিপতিদের সিংহভাগ মোদির পক্ষে থেকে গেল। কেনই বা থাকবে না? একবার ভাবুন তো, এই মোদিই তো গুজরাতে টাটার ন্যানো কারখানার জন্য জমি দিয়েছে জলের দরে, এই জমি থেকেই টাটারা লাভ করেছে সরাসরি ২২ হাজার কোটি টাকা। যে টাটার ন্যানো কারখানাকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সংগ্রাম করে কৃষিজমি দখল করতে দেয়নি, অন্তত প্রাথমিকভাবে পিছু হঠিয়ে দিয়েছিল, মোদি তাকেই সাদরে ডেকে নিয়ে গিয়ে জলের দরে জমি দিয়ে দিলেন নিজের 'শিল্পবান্ধব' ভাবমূর্তি নির্মাণের স্বার্থে। শুধু তাই নয়, টাটার ন্যানোর প্রকল্পে তারা ২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের জন্য প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার ভর্তুকিই দিল বলা যেতে পারে। প্রায় বিনা সুদে (০.০১ শতাংশ হারে সুদে) তারা দিল ৯,৭৫০ কোটি টাকা ঋণ। তাও আবার তা ২০ বছরে শোধ করলেই হবে। ১৫ শতাংশ ভ্যাট ছাড়। রেজিস্ট্রেশন ফি মকুব। লাগেনি কোনো স্ট্যাম্প ডিউটি। ময়লা নিষ্কাশন এবং বর্জ্য পদার্থ সরিয়ে ফেলার দায়িত্ব নিয়ে নিল গুজরাত সরকার। প্রবেশপথের জন্য ১১০০ একর জমি জলের দরে দিয়ে দেওয়া হল, যা আট কিস্তিতে শোধ করলেই হবে। যখন গণআন্দোলনের চাপে টাটা পশ্চিমবঙ্গ থেকে পিছু হঠছেই শুধু নয়, বিশ্বজুড়ে টাটাদের জমি লুণ্ঠন প্রশ্নের মুখে পড়ছে, টাটারা ধিক্কৃত হচ্ছে, তখন মোদি হয়ে উঠল টাটাদের আশ্রয়দাতা! অথচ দ্বিচারিতা এমনই, রাজ্য বিজেপি কিন্তু সেদিন সিঙ্গুরের কৃষকদের পক্ষেই গলা চড়িয়েছিল!

শুধু টাটাই নয়, মুন্দ্রার সেজ প্রকল্পের জন্য আদানি গোষ্ঠীকে গুজরাতে মুখ্যমন্ত্রিত্বে থাকালীন মোদি জমি দিয়েছেন বর্গ মিটার পিছু ১ টাকা দরে। এল অ্যান্ড টি-কেও ৮০ হেক্টর জমি দেওয়া হয়েছে বর্গমিটার পিছু ১ টাকা দরে। এসার স্টিল প্রজেক্টকে পরিবেশ আইনের তোয়াক্কা না করেই শিল্পের জন্য বনভূমি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রচুর পরিমাণে। লার্সেন অ্যান্ড টুবরো, মারুতি কোম্পানিকেও প্রভূত পরিমাণ জমি সেসময় মোদি সরকার তুলে দিয়েছিল, বলা যেতে পারে জলের দরেই। এসব কারণে মোদিই তখন কর্পোরেট পুঁজির কাছে উন্নয়নের 'পোস্টার বয়'। তারা হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করল মোদিকে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসানোর জন্য। বাঘা বাঘা সাংবাদিকরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মিডিয়ার অধিকাংশ সময় জুড়ে তখন 'মোদি কথা' প্রচারিত হল! গুজরাত গণহত্যার নায়ক মোদি ভাই হয়ে উঠলেন আম্বানিদের চোখে 'দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা'। 'মানুষদের প্রভু'। 'নেতাদের নেতা'। 'রাজাদের মধ্যে রাজাধিরাজ'। টাটার চোখে গুজরাত তখন 'শিল্পপতিদের সবচেয়ে ভরসার ঠিকানা'।

বাজারি মিডিয়া প্রচার করল বিরাট অগ্রগতি হয়েছে মোদির গুজরাতে। প্রচারের দৌলতে গুজরাতের 'উন্নয়ন'-এর ফানুস আকাশে উড়ল। চাপা পড়ে গেল, গুজরাত গণহত্যার সময়কার নিহতদের পরিজনদের আর্তচিৎকার। চাপা পড়ে গেল, নারীর পেট চিরে গর্ভস্থ ভ্রূণ তলোয়ারের ডগায় খুঁচিয়ে তুলে আনার সেই নৃশংস দৃশ্য। চাপা পড়ে গেল, বেস্ট বেকারির নিহতদের দলা পাকানো লাশগুলি। এমনকি এত হইচইয়ের পরও চাপা পড়ে গেল ইশরাত জাহান-দের খুনের কথাও। শুধু তাই নয়, উন্নয়নের ঢক্কা নিনাদে ভারতের অধিকাংশ লোক জানলই না যে 'উন্নত' গুজরাতে নরেন্দ্র মোদির জমানায় ৯,৮২৯ জন শ্রমিক, ৫,৪৪৭ জন কৃষক ও ৯১৮ জন ফার্ম মজদুর দারিদ্রের জ্বালায় আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন!

বস্তুত উন্নয়নের প্রকৃত চিত্রটি গুজরাতে ছিল বড়োই করুণ। দারিদ্র, ক্ষুধা, অপুষ্টি, বঞ্চনা আর হাহাকারের এক হাড়হিম করা চিত্র। কর্পোরেট মিডিয়ার প্রচারের সঙ্গে বাস্তবে যার কোনো মিলই নেই! যদি উন্নয়নকে আর্থিক প্রবৃদ্ধির নিরিখে বিচার করি, তবে একটা কথা শুরুতেই মাথায় রাখতে হবে, বন্দর-শহর হওয়ার কারণে বাণিজ্যিক বিকাশের দিক থেকে গুজরাতের শহরগুলি বরাবরই একটু ব্যবসা বাণিজ্যে সমৃদ্ধ। নরেন্দ্র মোদির সময়ের চেয়ে পূর্বতন কংগ্রেস জমানায় এই বিকাশের হার বেশি তো ছিলই, এমনকি তা একটুআধটু বেশি নয়, মোদি জমানার প্রবৃদ্ধির দ্বিগুণ ছিল! যদি ধরে নেওয়া হয় উৎপাদনের (GSDP) বিচারে, তাহলেও দেখব মোদির গুজরাতকে ফেলে এগিয়ে ছিল বিহার, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু! এমনকি মোদি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগেও গুজরাতের উৎপাদন ছিল পরবর্তী মোদি জমানার দ্বিগুণ।

রাজন কমিটির সুপারিশকে যদি ধরি, যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্রয়ক্ষমতা, নারী এবং তফশিলি জাতি-উপজাতিদের অবস্থা, উন্নয়নে সমাজের সকল অংশের প্রতিনিধিত্বের মতো দশটি মানদণ্ডকে ধরা হয়েছিল। তার ভিত্তিতে রাজন কমিটি যে উন্নয়নভিত্তিক রাজ্যের তালিকা প্রস্তুত করল, তাতে মোদির গুজরাতের স্থান হল ২৮টি রাজ্যের মধ্যে ১৭তম। মানবোন্নয়ন সূচকের ভিত্তিতে ধরলেও গুজরাতের স্থান দেশের মধ্যে একাদশতম। রঘুনাথম কমিটি পশ্চাদপদতার নিরিখে দেশের রাজ্যগুলির যে তালিকা বানাল, তাতে ২৮টা রাজ্যেকে তিনভাগে ভাগ করা হল। ৭টি উন্নত রাজ্য। ১১টি কম উন্নত রাজ্য এবং আরো স্বল্পোন্নত ১০টি রাজ্য। মোদিজির গুজরাত সেখানে স্থান পেল কম উন্নত রাজ্যের তালিকায়। সম্প্রতি বিশ্বায়নের অর্থনীতির পক্ষের উকিল পণ্ডিতদের দব্‌দবার যুগে, বিনিয়োগের নিরিখে উন্নয়নকে পরিমাপের বিষয়টা বেশ চর্চিত হচ্ছে। তার নিরিখেও মোদিকে 'ফার্স্ট বয়' বলা যাচ্ছে না। কেননা সোশিয়ো ইকনমিক্ রিভিউ-২০১২-এর তথ্য বলছে, ২০১১ সালে গুজরাতে ২০ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছিল, কিন্তু বাস্তবে লগ্নি হয়েছিল ২৯ হাজার ৮১৩ কোটি টাকা, অর্থাৎ শতাংশের হিসাবে মাত্র ০.২৫ শতাংশ। ৮৩০০টি মউ স্বাক্ষরিত হলেও বাস্তবায়িত হয়েছিল ২৫০টি। ঘটনা হল প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগেও গুজরাতের স্থান প্রথমে নয়, পঞ্চমে। প্রথমে রয়েছে মহারাষ্ট্র।

তবে কয়েকটা ব্যাপারে মোদির গুজরাত ছিল দেশের মধ্যে প্রথমে। যেমন, দারিদ্র বৃদ্ধির প্রশ্নে। একেবারে প্রথম নয়, তবে প্রথম সারিতেই, চতুর্থ। ২০০১ সালে যেখানে দারিদ্র ছিল ৩২ শতাংশ মোদি জমানায় দশ বছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৯.৫ শতাংশ। আদিবাসী উচ্ছেদের

প্রশ্নে। অনেকেই হয়ত খবর রাখেন না, নরেন্দ্র মোদির গুজরাতে ৪৭.৯ শতাংশ আদিবাসী স্থায়ীভাবে বাস্তুভিটেহীন হয়ে গেছে। দারিদ্র এতটাই তীব্র ছিল যে, গুজরাতের ৪৭ শতাংশ শিশুর ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে কম। ইউনিসেফের রিপোর্ট অনুযায়ী অনূর্ধ্ব ৫ বছরের ৫০ শতাংশ শিশু অপুষ্টির শিকার। ৭৫ শতাংশ শিশু রক্তাল্পতার শিকার। ৪৬ শতাংশের ওজন গড় ওজনের চেয়ে কম। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ২৮.২ শতাংশ পুরুষদের ও ৩২.৩ শতাংশ মহিলাদের ওজন গড় স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে কম। ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে মোদির গুজরাতে ৮০ শতাংশ মহিলাই রক্তাল্পতার শিকার। শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্যেও গুজরাত দেশে প্রথম। যেখানে গুজরাতে লিঙ্গবৈষম্য ১৩.৩ শতাংশ সেখানে তা মহারাষ্ট্রে ০.০৬ শতাংশ, তামিলনাড়ুতে ১.২৪ শতাংশ। শিক্ষার গুণগত মান এতটাই খারাপ যে ইউনিসেফের প্রথম সমীক্ষা রিপোর্ট বলছে যে, গুজরাতে পাঠ্যবই পড়তে পারে, ঘড়ি দেখে সময় বলতে পারে, পয়সা গুনতে পারে এবং প্রাথমিক স্তরের যোগ-বিয়োগ অঙ্ক কষতে পারে, এমন ছাত্রের সংখ্যা বিহারের চেয়েও কম! ইউনিসেফের ২০১১-র সার্ভে অনুযায়ী শ্রম অসন্তোষে গুজরাতের স্থান একনম্বরে। 'দলিত হক্ মঞ্চ' বলে একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী গুজরাতে প্রায় ৮ লক্ষ শিশু শ্রমিকের বাস। প্ল্যানিং কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী গুজরাতে দলিতদের মধ্যে চরম দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করে গ্রামে ২১.৮ শতাংশ এবং শহরে ১৬ শতাংশ। অর্ধেকের কাছাকাছি আদিবাসী দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না। ২০০৪-০৫ থেকে ২০১২-১৩-র মধ্যে সরকারি চাকরিতে মুসলিমদের সংখ্যা প্রায় ১০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। একই সময় সেলফ্ হেল্প গ্রুপে মুসলিমদের অংশগ্রহণ হ্রাস পেয়েছে প্রায় শতকরা চল্লিশ ভাগ।

গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন মোদি একদিকে যেমন কর্পোরেট মালিকদের দানখয়রাতিতে ছিলেন মুক্তহস্ত, কৃষক এবং মেহনতি মানুষদের বেলায় ছিলেন ততটাই কৃপণ। কর্পোরেট মালিকরা সস্তায় জমি পেয়েছে। বিদ্যুৎ পেয়েছে। জল পেয়েছে। অথচ কৃষকরা ভরতুকি সবচেয়ে কম পেয়েছে মোদি শাসিত গুজরাতে। সারের উপর ভ্যাটের পরিমাণ ছিল মোদিশাসিত গুজরাতে ৫ শতাংশ, দেশের মধ্যে কোথাও সারের উপর এত ভ্যাট নেওয়া হয় না। 'হতদরিদ্র' টাটাদের ক্ষেত্রে ভ্যাটে ছাড়, অথচ 'কোটিপতি' কৃষকদের জন্য দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভ্যাট চাপানো হল! মোদি জমানায় গুজরাতে ৩.৯৮ লক্ষ কৃষক বিদ্যুৎ সংযোগ পায়নি। প্ল্যানিং কমিশনের তথ্য অনুযায়ী গুজরাতে স্বাস্থ্যে ব্যয় ১৯৯০-৯৫ সালে যেখানে ছিল ৪.২৫ শতাংশ, মোদির জমানায় (২০০৫-২০১০ সালে) তা কমে হয়েছে ০.৭৭ শতাংশ। পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিনেও গুজরাতে ভ্যাট দিতে হয় দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। পরিবহন সংক্রান্ত গ্যাস সিএনজি'র উপর ভ্যাটও দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল মোদির গুজরাতে।

'লগ্নিবান্ধব' ভাবমূর্তি বানাতে গিয়ে পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গুজরাতে মারাত্মক পরিমাণে। ভাবনগর জেলাতে নিরমা কোম্পানিকে মোদি সরকার দিয়ে দিয়েছে বিরাট পরিমাণ জলাভূমি, যার ফলে অন্তত ৯টি খরাপ্রবণ গ্রাম স্থায়ী সর্বনাশের দিকে এগোচ্ছে। ম্যানগ্রোভ অরণ্য নষ্ট হয়েছে গুজরাতের ৩৫ শতাংশ। শুধু তাই নয়, গুজরাতের শহরগুলি আজ জঘন্য ধরনের পরিবেশ দূষণের শিকার। ভাবনগর জেলায় একটি পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে, যার ফলে একদিকে যেমন পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তেমনি অনুমান করা হচ্ছে প্রায় ২৪টি গ্রামের ১৫ হাজার

মানুষ সরাসরি উৎখাত হবেন। ১৫২টি গ্রামের দেড় লক্ষ মানুষ পরমাণু তেজস্ক্রিয়তার শিকার হবেন। বড়ো বড়ো শিল্প-তালুক হওয়ার জন্য গুজরাতের কোলাক, মাহি, দমনগঙ্গা, আমলাখাদির মতো নদীগুলো জঘন্য রকমের দূষণে আক্রান্ত।

পরিবেশ ধ্বংসের সাম্প্রতিকতম নিদর্শনটি ঘটেছে নর্মদা নদীর সর্দার সরোবর বাঁধটিকে কেন্দ্র করে। মোদিজি কেন্দ্রে ক্ষমতায় বসা মাত্রই 'উন্নয়নের স্বার্থে' নর্মদা নদী উপত্যকায় সর্দার সরোবর বাঁধ প্রকল্পের জন্য সুপ্রিম কোর্টের আদেশকে অস্বীকার করেন এবং দীর্ঘদিন ধরে চলা 'নর্মদা বাঁচাও' আন্দোলনের জনমতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, নর্মদা কন্ট্রোল অথরিটিকে বাঁধের জন্য পাঁচিলকে আরো ১৭ মিটার উঁচু করার অনুমতি দিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে গুজরাত, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশের অন্তত আরো আড়াই লাখ জনতা জীবন, জীবিকা, বসতি থেকে স্থায়ীভাবে উচ্ছেদ হবেন, যাঁদের অধিকাংশই আবার আদিবাসী। এটাই হচ্ছে উন্নয়নের মোদি মডেল।

দাবি করা হয়ে থাকে, গুজরাত নাকি কর্মসংস্থানে দেশের মধ্যে প্রথম। কিন্তু বাস্তবটা হল এটাই, কর্মসংস্থানের নিরিখে দেখলে গুজরাত ছিল এমন একটা রাজ্য, যেখানে বিগত দশ বছরের মোদি জমানায় কোনো পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা হয়নি। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার ১৯৯৩-১৯৯৪ থেকে ২০০৪-২০০৫ আর্থিক বছরে যেখানে ছিল ২.৪৩ শতাংশ, তা কমে এসে ঠেকেছে শূন্যে!! বেকারির হার ২০০৯-২০১০ সালে ছিল ৯.৯ শতাংশ, যেখানে জাতীয় গড় ছিল ৯.৩ শতাংশ। আর ২০১১-২০১২ সালে গুজরাতে তা আরো বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ শতাংশে।

এই যে এত করুণ দশা, তা সত্ত্বেও কেন এত ঢক্কানিনাদ? কারণ, কর্পোরেট পুঁজির কাছে উন্নয়ন মানে হল মুনাফা করার অবাধ স্বাধীনতা। লুঠ করার বৈধতা। ফলে লাভবান তারা হয়েছে তো বটেই। তারা কতটা স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠেছে, তা বোঝা যায় আদানি গোষ্ঠীর শ্রীবৃদ্ধি দেখলেই। ২০০২ সালে আদানিদের ব্যবসার পরিমাণ ছিল যেখানে ২৮১৬ কোটি টাকা। ২০১৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়াল ৩৫,৮৮১ কোটি টাকা! মোদিজি দিল্লিতে সরকার গড়বে বুথ ফেরত এই এক্সিট পোল রিপোর্ট শুনেই আদানি গোষ্ঠীর শেয়ার সূচক এত বেড়ে গেল যে, গত ১৬ মে শেয়ার বাজারের দৌলতেই তারা ঘরে তুলল ৬০ কোটি ডলার, টাকার অঙ্কে ৩৫০০ কোটি টাকা। আর একই দিনে মুকেশ আম্বানি লাভ করেন প্রায় ৫৮০০ কোটি টাকা। খবরে আরো প্রকাশ মোদি যেদিন প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসলেন অর্থাৎ ২৬ মে ২০১৪ (সোমবার) সেদিন থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত মুকেশ আম্বানির সম্পদ বেড়েছে ৫৩০ কোটি ডলার। আর এই সময়ের মধ্যে আদানির সম্পদ বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিনগুণেরও বেশি!

এহেন মোদি সরকার ক্ষমতায় এলে দেশটা যে গুজরাত মডেলেরই একটা বিস্তৃত রূপ হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বস্তুত সেদিকেই দেশ এগোচ্ছে। রেলভাড়া বেড়ে গেল ১৪.২ শতাংশ হারে। সঙ্গে বাড়ল পণ্য মাশুলও ৬.৫ শতাংশ। এর ফলে যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে তা তো স্বাভাবিক। তাহলে কোথায় গেল মূল্যবৃদ্ধি রোখার নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি? এ যে সরাসরি প্রতারণা! সারের দাম, খাদ্যসুরক্ষা, একশোদিনের কর্মসূচিতেও ভর্তুকি কমানোর কথা ঘোষণা করা হল ক্ষমতায় বসার সঙ্গে সঙ্গেই। জ্বালানি তেলে ২২,০৫৪ কোটি টাকা ভর্তুকি

কমানো হবে। প্রথমে কথা ছিল ডিজেলের দাম প্রতি মাসে লিটারে ৫০ পয়সা করে এখন থেকে বাড়ানো হবে, লক্ষ্য ডিজেলে ভর্তুকি শূন্যতে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া, যাতে পেট্রলের মতো ডিজেলের দামও নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা যায়, আর দাম চলে যায় বেসরকারি মালিকদের নিয়ন্ত্রণে। এটা ঘটনা যে আন্তর্জাতিক পুঁজির দ্বন্দ্বে কখনো কখনো পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমতেও পারে, সম্প্রতি যেমনটা ঘটেছে, কিন্তু এটা তো সাধারণ চিত্র নয়। সাধারণ চিত্রটা হল দামের ঊর্ধ্বগামিতা। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে ডিজেলের দামের সাময়িক অধোগামিতার সুযোগ নিয়ে পরবর্তীতে মোদি সরকার ডিজেলের দাম বিনিয়ন্ত্রণের ঘোষণা করতেও দেরি করল না!

গ্রাম উন্নয়নে গত বছর যেখানে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৫৬,৪০৮ কোটি টাকা, এবার বরাদ্দ হয়েছে মা ৩,০৮২ কোটি টাকা। সামাজিক খাতে গতবার যেখানে বরাদ্দ ছিল ১,৯৩,০৪৩ কোটি টাকা, সেখানে এবার বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ৭৯,৪১১ কোটি টাকা। তফশিলি জাতি-উপজাতিদের জন্য যোজনা বরাদ্দ কমানো হয়েছে যথাক্রমে ৪৭ হাজার কোটি টাকা এবং ১৪ হাজার কোটি টাকা। গতবছর সামাজিক কল্যাণ বাবদ বরাদ্দ হয়েছিল ৬,৮০,১২৩ কোটি টাকা এবার তা কমে হয়েছে ৪,৮৪,৫৩২ কোটি টাকা। এদিকে সাধারণ বাজেটে বীমা ও প্রতিরক্ষা শিল্পে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা ২৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪৯ শতাংশ করা হয়েছে। শিল্পে বিলগ্নিকরণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ৫৮,৪২৫ কোটি টাকা। বিলগ্নিকরণের খাড়া ঝুলছে বালকো, ওএনজিসি, সেইল, কোল ইন্ডিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলির মাথার উপর। দেশি- বিদেশি পুঁজিকে যখন ২২,২০০ কোটি টাকা প্রত্যক্ষ করে ছাড় দেওয়া হচ্ছে, তখন জনগণের উপর ৭,৫২৫ কোটি টাকার অতিরিক্ত পরোক্ষ কর চাপানো হয়েছে। ২০১২-১৩-র বাজেটে কর্পোরেট কর ছাড় দেওয়া হয়েছে ৬৭,৯৯৫ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গের নারী নির্যাতন নিয়ে রাজ্য বিজেপি টেলিভিশনের টক-শোয়ে অনেক বড়ো বড়ো কথা বলে, কিন্তু যে মোদির গুজরাতের কথা তাঁরা বলেন সেই গুজরাতের নারীর নিরাপত্তা কতটা? একটা ছোট্ট তথ্য শুনে নেওয়া যাক গুজরাতে মোদির 'সুশাসনে' শ্বশুরের ও স্বামীর অত্যাচারে মারা গেছেন ১৫ হাজার গৃহবধূ। নির্যাতিতা হয়েছেন স্রেফ ১২টি জেলাতেই ৫০ হাজার বধূ। ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ১২টি জেলাতে ১৪৪৩টি, নানা কারণে আত্মহত্যা করেছেন ৭৮৯৪ জন মহিলা। ৩ হাজারের উপর মহিলা অপহৃত হয়েছেন (বুঝুন, রাজ্যজুড়ে সংখ্যাটা কত হবে!)।

গণআন্দোলনের চাপে সংস্কারিত জমি অধিগ্রহণ আইনটিকে মোদি সরকার 'পুনরায় সংস্কার' করতে চলেছে। শতকরা পঞ্চাশ শতাংশ জমিদাতার সম্মতিতেই এখন কোনো প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণ করা যাবে, পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কারিত আইনে যেখানে দরকার ছিল অন্তত আশি শতাংশের সম্মতি! এছাড়া ক্ষতিপূরণের পরিমাণও কমানো হবে। মোদি সরকার এবছরের বাজেটে অন্তত ৫.৩২ লক্ষ টাকা রোজগার অবধি ব্যক্তিগত আয়কর ছাড় বাবদ দান করেছে, এদিকে যখন দৈনিক ২০ টাকার কম রোজগার করেন অধিকাংশ মানুষ, তখন তাঁর সরকার খাদ্যসুরক্ষা বিলটিকে ফাইল চাপা দিয়ে দিয়েছে। ১০০ দিনের কাজে জন্য বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে ব্যাপক হারে।

ক্ষমতায় বসেই মোদি সরকার ঘোষণা করেছিল মিডিয়ায় ১০০ শতাংশ এফডিআই-কে উৎসাহিত করা হবে। এদেশের অধিকাংশ মিডিয়ারই কাজ হল নিরপেক্ষতার মুখোশের আড়ালে সাম্রাজ্যবাদ, দেশীয় মুৎসুদ্দি বৃহৎ পুঁজি এবং সামন্তপ্রভু ও মহাজনদের স্বার্থবাহী ব্যবস্থাটাকে সেবা করা, জনগণের সংগ্রামকে বিপথগামী করা, জনগণের সংগ্রামের উপর চলমান রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে জনমানসে বৈধ বলে প্রতিপন্ন করা। বারবার তারা এই কাজটাই সুকৌশলে করে এসেছে। সাম্প্রতিককালে গণমাধ্যম তার আপাত নিরপেক্ষ চরিত্রটিও সরিয়ে ফেলে সরাসরি শাসকশ্রেণীর তাঁবেদারিতে নেমে পড়েছে। ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণী মূলবাসী-আদিবাসী জনগণের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চালাচ্ছে, যার পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে 'অপারেশন গ্রীন হান্ট', সেই যুদ্ধে মিডিয়ার জনবিরোধী ভূমিকাটি আরো স্পষ্ট হয়েছে। বলা বাহুল্য মিডিয়ায় ১০০ শতাংশ এফডিআই, এই কাজটিকেই আরো ত্বরান্বিত করবে। এমনিতেই সম্প্রতি চার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে মুকেশ আম্বানি সিএনএন-আইবিএন এবং তৎসংলগ্ন সমস্ত প্রচার মাধ্যম অর্থাৎ তাঁদের টিভি চ্যানেল, দৈনিক নিউজ পেপার, সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন সবকিছুই কব্জা করে নিয়েছেন। তারা কাদের স্বার্থবাহী 'নিউজ' পরিবেশন করবে, তা নিশ্চয়ই আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

১০০টি মেগাসিটি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সন্দেহ নেই যে, পুঁজির প্রভুদের লালসাকে মেটাতে এর ফলে প্রভূত পরিমাণে জলা সবুজ ভূমি, গাছপালা ধ্বংস করা হবে এবং নগরায়ণের নামে ইতিমধ্যেই যেভাবে গ্রামীণ জনতাকে জীবন, জীবিকা থেকে উৎখাত করা হয়েছে তা আরো তীব্রতর হবে।

ভারতে ওষুধের মূল্য নির্ধারণের ওপর নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার ব্যাপারে মার্কিন ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি চাপ সৃষ্টি করছিল অনেকদিন ধরেই। নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মার্কিন মুলুকে পা রাখার আগেই সে দেশের ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছিল যে, তাদের উদ্বেগের বিষয়গুলি যেন নয়াদিল্লির সঙ্গে আলোচনায় তোলা হয়। প্রধানমন্ত্রী আমেরিকা সফরে যাওয়ার আগে নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। কেন্দ্রে ইউপিএ জমানায় ওষুধের মূল্যনির্ধারণ সংক্রান্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান এনপিপিএ-র মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কিছু ওষুধের দামের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিল সরকার। তৎকালীন কেন্দ্রীয় রসায়ন মন্ত্রী শ্রীকান্ত জেনা'র দাবি, এমন কিছু ওষুধের দামের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছিল যেগুলি 'ন্যাশনাল লিস্ট অফ্ এসেন্‌শিয়াল মেডিসিন' তথা অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকাভুক্ত না হলেও জীবনদায়ী ওষুধ হিসেবে পরিচিত। এতে ক্যানসার, মধুমেহ, হৃদরোগ ও রক্তচাপজনিত সমস্যার প্রতিকারে ব্যবহৃত ওষুধের দাম এক ধাক্কায় অনেকটাই কমে গিয়েছিল। উদাহরণ দিয়ে জেনা বলেন, 'গ্লেভেক নামে ক্যানসারের যে ওষুধের দাম ছিল ১ লক্ষ ৮ হাজার টাকা, তা কমিয়ে সাড়ে ৮ হাজার টাকা করা হয়। বহু অ্যান্টিবায়োটিকের দামও কমিয়ে প্রায় অর্ধেক করা হয়। কিন্তু গত ২৬ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় রসায়ন মন্ত্রকের নির্দেশে এনপিপিএ জানিয়ে দিয়েছে, তারা ওষুধের মূল্য নির্ধারণের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে নিচ্ছে। একমাত্র দেশে আপৎকালীন পরিস্থিতি বা মহামারীর মতো সমস্যা দেখা দিলে তবেই মূল্য নির্ধারণের উপরে নিয়ন্ত্রণ আরোপ হবে। যদিও সরকারের একটি শীর্ষ সূত্র বলছে, জুলাই মাসের ১০ তারিখ এনপিপিএ অ্যান্টি-ডায়াবেটিক এবং হৃদরোগ সংক্রান্ত আরও ১০৮টি ওষুধের ওপরেও নিয়ন্ত্রণ

আরোপ করে। সেগুলি অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকায় নেই। এনপিপিএ-র এই সিদ্ধান্তে কিছু বহুজাতিক ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা আপত্তি জানাচ্ছিল। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে এনপিপিএ-র জুলাই মাসের নির্দেশিকা তথা সেই মোতাবেক নিয়ন্ত্রণও খারিজ হয়ে গেল। বলা বাহুল্য ঔষধ প্রস্তুতকারক বহুজাতিক সংস্থাগুলো যখন আরো বেশি বেশি করে এই নীতির কারণে মুনাফা করবে তখন, 'ভারতে ৪.১ কোটি মধুমেহ রোগে আক্রান্ত, হৃদরোগীর সংখ্যা প্রায় ৪.৭ কোটি, ১১ লক্ষ মানুষ ক্যানসারে ও প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ এইডসে ভুগছেন। সরকারের সিদ্ধান্তের ফলে এই রোগীরা ও তাঁদের পরিবার চরম দুর্দশায় পড়বেন।

নাগরিক অধিকার হরণে মোদি সরকার হাত পাকিয়েছে গুজরাত গণহত্যার মধ্যে দিয়েই তা নিয়ে আগের অধ্যায়েই আলোচনা করা হয়েছে। একথা আবার উল্লেখ করা দরকার যে, স্রেফ ২০০২ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে গুজরাতে অন্তত ঘোষিতভাবে ২৭টি ভুয়ো সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এগুলোর মধ্য সবচেয়ে চর্চিত হচ্ছে ইশরাত জাহান হত্যা মামলা। সেই মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত গুজরাত পুলিশের প্রাক্তন মহানির্দেশক কুখ্যাত বানজারা সবরমতি সেন্ট্রাল জেল থেকে একটি খোলা চিঠি দিয়ে এই সমস্ত বেআইনি হত্যার দায় সরাসরি তদানীন্তন মোদি সরকারের উপরই চাপিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসার পর থেকেই মোদির কাজকর্ম যে দেশজুড়ে অনেক বেশি নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের দিকে যাবে ইতিমধ্যেই তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। ইতিউতি মুসলিম জনগণের উপর নির্যাতনের ঘটনা শুরু হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানের খাগরাগড়ে একটি বিস্ফোরণের ঘটনায় এবং কিছু বিস্ফোরক খুঁজে পাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল এনআইএ-কে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং 'মুসলিম জেহাদি সন্ত্রাসের জুজু' নিয়ে মিডিয়া হাইপ্ তোলা হচ্ছে। এক্ষেত্রে 'আনন্দবাজার'-এর মতো শাসকশ্রেণীর মুখপত্রগুলি ন্যক্কারজনক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। কর্পোরেট মিডিয়াগুলো সরকারি পুলিশ গোয়েন্দাদের থেকেও অতিসক্রিয়তা ও বেশি তৎপরতা দেখিয়ে নিজেরাই 'নিরপেক্ষ অনুসন্ধান'-এর নামে 'ইসলামিক সন্ত্রাস'-এর নানা মনগড়া গল্প ফাঁদছে। দূরদর্শনের বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলে 'থ্রিলার' সিনেমার কায়দায় রহস্য-রোমাঞ্চপূর্ণ নাটকীয়ভাবে সে-সব 'নাশকতা'র গল্প পরিবেশন করা হচ্ছে। মুসলিমরা 'সন্ত্রাসবাদী' এধরনের সাম্প্রদায়িক ধুয়ো তোলার পাশাপাশি 'বাংলাদেশি জেহাদিদের সাথে যোগাযোগে'র গল্পটিকেও সামনে আনা হচ্ছে। নির্বাচনের আগে নরেন্দ্র মোদি এসে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর ইস্যুটিকে সামনে এনে ভোট ভাগাভাগি করতে চেয়েছিলেন। অদ্ভুত যুক্তি হল, যেসব মুসলিম জনগণ বাংলাদেশ থেকে এদেশে এসেছেন, তাঁরা বিজেপির চোখে 'অনুপ্রবেশকারী' আর এক্ষেত্রে হিন্দুরা হলেন 'শরণার্থী'! যাই হোক, ক্ষমতায় আসার পরই লক্ষণীয় যে তারা বর্ধমানের খাগরাগড় কাণ্ডকে সামনে রেখে একটা সাম্প্রদায়িক জিগির তোলার অপচেষ্টা করছে। এক্ষেত্রে তারা মাদ্রাসাগুলোকে তাদের লক্ষ্যবস্তু করে তুলছে। যদিও বীরভূমের পারুই গ্রামে শতাধিক বোমা পাওয়া গেছে বিজেপি সমর্থকদের হেপাজত থেকেও, তা সত্ত্বেও তাঁরা হচ্ছেন 'অহিংসার অবতার' সেখানে পুলিশি তৎপরতা চোখে পড়ে না, কিন্তু খাগড়াগড়ে ঠিক তার উল্টো চিত্র!

গণআন্দোলনের প্রশ্নেও মোদি কড়া হাতে মোকাবিলার ইঙ্গিত দিয়েছে। ইতিমধ্যেই পস্কো আন্দোলন এবং 'নর্মদা বাঁচাও' আন্দোলনের ক্ষেত্রে জনমতকে তোয়াক্কা না করে কঠোর সিদ্ধান্তের দিকে এগোচ্ছে মোদি সরকার।

অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের আমলে কেন্দ্রে নিবর্তনমূলক কালা কানুন 'পোটা' চালু করে তাঁরা এমসিসি এবং সিপিআই (এম-এল) [পি ডব্লু] সহ প্রায় চোদ্দোটি বিপ্লবী গণসংগঠনকে দেশজুড়ে নিষিদ্ধ করেছিলেন। পরে এই দুই দলের মিলনে যখন ঐক্যবদ্ধ পার্টি সিপিআই (মাওবাদী) গঠিত হল, তখন কেন্দ্রে পূর্বতন কংগ্রেস সরকার। তারাও ইউএপিএ নামক নিবর্তনমূলক নতুন কালা কানুন জারি করে দেশজুড়ে উক্ত কমিউনিস্ট বিপ্লবী সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম এবং রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি তখন মাওবাদীদের 'দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার পক্ষে প্রধান বিপদ' বলে চিহ্নিত করেছিলেন এবং 'অপারেশন গ্রীনহান্ট' নামক যুদ্ধাভিযান শুরু করেছিলেন। এরাজ্যের তৃণমূল সরকারও জনসাধারণের বিরুদ্ধে এই রাষ্ট্রীয় যুদ্ধের শরিক। বর্তমান মোদি সরকার জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই যুদ্ধাভিযানকে বৈধ করতে এবং তীব্র করতে দাবি করছে যে 'মাওবাদীরা পাকিস্তান বা চীনের চেয়েও বড় বিপদ'! প্রতিটি দেশপ্রেমিক মানুষেরই এহেন দাবির বিরোধিতায় সোচ্চার হওয়া উচিত। পাশাপাশি মোদি সরকার দেশের ভূমিপুত্র মাওবাদী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযানের এবং আকাশপথে আক্রমণের কথাও ঘোষণা করেছে এবং সম্ভবত খুব শীঘ্রই তারা এই হীন কার্যকলাপটি শুরু করতে চলেছে। বস্তুতপক্ষে আজ যে অঞ্চলটাকে 'মাওবাদী প্রভাবাধীন অঞ্চল' বলে উল্লেখ করা হচ্ছে, তার অধিকাংশটাই প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। দেশবিদেশের কর্পোরেট পুঁজি সেই সম্পদ লুঠের ব্যাপারে মরিয়া। তাই তাদের কায়েমি স্বার্থকে মাথায় রেখেই মনমোহন থেকে মোদি সকলের চোখে মাওবাদীরা হচ্ছেন দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। আসলে পূর্বতন মনমোহন সরকার থেকে বর্তমান মোদি সরকার – সবাই চাইছে এই সকল অঞ্চলকে কর্পোরেটদের অবাধ লুঠের রাস্তাকে প্রশস্ত করতে, কিন্তু তাদের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওই অঞ্চলের মাওবাদীদের নেতৃত্বাধীন চলমান জনযুদ্ধ, তাই তাকে ধ্বংস করতে আজ তারা এত তৎপর। মাওবাদীদের 'দেশদ্রোহী', 'সন্ত্রাসবাদী' তকমা দিয়ে নিজেরা 'দেশপ্রেমিক' সেজে 'দেশের সুরক্ষা'র দোহাই দিয়ে দেশিবিদেশি পুঁজিপতিদের এদেশের সম্পদ লুণ্ঠনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গণবৈপ্লবিক প্রতিরোধকে নিকেশ করতেই চলছে এই 'সবুজ শিকার অভিযান'। কোটি কোটি টাকা এই যুদ্ধাভিযানে খরচ করা হচ্ছে। আমার আপনার করের টাকায়, আমার আপনার ঘরের ছেলেমেয়েদেরই হত্যার নীল-নকশা আঁকছে এইসব প্রতিক্রিয়াশীলরা।

ক্ষমতায় বসার আগে মোদি যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আজ চলেছেন ঠিক তার উল্টো পথে। পূর্বতন মনমোহন সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশে বস্তুত নাগরিকদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের নজরদারি ব্যবস্থাকে (পড়ুন খোচরবৃত্তি বৃদ্ধিতে) জোরদার করার জন্য আধার কার্ড চালু করার কথা বলেছিল। সেসময় কৌশলী মোদি এব্যাপারে খানিকটা চুপ থেকে এবং খানিকটা বিরোধিতা করে একটা 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' মার্কা অবস্থান নিয়েছিলেন। আজ তাঁরা রান্নার গ্যাস রিফিলিংয়ের ব্যাপারে আধার কার্ডকে বাধ্যতামূলক হিসাবে পলিসি আনতে চাইছে।

একইভাবে ভোটের আগে তাঁরা ক্ষমতায় এলে একশোদিনের মধ্যে বিদেশ থেকে সমস্ত কালো টাকা উদ্ধার করবেন এই 'গল্প' শুনিয়েছিলেন। ক্ষমতায় আসার পর এব্যাপারে তাঁদের চূড়ান্ত অনীহা লক্ষ করা গেল। প্রথমে তো তাঁরা কালো টাকার মালিকদের নাম পর্যন্ত প্রকাশ করতে রাজি ছিলেন না, পরে সুপ্রিম কোর্টের ধমক খেয়ে একটা ৬২৭ জনের নামের তালিকা মুখবন্ধ করা খামে জমা দিলেন। যে নামের তালিকাগুলো আবার ২০০৬ সালের। অরবিন্দ কেজরিওয়াল আলাদা করে আবার ১৫জন শিল্পপতির নাম সুপ্রিম কোর্টে জমা দিয়েছেন, যাঁদের মধ্যে আছে আম্বানিদের নাম, যশোবর্ধন বিড়লার নাম। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, বিজেপি এঁদের নাম আড়াল করার মধ্যে দিয়ে কাদের আড়াল করতে চাইছে?

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নির্বাচনে অবাঞ্ছিত মোদি সরকারের হস্তক্ষেপের মধ্যেও ফ্যাসিবাদেরই ইঙ্গিত লক্ষ করা যাচ্ছে। যেকোনো রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আইনসভা, প্রশাসন এবং বিচারবিভাগ তিনটি স্বতন্ত্র সংস্থা হিসাবে কাজ করবে, এটাই বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি হিসাবে আজ অবধি পরিচিত হয়ে আছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একজন প্রাথমিক ছাত্রও এই রীতিনীতির কথা জানেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলা হয় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি। যার প্রবর্তকের মন্টেস্কু। ভারতরাষ্ট্র অন্তর্বস্তুতে কোনো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র না হলেও বহিরঙ্গের ভড়ংয়ে তা একটা সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, তাই এই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ভড়ং রাখার স্বার্থেও তাকে কিছুটা ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ ইত্যাদির কাগজে কলমে স্বীকৃতি রাখতে হচ্ছিল। ফলত এখানে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগে এতদিন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর প্রকাশ্যে নাক গলাত না। ইন্দিরা গান্ধির সময় এজাতীয় নাক গলানোর ঘটনা অবশ্য ঘটেছিল। বিচারপতির বিনা বিচারে আটকে রাখা বেআইনি এই রায় দেওয়ায় ইন্দিরার বিরাগভাজন হন বিচারপতি খান্না। ইন্দিরা গান্ধি তাঁকে বঞ্চিত করে বিচারপতি বেগকে সেসময় দেশের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করেছিলেন। এ ঘটনা নিয়ে সেসময় ইন্দিরা গান্ধির সরকার নিন্দিত হয়েছিলেন যথেষ্ট। বর্তমানে মোদি প্রধানমন্ত্রিত্বে বসার পর আবার তার পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা গেল। এদেশের ক্ষেত্রে ১৯৯৩ সালে 'সুপ্রিম কোর্ট অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড' মামলায় সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিয়েছিল, বিচারপতি নিয়োগের সমস্ত অধিকার সুপ্রিম কোর্টের হাতেই থাকবে। লক্ষণীয় যে, ১৯৩৩ সালের এই রায়ের পর থেকে কোনোদিন কোনো প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের জন্য সুপ্রিম কোর্টের পাঠানো বিচারপতিদের নাম নিয়ে আপত্তি করেননি। ব্যতিক্রম হলেন এবারের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সম্প্রতি দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি নিয়োগের জন্য সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম সুপারিশ করেছিল চারজনের নাম, তাঁদের মধ্যে বিচারপতি গোপাল সুব্রহ্মনিয়ামের নামে প্রধানমন্ত্রী আপত্তি জানিয়েছেন। কারণ হিসাবে যাই দেখানো হোক, এটা আজ দিনের আলোর মতো সত্য যে, ২০০৫ সালে সোহারাবুদ্দিন শেখ ও তাঁর স্ত্রী কৌসর বি-কে ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যার জন্য দায়ের হওয়া একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে নিরপেক্ষ বিচারের জন্য গোপাল সুব্রহ্মনিয়ামকে নিয়োগ করা হয়েছিল। এই মামলায় গুজরাতের ডিআইজি বানজারা সহ ৩২ জন পুলিশ আজো জেলে আছেন, এছাড়া মোদির দক্ষিণ হস্ত বলে পরিচিত অমিত শাহকেও কিছুদিনের জন্য জেলে যেতে হয়, সেই সময় বিচারপতি হিসাবে গোপাল সুব্রহ্মনিয়ামের সাহসী ভূমিকার কারণে আজ তিনি মোদির চক্ষুশূল। এছাড়াও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগে যাতে আইনসভা, বিশেষত

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর আরো বেশি বেশি হস্তক্ষেপ করতে পারে শোনা যাচ্ছে, তার জন্য বিল আনতেও চলেছে মোদি সরকার। এসবই ফ্যাসিবাদের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত সন্দেহ নেই।

গত ৩১ জুলাই থেকে মোদি সরকার কারখানা আইন ১৯৪৮, ট্রেড ইউনিয়ন আইন ১৯২৬, শিল্প বিবাদ সম্পর্কিত আইন ১৯৪৮, ঠিকা শ্রমিক আইন ১৯৭১, অ্যাপ্রেন্টিস আইন ১৯৬১ থেকে শুরু করে সমস্ত আইনকে সংস্কার করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এই আইন সংস্কারের মধ্যে দিয়ে কার্যত শ্রমিকদের যতটুকু আইনি অধিকার ছিল, তাও কেড়ে নেওয়ার বন্দোবস্ত পাকা করা হল। এর ফলে ওভারটাইমের সময়সীমা ৫০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১০০ ঘণ্টা করা হবে, যা বহু কারখানার শ্রমিকদের রক্ত-ঘামকে একেবারে নিংড়ে নেবে সন্দেহ নেই। এইসব সংস্কারের ফলে এখন শ্রমিক সংখ্যা ৩০০ জনের কম এমন কারখানাকে মালিকপক্ষ কোর্ট বা সরকারের অনুমতি ছাড়াই বন্ধ করে দিতে পারবে। আগে কোনো কারখানায় যেখানে ১০ শতাংশ শ্রমিক মিলেই একটা ইউনিয়ন নথিভুক্ত করাতে পারত, এখন সেখানে লাগবে কমপক্ষে তিরিশ শতাংশ শ্রমিকের সমর্থন। এগুলি সবই শ্রমিকের অধিকার হরণের দিকে আরো কয়েক কদম। মহিলাদের রাতের ডিউটির ক্ষেত্রেও আগে যা কিছু নিষেধাজ্ঞা ছিল তা শিথিল করা হয়েছে। এই লেখা যখন লিখছি তার কিছুদিন আগেই মোদি সরকার ১০০ দিনে পা দিয়েছে। প্রবণতাটা পরিষ্কার। মোদির উন্নয়নের মডেলে আমিরদের মুখের হাসি চওড়া হচ্ছে, আর গরিবদের জন্য না হয় হাতে রইল শুধু পেনসিল!

দশম অধ্যায়

মগজে গৈরিক সন্ত্রাস

প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসার পর মোদি প্রত্যাশিতভাবেই সাংস্কৃতিক জগতেও তাদের ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপ চালু করে দিয়েছেন। সম্প্রতি মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে প্রয়াত হয়েছেন সাংবাদিক এবং তথ্যচিত্র নির্মাতা শুভ্রদীপ চক্রবর্তী। মৃত্যুর কিছুদিন আগেই তিনি 'ইন দিনো মুজাফ্ফরনগর' নামে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছিলেন। তথ্যচিত্রটিতে সাম্প্রতিক মুজাফ্ফনগরে ঘটে যাওয়া দাঙ্গার পিছনের রাজনীতিটিকে উন্মোচিত করা হয়েছিল। স্বভাবতই এর ফলে আঙুল উঠছে সংঘ পরিবারের দিকে, তাই মোদি ক্ষমতায় আসার পরই দেখা গেল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনের পক্ষ থেকে ছবিটির ক্লিয়ারেনস্ আটকে গেল! শুধু তাই নয়, এর বিরুদ্ধে তিনি যখন ফিল্ম সার্টিফিকেশন এপিলেট ট্রাইবুন্যালে গেলেন, তখন সেখানেও তাঁর জন্য দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তথ্যচিত্র নির্মাতার অভিযোগ যে তথ্যচিত্রটিকে বন্ধ করতে স্বয়ং মোদি তৎপর হয়েছিলেন। একইভাবে আবার দেখা যাবে, বিজেপি ঘনিষ্ঠ দীননাথ বাত্রাকে, যাঁকে আঞ্চলিক প্রচার মাধ্যমগুলি 'বুক পুলিশ' (Book Police) এবং 'ব্যান্ ম্যান'(Ban Man) বলে ডেকে থাকে, তিনিও উঠেপড়ে লেগেছেন হিন্দুত্ববিরোধী কোনো বই প্রকাশিত হলে তা নিষিদ্ধ করতে। তাঁর কার্যকলাপ হল কোনো বই হিন্দুত্ববাদবিরোধী মনে হলেই তিনি প্রকাশককে আইনি নোটিশ পাঠান যে আপনার বইটি হিন্দুধর্মের ভাবাবেগকে আঘাত করছে অতএব ...। সম্প্রতি তিনি চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়েন্ডি ডোনিগার (Wendy Doniger)-এর একটি বইকে নিষিদ্ধ করতে তৎপর হয়েছেন। বাত্রা কিছু সমমনোভাবাপন্ন শিক্ষক, উকিলদের নিয়ে একটি 'শিক্ষা বাঁচাও কমিটি' বানিয়েছেন। তিনি গর্ব করে বলেন যে, 'আমাকে সবাই 'ব্যান্ ম্যান' যতই ডাকুক, যাঁরা হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করবেন, তাঁদের আমরা বাধা দিয়েই যাব ... গবেষণার নামে আমাদের হিন্দুধর্মকে বা আমাদের ধর্মের দেবদেবীকে অপমান করাকে আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না।' এই দীননাথ বাত্রাই আবার নরেন্দ্র মোদির এত পছন্দের লোক যে মোদি গুজরাতে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন গুজরাত সরকার তাঁর ৯টি বই পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই বইগুলির কয়েকটার মুখবন্ধ লিখেছেন আবার নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং। বইগুলোতে হিন্দুধর্মের গরিমা দেখাতে গিয়ে উদ্ভট সব বিষয়বস্তুতে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া লেখাগুলি উচ্চবর্ণবাদী সাম্প্রদায়িক এমন সব কথায় ভরপুর যে, যেকোনো সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষকদের পক্ষে তা পড়ানো অসম্ভব। পরে অবশ্য জনমতের চাপে কয়েকটি বই তুলে নিতে গুজরাত সরকার বাধ্য হয়। বাত্রার বইগুলি কতটা উদ্ভট ছিল, তার উদাহরণ হিসাবে বলা যায় তিনি সংস্কৃত ভাষার আধিপত্যের পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে যে কোনো কথ্য হিন্দুস্তানি ভাষাকেই বিদেশি উৎসের কারণে আপত্তি করেছেন। আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের শরীরের কৃষ্ণ বর্ণকে তিনি মোষের চামড়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রাচীন ভারতের গরিমাকে তুলে ধরতে গিয়ে তিনি দাবি করেছেন, প্রাচীন ভারতীয়রা নাকি মহাভারতের যুগেই স্টেমসেল পদ্ধতিতে চিকিৎসার মূলসূত্রগুলি আবিষ্কার করেছিলেন কিংবা সেই সময়ই নাকি ভারতীয়রা মোটরগাড়ি, এরোপ্লেন ইত্যাদির ব্যবহার জানত। তিনি তাঁর পাঠ্যবইয়ে এটাও লিখেছিলেন যে, গো-সেবা করলে বন্ধ্যা

নারী নাকি সন্তান লাভ করতে পারে। দীননাথ বাত্রা বেসরকারিভাবে একটি সমান্তরাল শিক্ষা কমিশন চালিয়ে যাচ্ছেন, যার লক্ষ্য হল শিক্ষার 'ভারতীয়করণের' জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা। বাত্রা সম্প্রতি দাবি করেছেন, এদেশের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি তাঁকে নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, শিক্ষায় ভারতীয়করণ (পড়ুন গৈরিকীকরণ) নিয়ে প্রদত্ত তাঁর প্রস্তাব সরকার বিবেচনা করবে। আমাদের দেশের কর্পোরেট মিডিয়ার 'পোস্টার বয়' নরেন্দ্র মোদি বাত্রার এই উদ্ভট ইতিহাসভাষ্য দ্বারা এতটাই প্রভাবিত যে প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসার পর গত ২৫ অক্টোবর ২০১৪, স্যার এইচ এন রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন হসপিটালের উদ্বোধন করতে গিয়ে মোদি বলেছেন, 'মহাভারতে আছে কর্ণ মাতৃগর্ভে জন্মাননি। তার মানে সেই সময় জেনেটিক বিজ্ঞানের অস্তিত্ব ছিল। ... আমরা গনেশজির পূজা করি, ঐ সময় নিশ্চয়ই কোনো প্লাস্টিক সার্জেন ছিলেন যিনি হাতির শরীরে মানুষের মাথা জুড়ে দিয়ে প্লাস্টিক সার্জারি প্রথম শুরু করেছিলেন'। (সূত্র: ১ নভেম্বর ২০১৪, 'দ্য হিন্দু' পত্রিকায় লেখা বিশিষ্ট সাংবাদিক করণ থাপারের নিবন্ধ)

কিছুদিন আগে একই মন্তব্য করেছেন মোদি মন্ত্রীসভার আরেক 'পণ্ডিত', স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেছেন, 'ওয়ার্নার হাইজেনবার্গের কোয়ান্টাম ফিজিক্স-এর 'প্রিন্সি ল অফ আনসার্টেনিটি' তত্ত্ব আসলে বেদ থেকে নেওয়া।' (সূত্র: ১৮ নভেম্বর ২০১৪, 'এই সময়') এই হিন্দুত্ববাদী 'মহাজ্ঞানী'রা জানেনও না যে বিজ্ঞানের বিকাশের প্রশ্নটা মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির দ্বন্দ্বে, মানুষের আধিপত্যের সাথে যুক্ত একটা ব্যাপার। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সাথে এর ওতপ্রোত সম্পর্ক। উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনোমতেই বিজ্ঞানের বিকাশ সম্ভব নয়। আমরা আগেই বলেছি, বৈদিক যুগে আর্যরা শুরুর দিকে ছিল একেবারে পশুপালনের স্তরে। উপনিষদের যুগে এসে সবেমাত্র কৃষিকার্যে তারা মনোনিবেশ করেছে। গোটা ঋগ্বেদিক যুগে তাদের শ্লোকগুলো প্রকৃতির কাছে অসহায় আত্মসমর্পণের প্রতিফলন। এরকম একটা সমাজে কোয়ান্টাম ফিজিক্সের তত্ত্ব খুঁজতে পারে কিংবা মহাভারতের যুগে বিজ্ঞানের আজকের বিরাট বিরাট আবিষ্কারগুলো খুঁজে পেতে পারে একমাত্র তাঁরাই, যাঁদের মস্তিষ্কে ভারসাম্যহীনতার সমস্যা আছে। এইসব মানুষের নেতৃত্বে 'আধুনিক ভারত' গড়ে উঠতে পারবে (!) মাফ করবেন, এতোটা কষ্টকল্পনা করার মতো ক্ষমতা আমাদের নেই!

ইতিহাসের বিকৃতকরণের ঘটনাটা অবশ্য নতুন নয়। সাভারকর থেকে হেডগেওয়ার হয়ে গোলওয়ালকর–বাজপেয়ী, আদবানি হয়ে আজকের নরেন্দ্র মোদি প্রত্যেকেই সুযোগ পেলেই এই ইতিহাস বিকৃতকরণে কোমর বেঁধে নেমেছেন বারবার। ঘটনা এটাই যে, প্রাচীন হিন্দুদের কোনো ইতিহাস লেখার অভ্যাসই ছিল না। এ বক্তব্য শুধু মাত্র আমার নয়, খোদ জওহরলাল নেহেরুর মতো শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধিদের। তিনি তাঁর 'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া'য় এ কথা স্বীকার করেছেন। মুসলমান শাসকরা বাইরে থেকে এদেশের আসার সময় তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বৌদ্ধ পরিব্রাজকদের হাত ধরে প্রথম এদেশের ইতিহাস লেখা শুরু হয়। ব্রিটিশরা এসে প্রথম তাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতার গরল ছড়াতে, বিকৃতভাবে এদেশের ইতিহাস লেখা শুরু করে। হিন্দুত্ববাদীরা এক্ষেত্রে ছিল তাদের দেশীয় দোসর। রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রথমবার বসার পর বাজপেয়ী সরকারের আমলে ইতিহাসের বিকৃতকরণের লক্ষ্যে আইসিএইচআর-এর নিয়োগে সরাসরি তাঁরা হস্তক্ষেপ করেছিলেন। আইসিএইচআর থেকে বাদ পড়েছিলেন অধ্যাপক সুমিত

সরকার, অধ্যাপক কে এম পানিক্কর, অধ্যাপক রোমিলা থাপার প্রমুখ প্রখ্যাত ইতিহাসবিদরা। তাঁদের সরিয়ে আনা হয়েছিল বি আর গ্রোভার, এম ভি শ্রীনিবাসকে। এঁরাই বাবরি মসজিদের তলায় মন্দির 'আবিষ্কার' করেছিলেন কোনোরকম তথ্যপ্রমাণাদি ছাড়াই। অযোধ্যা অঞ্চলে হিন্দুদের দ্বারা বৌদ্ধ মঠগুলো ধ্বংসের প্রমাণকে নস্যাৎ করেছিলেন। যদিও প্রত্নতাত্ত্বিকরা বহু ফিল্ড ওয়ার্ক করেও সরস্বতী নদীর কোনো প্রমাণ পাননি, তবুও এঁরা সে সময় সরস্বতী নদী 'আবিষ্কার' করেছিলেন। বাজপেয়ীর আমলে হরি গৌতমের মতো সংঘমনস্করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাথায় নিযুক্ত হয়েছিলেন, যাঁরা জ্যোতিষ শাস্ত্র, বাস্তুতন্ত্র, বৈদিক গণিত ইত্যাদির প্রচলনের আড়ালে শিক্ষায় গৈরিকীকরণে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

বর্তমান মোদি সরকার আবার একই কাজ শুরু করেছেন। সম্প্রতি আর এস এসের নেতা সুরেশ সোনি এবং দত্তাত্রেয় হোসবলে সহ বিভিন্ন শাখার নেতারা কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির সঙ্গে প্রায় সাত ঘন্টা বৈঠক করেছেন। সংঘ পরিবারের দাবি মেনে ইতিমধ্যেই মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি পড়ানোর জন্য একটা বিশেষ কমিটি গড়েছে। সংঘনেতা সুরেন্দ্র জৈনের সুপারিশ মেনে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক প্রযুক্তি শিক্ষার অন্যতম এলিট প্রতিষ্ঠান আইআইটিগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে কীভাবে আমিষ ক্যান্টিন আর নিরামিষ ক্যান্টিন আলাদা করা যায়, তা দেখতে। অর্থাৎ সরকার দায়িত্ব নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছোঁয়াছুঁয়ির বাছবিচার শেখাচ্ছে।

এখানেই তাঁদের কুকীর্তির শেষ নয়, তাঁরা ইতিহাস গবেষণা পরিষদ তথা আই সি এইচ আর-এর চেয়ারম্যান হিসাবে মাথায় বসিয়েছেন আর এস এসের অন্যতম সংগঠক সুদর্শন রাওকে। এই রাওয়ের সে অর্থে এই সংস্থার চেয়ারম্যান হবার মতো শিক্ষাগত কোনো যোগ্যতাই নেই। কোনো খ্যাতনামা জার্নালে আজ অবধি তাঁর কোনো লেখাপত্র প্রকাশিতও হয়নি। তাঁর একটাই যোগ্যতা ইতিহাসবিদ হিসাবে তিনি উচ্চবর্ণীয়, ব্রাহ্মণ্যবাদী, হিন্দু সাম্প্রদায়িক চিন্তার মতাদর্শের একজন একনিষ্ঠ সেবক। তিনি তাঁর নিজস্ব ব্লগে লেখা প্রবন্ধগুলোর দ্বারা ভারতের জাতিবর্ণ-ব্যবস্থার মহিমাকে প্রচার করেছিলেন।

আধুনিক ভারতের কথা বলে আজ মোদি সরকার যেভাবে প্রাচীন ভারতের মহিমা প্রচারে নেমেছেন, তার বিরুদ্ধে অবিলম্বে সমাজ সচেতন বিজ্ঞানমনস্ক প্রতিটি মানুষের সোচ্চার হওয়া দরকার। সব দেখে শুনে কবি জীবনানন্দ দাসের কবিতা ধার করেই বলতে ইচ্ছা করে–অদ্ভুত আঁধার এক নেমে এসেছে এ পৃথিবীতে আজ...।

একাদশ অধ্যায়

নরেন্দ্র মোদি কেন বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তি গড়তে এত ব্যগ্র?

মোদি সরকার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তি বানাতে চলেছে। শোনা যাচ্ছে, এর জন্য তারা প্রায় ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। মূর্তিটি উচ্চতায় নাকি হবে 'স্ট্যাচু অফ লিবার্টি'র দ্বিগুণ। 'স্ট্যাচু অফ লিবার্টি' গড়ে ওঠার পিছনে রয়েছে আমেরিকার লিবার্টি তথা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের এক গৌরবময় ইতিহাস। প্রশ্ন হল, প্যাটেলের মূর্তি গড়ার পিছনে রয়েছে কোন ইতিহাস?

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্যাটেলের ভূমিকা কী? একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে দেখে নেওয়া যাক। সালটা ১৯৪৬, অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনের প্রায় শেষ দিক। মাসটা ফেব্রুয়ারি। ভারতের নৌ-সেনারা ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করেছেন। এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে দেশের নানা প্রান্তে। কলকাতাতেও নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে শুরু হয়েছে হরতাল। প্যাটেল কিন্তু দেশপ্রেমিক এই নৌ-সেনাদের বিদ্রোহে মোটেই সমর্থন করলেন না, উল্টে সক্রিয় বিরোধিতা করলেন। বস্তুত সে-সময় নৌবিদ্রোহীরা বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও কংগ্রেসের নেতারা তাঁদের ডাকে কর্ণপাত করেননি। উল্টে তাদের বিরোধিতা এবং অসহযোগিতায় নৌ-বিদ্রোহীরা সেদিন অসম্মানজনক আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছিলেন।

এদিকে ব্রিটিশ শাসকরা বুঝে গেছে তাদের প্রত্যক্ষ শাসনের দিন শেষ হতে বসেছে। নৌ-বিদ্রোহের পর আবার শুরু হয়েছে ডাক ও তার কর্মচারীদের বিদ্রোহ, তেলেঙ্গানার বিদ্রোহ। একদিকে স্বাধীনতার আন্দোলনে উত্তাল দেশ, অন্যদিকে শ্রমজীবী মানুষরা নিজেদের অধিকারের দাবিতে আন্দোলনে সামিল। এই যখন অবস্থা, ব্রিটিশ সরকারের তখন নিজেদের বিপন্নতাকে কাটাতে দরকার একটা অন্তর্বর্তী সরকার। ডাক পড়ল তাদের বরাবরের ত্রাতা কংগ্রেসের। ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকেই এদেশের মুৎসুদ্দি বড়ো পুঁজির মালিক এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ছিল একে অপরের সাথে বিজড়িত। কংগ্রেস ছিল মূলত জমিদার আর এই সব বড়ো পুঁজির মালিকের দ্বারা অর্থনৈতিকভাবে মদতপুষ্ট। তাই সব সময়ই তারা এদের স্বার্থকে চরিতার্থ করাকেই ধ্যান-জ্ঞান মনে করত। এবারও তাই স্বাভাবিকভাবেই তারা এগিয়ে আসতে কুণ্ঠা করল না। ১৯৪৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর তারা নেহেরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করল। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল হলেন তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সে সময় মূলত প্যাটেলের নেতৃত্বেই শ্রমজীবী মানুষদের সংগ্রামে সেই অন্তর্বর্তী সরকার নামিয়ে আনল তীব্র দমনপীড়ন। বিশেষত কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের তারা ধরে ধরে রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে জেলে আটক করল। প্রবল দমনপীড়ন নামিয়ে বহু জায়গায় আন্দোলন ভেঙে দিল। পরবর্তীতে তেলেঙ্গানার ঐতিহাসিক সংগ্রামকে দমনের ক্ষেত্রেও আমরা দেখব জল্লাদের ভূমিকায় সেই প্যাটেলকেই। এহেন প্যাটেলই আবার আর এস এসের প্রতি নরম মনোভাব পোষণ করতেন।

ঘটনা হল এটাই যে, গান্ধি-হত্যার পর নেহেরু সরকার যখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে নিষিদ্ধ করল, প্যাটেলই তখন সেই সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সঙ্গতভাবেই তাই প্রশ্ন উঠছে, এহেন প্যাটেলের মূর্তি গড়তে আর এস এসের সংস্কৃতিতে লালিত পালিত হওয়া নরেন্দ্র ভাই মোদি এত

তৎপর কেন? ইতিহাসের দিকে যদি একটু তাকাই তাহলে দেখা যাবে, প্যাটেল কিন্তু বরাবরই ছিলেন হিন্দুত্বের পৃষ্ঠপোষক। হিন্দুত্ববাদী নেতাদের মধ্যে একাংশ শুরু থেকেই কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। সে সময় তাঁরা বরাবর প্যাটেলের সহযোগিতা পেয়েছেন। গান্ধি-হত্যার পর নেহেরু তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে যখন বলেন আর এস এস-কে কড়া হাতে দমন করতে, প্যাটেল বলেছিলেন, আর এস এস কোনোভাবেই গান্ধিহত্যার সাথে জড়িত নয়, হিন্দু মহাসভার একটি শাখা সংগঠন এর সাথে যুক্ত (সর্দার প্যাটেল'স্ সিলেক্টেড করেস্পনডেন্স, নবজীবন প্রকাশনী)। এর অনেক পরে ১৯৯৩ সালে নাথুরাম গড্সের ভাই গোপাল গড্সে 'কেন আমি গান্ধীকে হত্যা করেছি' শিরোনামে নাথুরামের বইটি উদ্বোধন করার সময় নাথুরামসহ তাঁদের সব ভাইয়ের সাথে আর এস এসের গভীর সম্পর্কের কথা স্বীকার করেন (দ্য স্টেটস্ম্যান, ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৩)। বস্তুত প্যাটেলের মধ্যস্থতাতেই সামান্য কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলার শর্তে আর এস এসের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৪৮ সালে কংগ্রেসের মিরাট অধিবেশনের প্যাটেল তাঁর ভাষণে হিন্দু মহাসভাকে কংগ্রেসের সাথে মিশে যেতে আহ্বান করেন এবং আর এস এস কর্মীদের 'প্রকৃত দেশপ্রেমিক' আখ্যা দিয়ে মিথ্যা অভিযোগে তাদের উপর দমনপীড়ন না চালিয়ে ভালবাসার মাধ্যমে তাদের টেনে আনার কথা বলেন। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি গান্ধিজিকে নাথুরাম গড্সে হত্যা করে, তারপর দেশজুড়ে সংঘ পরিবারের উপর স্বতঃস্ফূর্ত আক্রমণ নেমে আসে। বহু জায়গায় জনতা তাদের শাখা কার্যালয়গুলিতে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। মনে রাখতে হবে, এমন একটা পরিস্থিতিতে দেশজুড়ে যখন সংঘ পরিবারের বিরুদ্ধে জনরোষ আছড়ে পড়ছে, ঠিক তখন প্যাটেল 'আর এস এসকে বুকে টেনে' নিতে বলছেন।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানিমূলক ইন্ধন যোগানোর ব্যাপারেও প্যাটেল এবং সংঘ পরিবারের হিন্দুত্ববাদীদের মধ্যে মূলগত কোনো প্রভেদ লক্ষ করা যায় না। উদাহরণ হিসাবে যেমন একটা ঘটনার উল্লেখ করা যায়–১৯৪৬ সালের ১৯ অক্টোবর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল একটি চিঠিতে স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্কে লেখেন, 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস্ সম্বন্ধে আপনি শুনেছেন মনে হয়। কিন্তু এখন যা পূর্ববঙ্গে ঘটছে তা আরো অনেক খারাপ এবং নোয়াখালির কাছে কলকাতা একেবারে ম্লান হয়ে যায়। কলকাতায় হিন্দুরাই জয়ী হয়েছে, কিন্তু সেটা কোনো সান্ত্বনা নয়। নোয়াখালি কি তার বদলা?' পাঠকবন্ধুরা প্যাটেলের চিঠির শব্দচয়নগুলো একবার খেয়াল করুন, তাহলেই তার ভিতরকার সাম্প্রদায়িকতার গন্ধটি টের পাওয়া যাবে।

ঘটনা হল এর ঠিক ক'দিন পর নভেম্বরে মিরাটে অনুষ্ঠিত একটি অধিবেশনে প্যাটেল মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'তলোয়ারের জবাব তলোয়ার দিয়েই দেওয়া হবে'। জিন্না পরদিন একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন – 'তলোয়ারের জবাব তলোয়ার দিয়ে দেওয়া হবে এই কথার দ্বারা তিনি যদি বলতে চান ভারতের সর্বত্র সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সংখ্যালঘুদের জবাই করবে তাহলে ভবিষ্যৎ আতঙ্কজনক। আমি শুধু বলতে পারি, তিনি বোঝেন না বলে মনে হয় যে এইরকম জিনিসে যে ব্যক্তি উৎসাহ দেন সে প্রত্যেকটা সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো শত্রু।'

বস্তুত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়া থেকে শুরু করে দেশভাগে সক্রিয় হওয়া, কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় আক্রমণ থেকে শুরু করে জাতীয় সংহতির ধুয়ো তুলে জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষাকে পদতলে পিষে মারা, মুসলমান বিদ্বেষ ছড়ানো, কাশ্মীরে ৩৭০ নং ধারা বাতিলের দাবিতে অনড় থাকা – সমস্ত প্রশ্নেই হিন্দুত্ববাদীদের সাথে তাঁর চিন্তাধারায় প্রচুর মিল লক্ষ করা যায়। এরকম একজন ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞতা জানাতে সংঘ পরিবার আজ তাঁর পূর্ণাবয়ব মূর্তি নির্মাণ করবে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

আমাদের দেশের শাসকরা বরাবরই এরকম প্রচুর ব্যক্তিকে 'মহান' বানিয়ে এসেছে। এর মূল লক্ষ্য হল, ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়া। আর এই ইতিহাসকে বিকৃত করায় বিজেপি আবার সিদ্ধহস্ত। অতএব সাধু সাবধান!

দ্বাদশ অধ্যায়

মোদি মডেলের 'নির্মল' ভারত

'ভূতের মুখে রামনাম' বেমানান হলেও বিজেপি তথা সংঘ পরিবারের মুখে রামনাম বেমানান নয়, মানি। কেননা, মহাভারতীয় এই কাল্পনিক চরিত্রকে দেবতার উচ্চাসনে বসাতে তারা যে যথেষ্ট প্রচেষ্টা নিয়েছে, একথা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। কিন্তু তা বলে 'স্বচ্ছতার' কথা কি তাদের মুখে মানায়? এদিকে গান্ধি-হত্যার দাগও যে এখনো তাদের হাত থেকে ওঠে নি! নাকি বিজেপিওয়ালাদের সত্যিই 'হৃদয়ের পরিবর্তন' হয়ে গেল! যে সংঘ পরিবার গান্ধি-হত্যার পর আনন্দে মন মন লাড্ডু বিলিয়েছিল বলে খবর। গান্ধিঘাতক নাথুরাম গড্‌সে যে সংঘ পরিবারের সক্রিয় কর্মী ছিলেন, নাথুরাম গড্‌সের দাদা গোপাল গড্‌সের স্বীকৃতিতে তার প্রমাণ মেলে। যে সংঘ পরিবারকে গান্ধি-হত্যার পর নিষিদ্ধ করেছিল খোদ কেন্দ্রের তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার, সেই সংঘ পরিবারের হার্ডকোর স্বেচ্ছাসেবী মোদিজির কালে কালে এ কী হল, আজ আবার খোদ গান্ধিজির নামে দেশকে 'নির্মল' রাখার প্রয়াস!

নিন্দুকেরা যদিও বলছেন, মোদিজির সাম্প্রতিক এই যে 'স্বচ্ছতার রাজনীতি' এই রাজনীতিটাই আসলে অস্বচ্ছতার একটা বড়ো নিদর্শন। কারণ, গান্ধিজির নামে 'নির্মল' ভারত, 'স্বচ্ছ' ভারতের কথা যিনি বলছেন, তাঁর চেয়ে অস্বচ্ছ ভাবমূর্তিসম্পন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এদেশে খুব কমই আছেন। এই 'নির্মল' ভারতের ফেরিওয়ালা কিছুদিন আগেও ছিলেন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী, তখন এই গুজরাত হয়ে পড়েছিল নরক গুলজার। দেশের মধ্যে জঘন্যতম দূষিত রাজ্যের অন্যতম। সুপ্রিম কোর্টের পরিবেশ বিষয়ক গাইড লাইনকে কোনোরকম তোয়াক্কা না করেই মোদিজির সরকার তখন সেখানে জলাভূমি ভরাট করে বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিয়েছিল। মোদি আজ গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করার কথা বলছেন, অথচ কাল যদি কর্পোরেট পুঁজি চায় তবে মোদি এই কর্পোরেট পুঁজির হাতে তথাকথিত 'পবিত্র' গঙ্গাকে বেচে দিতেও পিছপা হবেন না। হ্যাঁ, এটাই ঘটনা। কারণ গুজরাতে মোদি জমানায় কোলাক, মাহি, আমলাখালি, দমনগঙ্গার মতো নদীগুলো ভয়াবহ দূষণের শিকার হয়েছে। কর্পোরেট পুঁজির বেপরোয়া ব্যবহারের কারণেই আজ নদীগুলোর এই দশা। কম্প্রিহেন্সিভ এন্‌ভায়রন্‌মেন্ট পলিউশন ইন্ডেক্স অনুসারে মোদি জমানায় গুজরাতে অন্তত ১৫টি অঞ্চল চিহ্নিত হয়েছিল যেগুলোয় দূষণের মাত্রা বিপজ্জনক সীমা অতিক্রম করেছিল।

মোদি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি)-এর রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, গুজরাতে সুরেন্দ্রনগরসহ বিভিন্ন এলাকায় দলিত নারী ও কিশোরদের দিয়ে প্রকাশ্যে মলমূত্র পরিষ্কারের কাজ করানো হত এবং তা মাথায় করে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে আসা হত। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, এই কাজটি দেশজুড়ে দু'দশক ধরে নিষিদ্ধ। নব্বইয়ের দশকেই এদেশে এমপ্লয়মেন্ট অফ ম্যানুয়াল স্ক্যাভেন্‌জার্স অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন্ অফ্ ড্রাই ল্যাট্রিনস্ অ্যাক্টটি চালু হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী মলমূত্রজাতীয় নোংরা আবর্জনা মাথায় বহন করানোর কাজটা দণ্ডনীয় অপরাধ। এই কাজ করালে দোষী ব্যক্তির ২ হাজার টাকা অবধি জরিমানা এবং ১

বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হতে পারে। অথচ মোদির শাসনাধীন গুজরাতে, খোদ সরকার এই বেআইনি কাজটা করিয়েছে দিনের পর দিন। পরে ২০০৮ সালে গুজরাত হাইকোর্টে এই প্রথার বিরুদ্ধে একটা জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়। অভিযোগ ওঠে, খোদ রাজ্য সরকার সরকারি তত্ত্বাবধানে এই নিকৃষ্ট ব্যবস্থা চালু রেখেছে। এরপর উচ্চ আদালত এ ব্যাপারে তদন্তের আদেশ দিলে, মোদি সরকার তড়িঘড়ি ওই ধরনের কর্মীদের ছাঁটাই করে কোনোমতে আইনি শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পায়।

২০১৩ সালের মার্চ অবধি ‘লোকাল বডিজ্ অফ্ গুজরাট’-এর রিপোর্ট বলছে, গ্রামীণ ভারতকে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর বানাতে যে ‘টোট্যাল স্যানিটেশন্ ক্যাম্পেইন্’ প্রকল্প রয়েছে মোদি জমানায় কখনোই তা ঠিকমতো কার্যকর হয়নি, কিন্তু পরিসংখ্যানের সময় গুজরাত সরকার পরিসংখ্যানে কারচুপি করেছে। গুজরাতে প্রায় ৫ হাজার অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে কোনো শৌচালয় নেই। ডাস্টবিন কেনার জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ২.৪১ কোটি টাকা কেন্দ্রের কাছে ফেরত গেছে। পরিবেশকে নির্মল রাখার ব্যাপারে জনমত গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্র সরকারের বরাদ্দ টাকার অর্ধেক খরচ করতে পারেনি মোদির মুখ্যমন্ত্রিত্বাধীন গুজরাত সরকার। জেলায় জেলায় রুরাল স্যানিটারি মার্টের শৌচালয় নির্মাণ থেকে সাবান সরবরাহের দায়িত্ব রাজ্যসরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির-কিন্তু গুজরাতের অধিকাংশ জেলায় তাদের সে দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া হয়নি। সিএজি’র রিপোর্ট অনুযায়ী গুজরাতের ১৫৯টি পুরসভার মধ্যে ১২৩টি পুরসভাতেই উন্মুক্ত স্থানে বর্জ্য পদার্থ, মলমূত্র ফেলা হয়।

ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচনের আগে মোদি গুজরাত মডেলে দেশ গড়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। কর্পোরেট মিডিয়া তখন এই গুজরাত মডেলের প্রকৃত চিত্রটি মানুষের সামনে আসতে দেয়নি। তারা গুজরাত মডেলের ‘মহিমা কীর্তনে’ ব্যস্ত ছিল। কিন্তু বেশিদিন তো শাক দিয়ে মাছ ঢাকা দেওয়া যায় না। অতএব প্রকৃত চিত্রটি সামনে আসা শুরু করেছে। গুজরাত মডেলে ‘স্বচ্ছতা’র যা চেহারা পাওয়া যাচ্ছে, তারই বিস্তৃত রূপ দেখা যাবে মোদির বর্তমান ‘স্বচ্ছতা’ নিয়ে ভাবনায়। যে ভাবনার ‘ওপর দিকটা পচা আর নীচের দিকটা গলা’।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সংঘ পরিবার গীতাকে কেন 'জাতীয় গ্রন্থ' ঘোষণার দাবি তুলছে?

নরেন্দ্র মোদি দিল্লির কুর্সিতে ক্ষমতার বসার পর থেকেই বিজেপির ঝোলা থেকে হিন্দুত্ববাদীদের নতুন নতুন সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন দাবিগুলো বেরোতে শুরু করেছে। সম্প্রতি বিজেপি নেত্রী এবং মোদির ক্যাবিনেটের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ, শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতাকে 'জাতীয় গ্রন্থ' হিসাবে ঘোষণার বাসনা প্রকাশ করেছেন। স্বভাবতই এ নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। একটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশে নিঃসন্দেহে এহেন চিন্তা অন্যায় এবং অযৌক্তিক। যদিও হিন্দুত্ববাদী তত্ত্বের দিক থেকে দেখলে এমনটাই দাবি তোলা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক বলে মনে হবে, কেননা তাঁদের থিঙ্ক ট্যাঙ্করা অনেকদিন আগেই বলে গিয়েছেন যে, এদেশটা কেবলমাত্র হিন্দুদেরই। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ তা মানবেন কেন? তাঁরা তাই সঙ্গতভাবেই এর বিরোধিতাও করছেন। অনেকেই যেমন বলছেন যে গীতা হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু মুসলিমদের কাছে কোরান, খ্রিস্টানদের কাছে বাইবেল বা বৌদ্ধদের কাছে ত্রিপিটক কিংবা শিখদের গ্রন্থসাহিবও তো তাঁদের কাছে একান্ত পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ, তাহলে বহু ধর্মের মানুষের বসবাস যে দেশে, যে দেশ নাকি সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ, সেখানে আলাদাভাবে গীতাকেই কেন 'জাতীয় গ্রন্থ' ভাবা হবে? এ প্রশ্ন অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। কিন্তু এখানেও দুটো কথা আছে। প্রথমত, সত্যিই কি গীতায় যা বলা আছে তা সব হিন্দুদের স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ব করে? বস্তুত গীতাতে 'আত্মার অবিনশ্বরতা'র কথা বলার মধ্যে দিয়ে জন্মান্তরবাদ এবং কর্মফলের তত্ত্বকে যেমন শক্তিশালীভাবে হাজির করা হয়েছে, এমনটা আর কোথাও করা হয়েছে বলে মনে হয় না। আমরা জানি, কৃষ্ণের সেই বিখ্যাত (অথবা কুখ্যাত) উক্তি 'কর্মেণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচনঃ' অর্থাৎ 'কাজ করে যাও, ফলের আশা কোরো না', যা চরম নিয়তিবাদের দিকেই মানুষকে ঠেলে দেয়, যে নিয়তিবাদ নিষ্ক্রিয়তার দিকে মানুষকে ঠেলে দেয়! এর সাথে ভাবুন, গীতার সেই দৃশ্যকল্পটা অর্জুনের যখন জ্ঞাতিবধ করতে মন সায় দিচ্ছে না, তখন বলছেন, তুমি এদের বধ করোনি, ইতিমধ্যেই যা করার আমিই করেছি। আমিই এদের বধ করে রেখেছি, তুমি নিমিত্তমাত্র। একবার ভাবুন, নিয়তিবাদকে কীভাবে এখানে নিয়ে আসা হচ্ছে। বস্তুত এই জন্মান্তরবাদ, কর্মফলের তত্ত্ব এবং নিয়তিবাদ মিলেমিশে বর্ণব্যবস্থাকে শক্তিশালী করছে। শূদ্রের এবং নারীর অবস্থাকে আরো হীন অবস্থায় ঠেলে দিয়েছিল এই গীতাই। ফলত গীতা যত না সমগ্র হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ, তার চেয়েও বেশি তা ব্রাহ্মণ্যবাদকেই সেবা করেছিল আর শূদ্রকে সামাজিকভাবে আরো হীন অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। ফলত এটা ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক তাত্ত্বিক প্রচেষ্টা। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, এই হিন্দুত্ববাদীরা আসলে হিন্দুধর্মের নাম করে যা সামনে আনে তা হল নির্জলা ব্রাহ্মণ্যবাদ। সমগ্র হিন্দু ভাবাবেগের এরা মোটেই প্রতিনিধিত্ব করে না (যদিও ব্রাহ্মণরা হিন্দুধর্মটায় তাদের একচেটিয়া অধিকার বলে মনে করে থাকে)। ফলত গীতার প্রতি হিন্দুত্ববাদীদের মোহ থাকা স্বাভাবিক কিন্তু সামগ্রিক হিন্দু ভাবাবেগকে তা কখনোই ধারণ করতে পারে না।

আবার অনেক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের মতে, গীতা হল মহাভারত মহাকাব্যের শেষের দিকের একটা প্রক্ষেপণ বা অংশ মাত্র। ফলে এটাকে কী আলাদাভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মগ্রন্থ বলে চালানো যায়?

দ্বিতীয়ত, আরেকটা প্রশ্ন এখানে উঠবে, প্রাচীন হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর মধ্যে কেন গীতাই হিন্দুত্ববাদীদের এত পছন্দ? বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত বাদ দিয়ে কেন গীতা? গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যখন অধর্ম এসে ধর্মকে ঢেকে দেয় তখন ধর্ম সংস্থাপনায় আমি যুগে যুগে দেখা দিই। আমরা আগেই বলেছি কুষাণ রাজবংশের সময় শ্রীম ভাগবত গীতা রচিত হচ্ছে। কুষাণ রাজবংশের আমলটা এমন এক সময় যখন, আজ যেটাকে ভারতবর্ষ বলা হয় তার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছোটো ছোটো দেবতাকে কেন্দ্র করে ছোটো ছোটো সম্প্রদায় গড়ে উঠছে। গ্রিকদের একাংশ সে সময় যেমন বিষ্ণুভক্ত হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিল, তেমনি তাঁদের অপরাংশ বৌদ্ধধর্মেও দীক্ষিত হন। সে সময় বৈষ্ণব, শাক্ত, পাঞ্চরাত্র, শৈব, পাশুপত, লকুশীল ও আরো নানা ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বৌদ্ধ, জৈন, আজীবকের মতো ব্রাহ্মণ্যবিরোধী সম্প্রদায়গুলিও সহাবস্থান করছিল। এই ধর্মমতগুলোর মধ্যে অল্পবিস্তর সংঘাতও ছিল, পাশাপাশি তারা পরস্পরের মতকে যাচাই করার প্রক্রিয়াতেও ছিল। বহু অভারতীয় ধর্মও বিদেশি শক্তির হাত ধরে এদেশে আসছিল। মোদ্দা কথা, ধর্মীয়ভাবে একটা অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। ঠিক ওই সময়ই ভৃগুবংশীয় কিছু শাস্ত্রকার মহাভারতের শেষতম প্রক্ষেপটি লেখা শুরু করেন। ফলত ঐ সময়ই গীতা রচিত হয়। একটা অভি-পৌরাণিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে ঐ সময় আজ যেটাকে আমরা হিন্দুধর্ম বলছি (পড়ুন ব্রাহ্মণ্যধর্ম) তাকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা প্রথম নেওয়া হয় গীতার মধ্যে দিয়ে। সুকুমারী ভট্টাচার্য লিখছেন, '... তখন ভারতবর্ষে নানা ধর্ম, নানা জাতি, নানা নবাগত, বিদেশাগত দেবতার আরাধনার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। স্বভাবতই সমাজে আলোড়ন চলছে – কোন দেবতাকে কী পদ্ধতিতে, কী নৈবেদ্য সামগ্রী দিয়ে উপাসনা করলে তা যথাযথ দেবতার কাছে পৌঁছাবে। এবং তা দেবতার কাছে গ্রাহ্য হবে। সব দেবতা, সব আরাধনা, নৈবেদ্য, জপ, হোমকেই কৃষ্ণ নিজের পায়ে টেনে নিলেন: যেন বলছেন আমিই একমাত্র দেবতা'। সুকুমারী ভট্টাচার্য আরো বললেন, প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত মহলে প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে, গীতা কুষাণযুগে রচিত। এই যুগে মধ্যপ্রাচ্য ও চীন থেকে বহু জাতির বণিক, সৈন্য ও সাধারণ মানুষ, কোন বিজয়কামী সেনাপতির সঙ্গে দলে দলে ভারতে আসে। সঙ্গে আনে সেই সব গোষ্ঠীর নানা বিচিত্র ধর্মবিশ্বাস, দর্শনপ্রস্থান, সংস্কার ও আচার আচরণ। ভারতবর্ষের উত্তরার্ধে তখন নানা মতের প্রবল সংঘর্ষ চলছে, কোনো একটি মত প্রধান বা সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেনি। সম্ভবত ভগবদ্গীতায় এইসব মতের সমন্বয়ের চেষ্টা হয়েছে।

সুতরাং সে অর্থে দেখলে আজ যে হিন্দুত্ববাদীরা হিন্দুধর্মকে একটা অখণ্ড প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম হিসাবে দেখানোর মধ্যে দিয়ে বস্তুত ব্রাহ্মণ্যবাদী মতাদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়েছে, গীতাই হচ্ছে মতাদর্শগতভাবে তার প্রথম প্রয়াস। ফলত হিন্দু পুনরুত্থানবাদী থেকে আজকের হিন্দুত্ববাদী সবারই পছন্দের গ্রন্থ তথা 'পবিত্র গ্রন্থ' যে শ্রীমদ্ভাগবত গীতা হবে, এতে আর আশ্চর্যের কি আছে!

চতুর্দশ অধ্যায়

কুৎসার জবাব

সম্প্রতি 'হিন্দু জাগরণ মঞ্চ' বলে একটি সংগঠনের সক্রিয়তা উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। এই ধরনের সংগঠনগুলোর কাজ হচ্ছে নানা ধরনের উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলে এবং কুৎসা ও গুজব রটিয়ে দিকে দিকে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষের চারাগুলিকে রোপণ করা। সাধারণত কী ধরনের কথাবার্তা বলে এরা তথাকথিত হিন্দুদের মনে মুসলিম বিদ্বেষ রটায়, তা নিয়ে অনেকদিন আগে 'মানব সংহতি'র বন্ধুরা কিছু কাজকর্ম করেছিলেন। আজ আবার এই কুৎসামূলক প্রচারগুলোকে আরো একবার উন্মোচন করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সেই লক্ষ্যে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে এধরনের উস্কানিমূলক কুৎসাগুলোর মধ্যে বাছাই করা কয়েকটা নিয়ে আলোচনা করা যাক। হিন্দু জাগরণের ফেরিওয়ালারা প্রায়ই জনমানসে মুসলিম বিদ্বেষ জাগাতে যেগুলো বলেন, সেগুলো হল –

১) 'হিন্দুরা শান্তিপ্রিয় আর মুসলমানরা দাঙ্গাপ্রবণ'। এর বিরুদ্ধে প্রতিযুক্তি হল, যেকোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তিপ্রিয় মানুষের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি থাকে, পাশাপাশি থাকে মুষ্টিমেয় দাঙ্গাবাজরাও। ইতিহাস দেখাচ্ছে যে, এদেশে ১৯৪৭ সাল পরবর্তী সময় থেকে আজ অবধি হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় বেশি নিহত হয়েছেন মুসলমানরা। ১৯৬৯ সালের রাঁচির দাঙ্গায় ১৮৪ জন নিহত হয়েছিলেন, তার মধ্যে মুসলমান নাগরিকের সংখ্যা ছিলে ১৬৪ জন। ওই বছরই আমেদাবাদের দাঙ্গায় নিহত হন ৫১২ জন, নিহতের মধ্যে মুসলমান ছিলেন ৪১৩ জন। ভাগলপুর, মিরাট, মালিয়ানার দাঙ্গা থেকে শুরু করে বাবরি মসজিদ ভাঙার সময় ঘটা দাঙ্গা, কিংবা গুজরাত গণহত্যার সময় নিহতদের সম্প্রদায়গত পরিচয়কে যদি হিসাবে আনা হয়, কিংবা গ্রাহাম স্টেইন্‌স ও তাঁর শিশুপুত্রদের জীবন্ত দগ্ধ করে হত্যার মতো 'বিধর্মী' বলে হাজারো নিরীহ মানুষের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড অথবা উচ্চবর্ণীয়দের হাতে নিহত দলিতদের সংখ্যা অথবা পণের কারণে বা সতী-মাহাত্ম্যের কারণে নিহতদের (কারণ এগুলো সবই ব্রাহ্মণ্যবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি) সংখ্যা ধরলে কিন্তু 'হিন্দুরা শান্তিপ্রিয়' এই দাবিটা অনেকটা দুর্বলই হয়ে যাবে।

২) 'মুসলমানরা বহিরাগত, বিদেশি, এদেশের প্রথম বিদেশি আক্রমণকারী'। এর বিরুদ্ধে প্রতিযুক্তি হল, এক্ষেত্রে শুধু মুসলমানদের ধরা হবে কেন? তথাকথিত আর্য সভ্যতা, যা নিয়ে হিন্দুরা গর্ব অনুভব করেন, সেই আর্যরাও তো এখনও অবধি প্রামাণ্য তথ্য অনুসারে বিদেশ থেকেই এখানে এসেছিল। দ্বিতীয়ত এদেশের অধিকাংশ মুসলমানই ধর্মান্তরিত মুসলমান, যারা এদেশেরই ভূমিসন্তান। ব্রাহ্মণ্যবাদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেতে যারা ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছিল।

৩) 'মুসলমানরা তলোয়ারের জোরে এদেশের হিন্দুদের মুসলমান বানিয়েছে'। প্রতিযুক্তি হল, আগেই বললাম তলোয়ারের জোরে কাউকে মুসলমান বানানোর তথ্যপ্রমাণ খুব একটা নেই, মূলত ব্রাহ্মণ্যবাদের অত্যাচার এবং বৈষম্যমূলক আচরণের কারণেই যে এদেশের অধিকাংশ

নিম্নবর্গের হিন্দু ধর্মান্তরিত মুসলমান হয়েছিল, তা এমনকি হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের অন্যতম নেতা স্বামী বিবেকানন্দও স্বীকার করে গেছেন।

৪) 'মুসলমানরা এদেশটাকে নিজেদের দেশ বলে ভাবেন না'। প্রতিযুক্তি হল, এদেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে মুসলমান জনতার একটা গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা আছে। ১৮৫৭-র মহা বিদ্রোহ থেকে ওয়াহাবি আন্দোলন, বাঁশের কেল্লা গড়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তিতুমীরের লড়াই, খিলাফত আন্দোলন, সীমান্তগান্ধির লড়াই থেকে নৌ-বিদ্রোহে শার্দূল সিং গফুরের আত্মত্যাগ, কিংবা আজাদ হিন্দ ফৌজে বহু মুসলিম বিপ্লবীর আত্মবলিদান, উত্তরপ্রদেশের কাকোরি ষড়যন্ত্রের মামলায় আসফাকুল্লা খানের হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গাওয়ার ঘটনা – এমন অজস্র ঘটনা আমরা ভুলি কেমন করে? এরকম আরো বহু দেশপ্রেমিক সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্তবাদবিরোধী আন্দোলনে আত্মবলিদান করেছেন, যাঁরা ধর্মীয় পরিচয়ের নিরিখে দেখলে মুসলমান। ফলত মুসলমানরা এদেশকে তাঁদের দেশ ভাবেন না, এভাবে বলার অর্থ হল এদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ যাঁরা বস্তুত দেশপ্রেমিক, তাদের দেশের প্রতি ভালোবাসাকে খাটো করা।

৫) 'মুসলমানরা যদি নিজেদের ধর্ম পরিচয় বলতে গর্ব বোধ করে, হিন্দুরা করবে না কেন?' প্রতিযুক্তি হল, প্রথমত হিন্দু তো কোনো একটা একক প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মই নয়। হিন্দু ধর্মের মধ্যে রয়েছে নানাধরনের স্বতন্ত্র মতবাদের অস্তিত্ব। যেগুলো শুধু স্বতন্ত্রই নয়, বহু ক্ষেত্রে বিপরীত চিন্তারও প্রতিনিধিত্ব করে। 'নির্গুণ ব্রহ্মে'র ধারণার সাথে যেমন কালীসাধনাকে একাসনে বসানো মুশকিল। একইভাবে আবার ভক্তিবাদী বৈষ্ণবধর্মের সাথে ব্রাহ্মণ্যবাদী বৈদিক চিন্তার মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। আগেই দেখিয়েছি, পুরাণের বহু দেবতাই বৈদিক যুগে স্বীকৃতি তো পানইনি, উল্টে বৈদিক যুগে লিঙ্গপূজার মতো পূজাকে ঘৃণার চোখে দেখা হ'ত। আজো অনেক ব্রাহ্মণ্যবাদীই তন্ত্রাচারকে ঘৃণার চোখে দেখেন। বৈষ্ণবধর্মের সাথে কালীসাধনার যেমন বিস্তর ফারাক। বৈষ্ণবরা যেখানে নিরামিষভোজী সেখানে কালীপূজায় পশুবলি অন্যতম পুজোর উপাচার। তাহলে হিন্দু বলে আলাদা ভাবে গর্ব করার আগে কি এই প্রশ্নই উঠবে না – 'কোন হিন্দু' ? বৈষ্ণব না শাক্ত না বৈদিক ইত্যাদি?

৬) 'পাকিস্তান, বাংলাদেশ যদি ইসলামি রাষ্ট্র হয়, ভারতের হিন্দুদেশ হতে ক্ষতি কী?' প্রতিযুক্তি হল, প্রথমত পাকিস্তান বা বাংলাদেশ ইসলামি রাষ্ট্র হওয়ার কারণে সে দেশের জনগণের কি মৌলিক সমস্যা দূর হয়েছে? বিপরীতভাবে, নেপাল হিন্দু রাষ্ট্র থাকাকালীনই বা সেদেশের জনতার কী এমন আহামরি উপকার হয়েছে? দ্বিতীয় যুক্তি হিসাবে আবার উঠে আসে, হিন্দু বলতে আমরা কাদের বলব? হিন্দুত্বের পরিচয়টি ঠিক কী? কোন ধর্মীয় আচরণকে 'হিন্দু আচরণ' হিসাবে গণ্য করা হবে?

৭) 'হিন্দু, খ্রিস্টানদের জন্য এক আইন, মুসলমানদের ক্ষেত্রে আলাদা আইন থাকবে কেন?' প্রথমত, বলা দরকার, ফৌজদারি আইনের ক্ষেত্রে সবারই একই আইন। অর্থাৎ কোনো ক্রিমিনাল অফেন্সের ক্ষেত্রে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান সবার জন্য এদেশে একই আইন। আর ব্যক্তিগত আচার-আচরণের ক্ষেত্রে সব ধর্মেরই স্বাতন্ত্র্যকে এদেশে আইনিভাবে মান্যতা দেওয়া হয়।

এক্ষেত্রে কোনো ধর্মের ক্ষেত্রে আধুনিক চিন্তার একটু বেশি প্রতিফলন দেখা যায়, কোথাও কম। এদেশের হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রেও সতীদাহ, বাল্যবিবাহের মতো প্রচুর অমানবিক রীতিনীতি একসময় ছিল। বিধবা হলে মহিলাদের সারাজীবন নিরামিষভোজী হয়ে থাকতে হ'ত এবং কথায় কথায় অনশন করতে হ'ত, দুধ-সাগু-কলা খেতে হ'ত। এমনকি আজো অনেকে তা মেনে চলেন। বিধবাদের পুনর্বিবাহের কথা বলায় স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতে কম নাকাল হতে হয়নি। যেমনভাবে দলিতদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আক্রান্ত হতে হয়েছে চৈতন্যকে। প্রাচীনকালে বেদপাঠের 'অপরাধে' শূদ্রদের হত্যা করা হ'ত। আর একালে ধর্মীয় কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লড়াকু সেনানী মহারাষ্ট্রের যুক্তিবাদী আন্দোলনের নেতা ডা. নরেন্দ্র অচ্যুত দাভোলকরকে গুলি করে হত্যা করল হিন্দু মৌলবাদী ঘাতকেরা। দলিত মুক্তিসংগ্রামে ব্রতী গণসাংস্কৃতিক সংগঠন 'কবীর কলা মঞ্চ'-এর শিল্পী, কবি, কলাকুশলীরা মৌলবাদীদের হামলা ও রাষ্ট্রীয় দমনপীড়নের শিকার হচ্ছেন। অনেক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সমাজ সংস্কারকদের চেষ্টায় কিছু কিছু পরিবর্তন এসেছে, যদিও মৌলিক সমস্যার ইতর বিশেষ ফারাক হয়নি। সেদিন যে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এই সকল সংস্কারের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন মজার বিষয় হল, আজ তাঁদের প্রতিনিধিরাই হঠাৎ মুসলমানদের ধর্মীয় আচরণের উপর 'হিঁদুয়ানি' চাপিয়ে দিতে এই সব অপযুক্তির অবতারণা করছেন।

৮) 'মুসলমানদের চারটে করে বিয়ে, তাই অধিক সংখ্যক বাচ্চা জন্মায়।' আচ্ছা একটা সাধারণ কথা ভাবুন তো, একজন মুসলমান পুরুষের যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া যায় চারটে করেই বিবি, যদি এই চারটে বিবির একজন স্বামী না থেকে, চারজনের চারটে আলাদা আলাদা স্বামীই থাকতেন তাহলে কি তাদের সন্তান উৎপাদন কমে যেত? দ্বিতীয়ত একজন পুরুষ স্রেফ ধর্মীয় বিধান আছে বলেই চারটে বিয়ে করেন এমনটা আদৌ সত্যি নয়, আজকের প্রেক্ষিতে আর্থিক দিক থেকে দেখলে বাস্তবসম্মতও নয়। আর ১৯৯০ সালের একটা সমীক্ষায় দু-তিনটে বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা গেছিল, ১) মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের অনুপাত হিন্দুদের তুলনায় মোটেই খুব বেশি নয় এবং আগামী কয়েক'শো বছরের মধ্যেও এদেশের মুসলমান জনসংখ্যা হিন্দুদের জনসংখ্যার ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারবে না। ২) পরিবার পরিকল্পনায় মুসলিম মেয়েদের সচেতনতা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক। ৩) মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রসার আর্থিক কারণেই কম হবার ফলে এব্যাপারে আরো সচেতনতা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি থাকতে পারে, এর জন্য অবশ্যই দায়ী সরকারের সংখ্যালঘু সংক্রান্ত নীতি।

৯) 'মুসলমানদের এদেশের সরকার বিশেষ সুবিধা দেয়।' এটা যদি সত্যি ঘটত, তাহলে এদেশের মুসলমানদের মধ্যে দারিদ্র, অশিক্ষা, এত বেশি কেন? কেন সরকারি, বেসরকারি চাকরিতে বড়ো বড়ো পদগুলো তো দূর অস্ত, এমনকি ছোটো ছোটো পদেও মুসলমানদের খুব একটা চোখে পড়ে না? ঘটনা তো এটাই যে এদেশের সরকারি, বেসরকারি চাকরি কিংবা বাণিজ্যে–অর্থনৈতিক প্রতিটি নীতি নির্ধারণের স্থানেই উচ্চবর্ণীয়দের একাধিপত্য, অথচ জনসংখ্যার নিরিখে দেখলে এই উচ্চবর্ণীয়রাই এদেশের সংখ্যালঘু, জনসংখ্যার মেরেকেটে ১৫ শতাংশ! অথচ তাদের দখলে চাকরি এবং অন্যান্য নীতিনির্ধারক ক্ষেত্রগুলির ৮৫ শতাংশ রয়েছে!

১০) 'মুসলমান মাত্রই জঙ্গি।' ঘটনা হল, আরবের জনতা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দশক ব্যাপী লড়াই চালাচ্ছেন, যে ক্ষেত্রে কখনো কখনো তাদের লড়াইয়ের পদ্ধতি হয়তো সন্ত্রাসমূলক। বিশেষত আমেরিকায় ৯/১১-র টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনার পর থেকে 'মুসলমানরা সন্ত্রাসবাদী' এই প্রচার তুঙ্গে উঠেছে। এর পিছনে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী এবং তাদের পদলেহীদের অপপ্রচারমূলক কুৎসা, অথচ 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-র নামে আমেরিকা, ইজরায়েল লক্ষ কোটি অসামরিক সাধারণ মানুষকে হত্যা করছে, ইরাকে, আফগানিস্তানে তারা ড্রোন আক্রমণে এবং বোমারু বিমান এবং মিসাইল আক্রমণে হাজার হাজার শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে হত্যা করছে অথচ সাম্রাজ্যবাদী প্রচারমাধ্যমের প্রচারের এতই জোর যে এতদসত্ত্বেও তাদের আচরণকে 'সন্ত্রাসবাদী' কার্যকলাপ বলে নিন্দা করা হচ্ছে না। দেশে দেশে দিকে দিকে কিন্তু এদের মদতে সাধারণ মানুষের উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চলছেই। দ্বিতীয়ত, সন্ত্রাসবাদ নিয়ে কর্পোরেট মিডিয়ার সুপরিকল্পিত প্রচার-সন্ত্রাসও মানুষের মধ্যে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একটা অহেতুক ভীতির জন্ম দিচ্ছে। সম্প্রতি খাগড়াগড় কাণ্ডের সময় এটা আবার প্রত্যক্ষ করা গেল। বিজেপির মতো মৌলবাদী দলগুলো সবসময় এর অপপ্রয়োগ ঘটায়, যার জন্য দেখা যায়, একেকটা নিবর্তনমূলক কালা কানুন লাগু হলেই প্রচুর সাধারণ মুসলমান সহনাগরিককে এই মামলায় ব্যাপক হারে জেলে পোরা হয়। গ্রেপ্তারের সময় মিডিয়ায় বড়ো করে খবর হয়, পরে যখন তাঁরা বেকসুর হয়ে জেল থেকে বেরিয়ে আসেন, মিডিয়ায় খবর হয় না, উল্টে তাদেরই 'সন্ত্রাসবাদী' তকমা বয়ে বেড়াতে হয় সারাজীবন ধরে। বস্তুত আদিবাসী বা দলিতরা যদি প্রতিবাদ করেন তাঁদের গায়ে সেঁটে দেওয়া হয় 'মাওবাদী' তকমা আর মুসলিম জনতা প্রতিবাদমুখর হলেই তাঁদের গায়ে দেগে দেওয়া হয় 'সন্ত্রাসবাদী'র ছাপ। এই ভয়ংকর প্রবণতা সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবার জন্যই কি বিপজ্জনক নয়?

পঞ্চদশ অধ্যায়

কংগ্রেস কি কোনো ধর্মনিরপেক্ষ দল?

এদেশের সরকারি বাম দলগুলি প্রায়শই দাবি করে যে, কংগ্রেস একটা ধর্মনিরপেক্ষ দল। বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ জোট বানানোর 'স্বার্থে' প্রায়শই তারা কংগ্রেস সরকারকে বাইরে থেকে (বা ভিতর থেকেও) সমর্থনের কথা বলে থাকে। কিন্তু কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষতা আসলে একধরনের বকধার্মিকতা। এটা ঠিক যে তারা কখনো কখনো ধর্মনিরপেক্ষতার ভণিতা করলেও এদেশের সংখ্যালঘুর রক্ত কংগ্রেসের হাতেও কম লেগে নেই। সাম্প্রতিক অতীতের দিকে তাকালে দেখব, মিরাট, মালিয়ানা, ভিয়ান্দি, নেলী বা ভাগলপুরে সংখ্যালঘুদের উপর নামিয়ে আনা গণহত্যাগুলোর প্রত্যেকটিতে কংগ্রেস রাষ্ট্রশক্তির সহযোগিতা নিয়ে সংখ্যালঘু জনগণকে হত্যা করেছিল। ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যুর পর কংগ্রেস নেতাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে কীভাবে দেশজুড়ে শিখ জনগণকে হত্যা করেছিল তা-ও আমাদের কাছে এক ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মতো স্মৃতি। গুজরাত গণহত্যার পর নরেন্দ্র মোদি যেমন নির্বিকারভাবে আমাদের নিউটনের তৃতীয় সূত্রের 'তত্ত্ব' শুনিয়েছিলেন, বস্তুত তার আগেই রাজীব গান্ধি শিখ-গণহত্যার সময় নির্বিকারভাবে বলেছিলেন, 'একটা বড়ো গাছ উৎপাটিত হলে আশেপাশে তো তার আলোড়ন তৈরি হবার' তত্ত্বকথা! অন্তর্বস্তুতে এই দুই বক্তব্যের মধ্যে কোনো ফারাক নেই।

কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক চরিত্রটি নতুন নয়। কংগ্রেসের নেতা প্যাটেলের মনোভাবের কথা তো আগেই বললাম। কংগ্রেসের প্রাণপুরুষ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির কথাই ধরা যাক। গান্ধিজি ছিলেন একজন আদ্যোপান্ত সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব। গান্ধিজি বলতেন, 'আমি প্রথমে একজন হিন্দু, তারপরে দেশপ্রেমিক'। ১৯১৯-১৯২২ সালে জাতীয় সংগ্রামের সাথে খিলাফত আন্দোলন মিলিত হয়ে দেশের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের ব্যাপক মানুষের সমাগমে একটা বিরাট গণ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। গান্ধিজিই ছিলেন এই আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা। বস্তুত আন্দোলন চরম রূপ ধারণ করলে গান্ধিজি আন্দোলনের ভয়ে ভীত হয়ে সংগ্রামের ময়দান ছেড়ে পলায়ন করেন, কারণ গান্ধিজি কখনোই চাইতেন না একটা সত্যিকারের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠুক, যা ব্রিটিশরাজের অবসান ঘটাবে। ফলত এই সময় তিনি শুধু আন্দোলনের ময়দান ছেড়ে পালালেনই না, উল্টে নিজেকে 'হিন্দু' বলে পরিচয় দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে একটা পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস তৈরি হচ্ছিল তা সম্পূর্ণ বিপরীতে বদলে দিলেন। এর ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মৌলবাদী শক্তিই মাথা চাড়া দিল। আগেই বলেছি, আর এস এসের জন্ম হচ্ছে ঠিক তখনই।

১৯৩০ সালে পেশোয়ারে শ্রমিক-কৃষক সহ ব্যাপক জনগণ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ মানুষ ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁরা পেশোয়ার শহরে ১০ দিনের জন্য স্বাধীন সরকার গঠন করেন। পেশোয়ারে বিদ্রোহী মুসলমান জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য ব্রিটিশ-রাজশক্তি দু'টো হিন্দু গাড়োয়াল রেজিমেন্টকে সেখানে প্রেরণ করে এবং গুলি চালাতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু গাড়োয়াল রেজিমেন্টের সৈন্যরা ব্রিটিশ সেনাপতির নির্দেশ অমান্য করে তাঁদের রাইফেলগুলি বিদ্রোহী জনতাকে বিলিয়ে দেন। সেদিন তারা বস্তুত হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির এক সুন্দর উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু গান্ধিজি

সৈন্যদের এই দেশাত্মবোধক এবং সম্প্রীতিমূলক কার্যকলাপকে উৎসাহিত না করে তাঁদের কদর্যভাবে আক্রমণ করে বসলেন! ব্রিটিশরাজ যখন সেনাদের শায়েস্তা করতে উদ্যত, তখন তিনি তাদের সে ভূমিকাকে নিন্দা না করে গাড়োয়ালি সৈন্যদের শাস্তিদানকে 'কর্তব্যকর্মে অবহেলা', 'অবাধ্যতা' এবং 'বিশ্বাসভঙ্গ'-এর জন্য 'উচিত শাস্তি' হিসাবে সমর্থন করেন। ১৯৪৬ সালে ভারতের হিন্দু, মুসলিম জনতা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিরাট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। গান্ধিজিসহ সামগ্রিক কংগ্রেস নেতৃত্ব এর ফলে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং কংগ্রেসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তার উপর তীব্র দমন নামিয়ে আনে, প্যাটেল প্রসঙ্গে আলোচনার সময়ও আমরা তা বলেছি। গান্ধিজি হিন্দু-মুসলমান জনতার এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে 'অপবিত্র মিলন' বলে আখ্যায়িত করলেন। তিনি বললেন, 'যদি তাদের ঐক্য উপর থেকে নীচ পর্যন্ত গড়ে উঠত তবে আমি এই মিলনের অর্থ বুঝতে পারতাম। কিন্তু তা হত ইতর প্রকৃতির মানুষের এক দঙ্গলের হাতে ভারতবর্ষকে সমর্পণ করার সমান।। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যের সেই চরম পরিণতি প্রত্যক্ষ করার জন্য আমি ১২৫ বছর পর্যন্ত বাঁচতে ইচ্ছা করি না'।

গান্ধিজি শুধুমাত্র নিজেকে 'হিন্দু' বলেই ক্ষান্ত হতেন না, তিনি ছিলেন জাতি-বর্ণব্যবস্থারও একজন গোঁড়া সমর্থক। ১৯২১ সালের আন্দোলন থেকে পলায়নের সময় গান্ধিজি বলেন, 'আমি নিজেকে একজন সনাতনী হিন্দু বলে ঘোষণা করছি। কারণ, ১) বেদ, উপনিষদ, পুরাণ এবং যা কিছু হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বলে পরিচিত তার সকল কিছুতেই আমি বিশ্বাস করি, সুতরাং অবতার আর পুনর্জন্মেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। ২) বর্ণাশ্রম ধর্মে আমার বিশ্বাস অতি দৃঢ়। সেই বর্ণাশ্রম ধর্ম বর্তমান কালের লৌকিক ধারণা বা স্থূল অর্থে নয়, তা এক অর্থে আমার মতে সম্পূর্ণ বেদ-ভিত্তিক। ৩) গোরক্ষা সম্বন্ধেও আমার বিশ্বাস অতি দৃঢ়। এ সম্বন্ধেও সাধারণ মানুষের ধারণা অপেক্ষা আমার ধারণা অনেক ব্যাপক। ৪) মূর্তি পূজায়ও আমি দৃঢ় বিশ্বাসী।' এই কথাগুলোর সাথে হিন্দুত্ববাদীদের কথায় কি কোনো ফারাক পাওয়া যাবে??

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ নিয়ে গান্ধি অনেক বড়ো বড়ো কথা বললেও অস্পৃশ্যতার মূল কারণ যে জাতি-বর্ণব্যবস্থা তার তিনি সমর্থক ছিলেন। সম্প্রতি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় একটি বুক রিভিউ লিখতে গিয়ে গৌতম রায় তাই অত্যন্ত সঠিকভাবেই গান্ধির এই অস্পৃশ্যতার প্রসঙ্গে বলেছেন, "অন্যের মল পরিষ্কার করতে কারও আনন্দ হবে, এটা তারাই ভাবতে পারে, যাদের নিজেদের কখনো এই ঘৃণ্য কাজ করতে হয়নি। অথচ এ দেশের জাতিভেদপ্রথার সমর্থনকারীরা এই কাজের সদর্থক দিকও খুঁজে পেয়েছেন। ১৯৩৬ সালে এক নিবন্ধে গাঁধী লেখেন – 'একজন ভাঙ্গি বা মেথর সমাজের জন্য সেই কাজটাই করে, যা একজন মা তাঁর সন্তানের জন্য করে থাকেন। মা তাঁর সন্তানকে সুস্থ রাখতে তার 'গু-মুত' পরিষ্কার করেন। একইভাবে একজন মেথরানিও সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে সকলের পায়খানা সাফ করেন...' অন্ধ্রপ্রদেশের থোট্টি রমণী নারায়াণাম্মা তাই গাঁধীকে কখনোই হরিজনদের শুভাকাঙ্ক্ষী ভাবতে পারেননি। তিনি স্পষ্টতই বুঝতে পারেন, শিশু সন্তানের গু-মুত পরিষ্কার করতে যে মাতৃত্ব উদ্‌গত হয়, সমগ্র জাতির বিষ্ঠা হাতে-পায়ে মেখে মাথায় বয়ে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে তা তুলনীয় হতে পারে না। গাঁধী যে জাতিভেদ ও বর্ণভেদ প্রথা জিইয়ে রাখতেই এই উদ্ভট তুলনা টেনেছেন, তা বুঝতে নিরক্ষর মেথরানিদেরও অসুবিধা হয় না।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ নভেম্বর ২০১৪, 'স্বচ্ছ ভারতের পাশেই অস্বচ্ছ ভারত', গৌতম রায়)

এর সাথে মেলান মোদির 'বাল্মিকী'দের নিয়ে কর্মযোগের সেই উক্তি, জাতিভেদের প্রশ্নে গান্ধিজি আর মোদির চিন্তার মধ্যে ফারাক খুঁজে পাবেন না!

গান্ধি পরবর্তী কংগ্রেসও গান্ধি-প্যাটেলদের উত্তরাধিকারকে দায়িত্ব নিয়ে বহন করে এসেছে। ভোটের স্বার্থে হিন্দু কার্ড খেলতে কখনোই তাঁরা দ্বিধা করেননি। ১৯৮৩ সালে কাশ্মীর নির্বাচনে ইন্দিরাজির নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস হিন্দু কার্ড খেলে কাশ্মীরে হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ককে পকেটস্থ করার খেলায় মেতেছিলেন। বিভাজনটা এরকম হয়ে যায় মুসলিম প্রাধান্যকারী কাশ্মীর উপত্যকার মুসলিম জনতার প্রতিনিধি ফারুক আবদুল্লার ন্যাশনাল কনফারেন্স আর হিন্দু প্রাধান্যকারী জম্মু উপত্যকার প্রতিনিধি কংগ্রেস। বাবরি মসজিদ-রামজন্মভূমি বিতর্ককে ঘিরে যে সমস্যা তারও সূত্রপাত করেন কংগ্রেস নেতৃত্বই। ১৯৮৬-এর ১ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেস সরকারই ৩৭ বছর পর তথাকথিত রামমন্দিরের তালাটি খুলে দিয়ে সমস্যার পুনরায় সূত্রপাত ঘটায়। ১৯৮৯-এর ২৭ সেপ্টেম্বর, উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী এন ডি তিওয়ারি এবং তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুটা সিং এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতাদের মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতে ব্যাপক নিরাপত্তার মধ্যে বিতর্কিত জমিটিতে শিলান্যাস করা হয়। এইভাবে কংগ্রেস মন্দির-মসজিদ বিতর্কের পালে হাওয়া দেওয়ার কাজটি করে। পরবর্তীতে হিন্দুত্ববাদীদের তাণ্ডবে ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর যখন হিন্দুত্ববাদী জঙ্গি করসেবকরা বাবরি মসজিদটি ধ্বংস করে, তখন কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে, যদিও এই কংগ্রেস সরকারই যখন শ্রমিক, কৃষক কোনো আন্দোলন সংগঠিত করে, তখনই দেশের নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে সেই আন্দোলনকে রক্তরঞ্জিত করতে পিছপা হয় না! অথচ হিন্দুত্ববাদীদের তাণ্ডবের সময় তাঁরা মৌনী বাবা সাজেন। এ সব কিছুই তাঁদের হিন্দুত্ববাদী স্বরূপেরই প্রকাশ মাত্র। তাই কংগ্রেসকে 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলা কার্যত সত্যের অপলাপ মাত্র।

অতঃপর

আজ আমাদের ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলছে হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিবাদ। সন্দেহ নেই যে, এর বিরুদ্ধে তীব্র, তীক্ষ্ণ মতাদর্শগত সংগ্রাম যেমন জরুরি তেমনই গড়ে তোলা দরকার এক বৃহত্তর ফ্যাসিবাদ বিরোধী যুক্তমোর্চা। দেশের প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে আজ গড়ে তুলতে হবে এমন এক যুক্তমোর্চা যা একদিকে দেশি বিদেশি কর্পোরেট লুঠের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে যেমন উদ্যোগী হবে, পাশাপাশি আবার সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রামগুলোরও পাশে দাঁড়িয়ে সক্রিয় সংহতি জানাবে। দেশের জল, জমি, জঙ্গলের অধিকারের দাবিতে যারা লড়ছে, তাদের বিরুদ্ধে চলমান রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যেমন সেই যুক্তমোর্চাকে আওয়াজ তুলতে হবে, তেমনই তাকে দাঁড়াতে হবে নিপীড়িত জাতিসত্তার পাশে, আদিবাসী, দলিত, পিছড়ে-বর্গের মানুষের আত্মপরিচয়ের দাবিতে সংগ্রামগুলোর পাশেও। একমাত্র এধরনের একটা যুক্তফ্রন্টই আজকের দিনে জরুরি। সংসদীয় দলগুলির ভোটের ঘোঁট দিয়ে ফ্যাসিবাদকে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের সংসদীয় রাজনীতির প্রায় প্রতিটি দলই কমবেশি ফ্যাসিস্ট এ্যাজেন্ডা নিয়ে চলছে। তাই এক ফ্যাসিবাদ দিয়ে আরেক ফ্যাসিবাদকে মোকাবিলা করার অর্থ হবে সামনের দরজা দিয়ে বাঘ তাড়িয়ে পেছনের দরজা দিয়ে নেকড়েকে ডেকে আনা। চাই প্রকৃত গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সংগ্রামী মানুষের জোট, যার নেতৃত্বে অবশ্যই থাকতে হবে এদেশের শ্রমিকশ্রেণীকে।

তথ্যসূত্র

1. প্রাচীন ভারত – সুকুমারী ভট্টাচার্য
2. ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য – সুকুমারী ভট্টাচার্য
3. বেদের যুগে ক্ষুধা ও খাদ্য – সুকুমারী ভট্টাচার্য
4. গীতা কেন? – সুকুমারী ভট্টাচার্য
5. ভারতীয় দর্শন – দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
6. লোকায়ত দর্শন – দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
7. ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে – দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
8. আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ – বিপান চন্দ্র
9. ভারতের সভ্যতা ও সমাজ বিকাশে ধর্ম শ্রেণী ও জাতিভেদ – সুকোমল সেন
10. আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭ – সুমিত সরকার
11. স্ক্রিপ্টিং দ্য চেঞ্জ – অনুরাধা গান্ধি
12. দ্য ইন্ডিয়ান বিগ্ বুয়্যার্জোআসি : ইটস্ জেনেসিস্, গ্রোথ্ এ্যান্ড ক্যারেক্টার – সুনীতি কুমার ঘোষ
13. ইন্ডিয়া এ্যা দ্য রাজ (১৯১৯-১৯৪৭) – সুনীতি কুমার ঘোষ
14. বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি-রাজনীতি – সুনীতি কুমার ঘোষ
15. দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন্ এ্যান্ড ইটস্ রিভিউ – সুনীতি কুমার ঘোষ
16. ভারতে সামন্ততন্ত্র – রামশরণ শর্মা
17. প্রাচীন ভারতে শূদ্র – রামশরণ শর্মা
18. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস – রোমিলা থাপার
19. মনুসংহিতা এবং শূদ্র – কঙ্কর সিংহ
20. মনুসংহিতা এবং নারী – কঙ্কর সিংহ
21. ধর্ম রাজনীতি অর্থনীতি – রতন খাসনবিশ
22. ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান – মানবেন্দ্রনাথ রায়
23. ইতিহাসে বিজ্ঞান – জে ডি বার্নাল (অনুবাদ: আশীষ লাহিড়ী)
24. গান্ধীবাদের স্বরূপ – সুপ্রকাশ রায়
25. ভারতে কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম – সুপ্রকাশ রায়
26. কামারের এক ঘা – রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
27. বিজ্ঞান ও মতাদর্শ – আশীষ লাহিড়ী
28. স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙালির সেকিউলার বিবেক – আশীষ লাহিড়ী
29. বিবেকানন্দ মানস : ঐতিহ্য ও আধুনিকতা - কণিষ্ক চৌধুরী
30. বিবেকানন্দ অন্য চোখে – নিরঞ্জন ধর
31. রামকৃষ্ণ অন্য চোখে – নিরঞ্জন ধর
32. রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ : মুক্ত মনের আলোয় – সম্পাদনা : রাজেশ দত্ত
33. বিজ্ঞান ও কুসংস্কার প্রবন্ধ সংকলন – সম্পাদনা ও সংকলন : শ্যামল চক্রবর্তী

34. প্রসঙ্গ রামজন্মভূমি বাবরি মসজিদ – ইতিহাস বিকৃতির জবাবে – শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি
35. নরক গুজরাত – ক্যাম্প
36. ধর্ম সাম্প্রদায়িকতা রামমন্দির : আমাদের চোখে – নয়া ইস্তাহার প্রকাশনী
37. ভারতের জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি – এ আর দেশাই
38. ধর্ম প্রসঙ্গে – মার্কস এঙ্গেলস
39. এ্যান্টি ড্যুরিং – ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস
40. ধর্ম ও বিজ্ঞান – জর্জ টমসন
41. বৌদ্ধধর্মের অধঃপতন – ডি ডি কোশাম্বি
42. দেশের কথা – সখারাম গনেশ দেউস্কর
43. দৈবেন দেয়ম্, সুকুমার রায়, প্রতিরোধ, সম্পাদনা: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, উৎস মানুষ সংকলন
44. প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের অধোগতি – প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রতিরোধ, উৎস মানুষ সংকলন
45. সমালোচনার উত্তর – মেঘনাদ সাহা, মেঘনাদ রচনা সংকলন, সম্পাদনা : শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়
46. ধর্মশাস্ত্র ও জাতিভেদ – দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
47. শূদ্র না ব্রাহ্মণ – শিবরাম চক্রবর্তী
48. বিজেপির মতাদর্শ ও রাজনীতি – সুনীতি কুমার ঘোষ, বর্তমান লোকায়তিক
49. প্রাচীন ভারতে দ্বন্দ্ব ও সামাজিক পরিবর্তন – অমিত ভট্টাচার্য, বর্তমান লোকায়তিক, অগাস্ট-সেপ্টেম্বর ২০০৫
50. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরক্ষায় বিবেকানন্দের আদর্শ: সর্যের মধ্যে ভূত – রাজেশ দত্ত, যুক্তিবাদী, ১৯৯৩
51. বিবেকানন্দর আর্যভাবনা – কণিষ্ক চৌধুরী, চেতনা লহর, এপ্রিল-ডিসেম্বর ২০১৩
52. রোল্ অফ্ আর এস এস এ্যান্ড কংগ্রেস – অরিন্দম সেন
53. হিন্দু ন্যাশনালিজম্ ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস্ – আ রিপোর্ট অন ননপ্রফিট গ্রুপ
54. কমিউনিয়ালিজম্ টেকস্ আ ডেঞ্জারাস্ নিউ টার্ন ইন্ ইন্ডিয়া – এ আই আর এস এফ প্রকাশনী
55. মোদি'জ্ স্পিরিচ্যুয়াল নোশন্ ইউ কর্মযোগী – রাজীব সিন্হা, টাইমস্ অফ্ ইন্ডিয়া, ১/১২/২০১২
56. অনীক – মার্চ-এপ্রিল ২০০৪, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯৮, অক্টোবর-নভেম্বর ২০০৫
57. মানবমন, জানুয়ারি, ২০১১
58. চেতনা লহর – অক্টোবর ২০১২, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২, এপ্রিল-জুন ২০১২।
59. ন হন্যতে, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০১২
60. দ্রোহকাল, ৫ মে ২০০৫
61. এখন বিসংবাদ, মার্চ-এপ্রিল ২০১৪
62. শ্রমজীবী ভাষা, ১ নভেম্বর ২০১৩
63. জনতার নয়া সমাচার – জুন ২০১৪, নভেম্বর ২০১৩
64. আজকের পিপলস মার্চ
65. আজকের দেশব্রতী, ৭ অগাস্ট, ২০১৪
66. এবং পরব, দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা
67. আপডেট সিরিজ : ১৯, প্রকাশকাল : ২৯ নভেম্বর, ২০১৩